আঁধার রাতের বন্দিনী

আমীরুল ইসলাম

আঁধার রাতের বন্দিনী

রচনায় ঃ
আমীরুল ইসলাম

প্রকাশনায়
নাঈমা প্রকাশনী

আঁধার রাতের বন্দিনী-২

রচনা

আমীরুল ইসলাম

সম্পাদনা

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

প্রকাশনায়

নাঈমা প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০২

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৩

তৃতীয় প্রকাশ ঃ জুন ২০০৬

চুর্থত প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০৭

কম্পিউটার কম্পোজ

ঊর্মী কম্পিউটার

গ্রাফিক্স

মোঃ আজাদ

মোবাঃ ০১৭১৮৯৩৮৭৩১

মুদ্রণ

রোমান প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য ঃ ১৪০.০০ টাকা মাত্র

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

নযরানা

তাদের তরে—

যাদের তপ্ত শোণিত ধারায়

জ্বালিয়েছে দ্বীনের বাতি,

তাদেরই স্মরণে কাঁদিছে ভূবন

ফুঁপিয়ে দিবস রাতি।

ওদেরই পথে চলতে যারা

জোট বেঁধেছে আজ,

বলছি ওদের সাবাস বন্ধু

ভয় নেই, নেই লাজ।

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমাদেরকে তার সত্য ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করেছেন। তিনি একমাত্র মাবুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার উপযুক্ত নন। তিনি আমাদেরকে দান করেছেন হেদায়াতের জন্য পবিত্র কুরআন।

রহমত ও পরিপূর্ণ শান্তি বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, যিনি জীবনের ২৩টি বছর দুনিয়াতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাফির, মুশরিক আর বেঈমানদের নির্যাতন-নিপীড়ন বরদাশত করে আরবের বর্বর জাতিকে আল্লাহর দ্বীন শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন সভ্যতা, মানবতা, উদারতা ও সহনশীলতা। যিনি ছিলেন সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ সমরবিদ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তাঁকে তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামসহ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। যিনি তার জীবনে ২৭টি যুদ্ধে ফিল্ডমার্শাল (কমান্ডার ইন চীফ) হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সাহাবাগণের উপর এবং সমস্ত উম্মতের উপর।

পৃথিবী নামক গ্রহের উত্তর সীমান্তে রাশিয়া নামক দেশে (সোভিয়েত ইউনিয়ন) লেনিন নামক এক ফেরাউনের আবির্ভাব ঘটে। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে লেনিন 'কেউ খাবে কেউ খাবে না; তা হবে না, তা হবে না' এই মুখরোচক স্লোগানটি নিয়ে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। তার যাদুময় স্লোগানের গভীর রাগিনীতে গরীব শ্রেণীর মানুষেরা সুর মিলিয়ে গান ধরে।

এবার তার কণ্ঠে ২য় স্লোগান ধ্বনিত হল– 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। এ স্লোগানের মূর্ছনায় শ্রমিকগণ নাচতে আরম্ভ করল। ওরা ভেবেছিল, ধনী আর গরীব সবাইকে করে দেবে এক সমান। কেউ আর গরীব থাকবে না, ফলে সমাজে হানাহানির অবসান ঘটবে। ফিরে আসবে শান্তির মহাপ্লাবন।

লেনিন তার কমিউনিজম মতাদর্শের প্রসার করতে গিয়ে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দেয়া রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র নামক মতবাদ প্রতর্বন করেন। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী শাসন ব্যবস্থা চালু করেন।

যারা একত্ববাদে বিশ্বাসী, দ্বীনদার, পরহেজগার, ইসলামের অনুরাগী, তারা কমিউনিজমকে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রকে মেনে নিতে পারেননি। কারণ, ইসলাম আর কমিউনিজমের মধ্যে রয়েছে আপোসহীন সংঘাত। তারা এ কুফরী মতবাদ মানতে পারেননি বিধায় তাদের উপর নেমে আসে জুলুম-নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের স্টীমরোলার। এ অবর্ণনীয় নির্যাতন থেকে দেশ, জাতি ও মুসলমানদেরকে মুক্ত করতে, দ্বীনকে দুনিয়াতে গালিব করতে যারা সশস্ত্র জেহাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত আনোয়ার পাশা শহীদ (রহঃ)-এর নাম সর্ব শীর্ষে। এছাড়া আরো যারা জিহাদী পরচম উড্ডীন করেছিলেন, তাদের মধ্যে বীরাঙ্গনা ছায়েমা মালাকানী ও খোবায়েব জামবুলীর নাম স্মরণীয়। তাদের বীরত্ব-গাঁথা আজ ইতিহাসের পাতা থেকে খসে পড়েছে।

বীরাঙ্গনা ছায়েমা মালাকানী ও খোবায়েব জামবুলীর বীরত্বের কাহিনী ও খোদায়ী মদদ নিয়েই 'আঁধার রাতের বন্দিনী' নামক এই উপন্যাসের সৃষ্টি। উপন্যাসটি শুধু উপন্যাস-ই নয়, এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে জিহাদের জরুরী মাসআলা-মাসায়েল ও কলাকৌশলেরও বর্ণনা।

বইটি পাঠ করে যদি মুসলিম সমাজে জিহাদের অনুপ্রেরণা সঞ্চার হয়, তবে আমাদের প্রচেষ্টাকে স্বার্থক বলে মনে করব। আমরা এ বইখানা ত্রুটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোন স্থানে কোন ভুল পরিলক্ষিত হয়, তবে অবগত করলে চিরদিন কৃতজ্ঞতাপার্শ্বে আবদ্ধ থাকব।

এই বইটি প্রকাশ করতে যারা আমাকে সহযোগিতাদান করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদানে ধন্য করুক।

হে আল্লাহ! এই গ্রন্থটিকে কবুল কর এবং একে নাজাতের উছিলা বানাও। আমীন।

বিনীত

আমীরুল ইসলাম

[এক]

আমি আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে সকাল সকাল তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সকাল পেরিয়ে দুপুর, দুপুর পেরিয়ে বিকেল হল। কিরণমালী অনেকটা মন্দীভূত হয়ে অস্তাচলে রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যার আগমনি বার্তা নিয়ে দখিনা সমীরণ কেবলই ছুটছে পাগলীবেশে সব ওলট-পালট করে। শালিকের ঝাঁক নিজ ভাষায় গান গেয়ে ঝোঁপ-ঝাড়ে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ধবধবে সাদা বকেরা দল বেঁধে কক্-কক্ শব্দ করে আকাশছোঁয়া বিটপীর মগডালে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। অন্যান্য পাখ-পাখালিরাও আপন আপন নীড়ে ফিরছে। রাখাল বালকেরা ছাগল, ভেড়া, দুম্বা নিয়ে নিজ আলয়ের পথ ধরছে। একটু পরেই গোধূলিতে কানায় কানায় ভরে যাবে বিশ্ব চরাচর। গাঁয়ের বউ-ঝি'রাও সন্ধ্যার কাজে ব্যস্ত। কেউ সামাদান পরিষ্কার করছে, কেউ বাড়ীঘর ঝাড়ু দিচ্ছে, আবার কেউবা রাতের রান্না সমাপ্ত করছে।

তোরাব হারুনী মাগরিবের নামায আদায় করতে মসজিদে গেলেন। মুয়াজ্জিন অনুচ্চ স্বরে আযান দিলেন। কারণ, উচ্চশব্দে আযান দেয়া রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আযান নাকি বিরক্তিকর শব্দ। শহরে মাইকে আযান দেয়া অনেক আগেই নিষিদ্ধ হয়েছে। ইমাম সাহেব এসে কয়েকজন মুসল্লি নিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করে সবাইকে বসতে বললেন। মুসল্লিরা সুন্নাত আদায় করে মিম্বরের কাছে এসে বৃত্তাকারে বসে গেল।

ইমাম সাহেব তোরাব হারুনীকে উদ্দেশ করে বললেন, "ঘরে যে মুসাফিরকে আশ্রয় দিয়েছেন, লোকটা আমাদের জন্য অভিশাপ। সে একজন কট্টরপন্থী। তার কারণে পুরো এলাকা বিরান হয়ে যাবে। একসময় না একসময় যুবকের কর্মতৎপরতার কথা প্রশাসনের গোচরে যাবেই। তখন কিন্তু কেউ বাঁচতে পারব না। আগে থেকেই আমাদের

সাবধান থাকা উচিত। আমাদের এলাকা এখনো শান্ত। বলসেভিকরা জানে, এই এলাকায় সবাই তাদের অনুগত। আগন্তুক যেভাবে কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে, তাতে আমাদেরকে আশু বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। বলসেভিকদের বিরুদ্ধে যারাই মুখ খুলেছে, তারাই দুনিয়ার আলো-বাতাস থেকে চিরবিদায় নিতে হয়েছে। বলসেভিকরা হাজার হাজার পীর-মাশায়েখ ও আলেম-ওলামাকে শহীদ করে দিয়েছে। এখনো যদি আমাদের হুঁশ না হয়, তবে অচিরেই সে পরিণতি আমাদেরকেও ভোগ করতে হবে। এখন জিহাদের সময় নেই। বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা আত্মহত্যারই নামান্তর। বলসেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে যে ধরনের সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, তা আমাদের নেই। কাজেই, বর্তমানে আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। আপনি মুসাফিরকে এ এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিন। তাকে বলে দিন, সে যেন অন্যত্র চলে যায়।”

ইমাম সাহেবের কথাগুলো তোরাব হারুনীর হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হল। তবু তিনি বিনীত কণ্ঠে বললেন, “হুজুর! আলেম-ওলামাদেরকে বলসেভিকরা পাইকারী হারে শহীদ করে চলেছে, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে, মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে, মাইকে আযান দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারপরও কি আমাদের উপর জিহাদ ফরয হয়নি?”

ইমাম সাহেব রেগে বললেন, “আমি কি কুরআন-হাদীস পড়িনি? নাকি কম বুঝি? বর্তমানে আমাদের উপর জিহাদ ফরয, তা কোন আলেম বলতে পারবেন না। কারণ, আমাদের শক্তি-সামর্থ নেই। কোন আলেম যদি বলতে পারেন বা তার কাছে যদি প্রমাণ থাকে, তবে সে আমার কাছে আসুক।”

তোরাব হারুনী নম্রভাবে বললেন, “হুজুর! আমরা তো মাসলা-মাসায়েল সম্বন্ধে এত ওয়াকেফহাল নই, তাই জানার জন্য দু’কথা এদিক-ওদিক বলে থাকি। তবে এই বিষয়টি অনেক কঠিন বলে মনে হয়। আমরা চাই দু’চারজন আলেম একত্রিত বসে এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক ফায়সালা দিন। ব্যাপারটি আসলে কি, আমরা তার সঠিক সমাধান চাই।”

ইমাম সাহেব ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, "আমি তো একবারই বলে দিয়েছি, যদি কোন আলেমের হিম্মত থাকে, তবে যেন তিনি দলিল-প্রমাণ নিয়ে আমার কাছে আসুন। দু'চারজন কেন, পারলে দু'চার ডজন আলেম নিয়ে আসেন।" অন্যান্য মুসল্লিরাও তোরাব হারুনীর সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরাও চেষ্টা করব আলেমদের এনে এ ব্যাপারে মীমাংসায় পৌঁছতে।"

ততক্ষণে ঈশার নামাযের সময় হয়ে গেল। মুয়াজ্জিন সাহেব পূর্বের ন্যায় অনুচ্চ স্বরে আযান দিলেন। তোরাব হারুনী জামাতে নামায আদায় করে বাড়ী ফিরলেন।

ফাহিমা আক্তার তৃষ্ণা ঘরের কাজগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে আমার আম্মাকে খানা খাইয়ে বিছানা বিছিয়ে শুইয়ে দিল। এমন সময় হারুনী মসজিদ থেকে এসে দরজার দাঁড়িয়ে অভ্যাস অনুযায়ী সালাম দিলেন। তৃষ্ণা সালামের উত্তর দিয়ে দরজা খুলে দেয়। হারুনী ঘরে ঢুকে কেদারায় উপবেশন করলেন। তৃষ্ণা খাবার এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখছে। ছায়েমা নামায সেরে এখনো জায়নামাযে বসে তিলাওয়াত করছে। হারুনীর আগমনের শব্দ পেয়ে তিলাওয়াত বন্ধ করে ওঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হারুনীর প্রতি তাকিয়ে দেল, তার মুখমণ্ডল অন্যদিনের মত হাস্যোজ্জ্বল নেই। কেমন যেন মলিনতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই ছায়েমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, ভাইজান! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন?

হারুনী উত্তর দিলেন, না বোন, আমি অসুস্থ নই।

ছায়েমা বলল, না, আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। হারুনী মুচকি হাসলেন।

তৃষ্ণা খাবার এনে বলল, আপনি একাকী আহার করুন, আমি ছায়েমাকে নিয়ে ওঘরে খাব। এই বলে সে ছায়েমাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। হারুনী অন্যদিনের চেয়ে অনেক অল্প আহার করলেন।

ছায়েমা ও তৃষ্ণা ওঘরে খানা খাচ্ছে। ছায়েমার অন্তরের বিরহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে– এতক্ষণে খোবায়েব কোথায় জানি আছে। কি খাচ্ছে, কোথায় রাত্রি যাপন করছে। এসব চিন্তায় ছায়েমার প্রাণপাখী উড়ে যেতে চায়। এক গ্রাস আহার মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে; কিন্তু পেটে যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে সামান্য খানা খেয়ে

ছায়েমা হাত ধুয়ে নিল। তৃষ্ণা বুঝতে পেরে বলল, এত চিন্তা করিসনে বোন। আল্লাহ-ই তোর প্রিয়তমের হেফাজত করবেন।

খানাপিনা সেরে ছায়েমা আমার আম্মার সাথে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তৃষ্ণা নামায আদায় করে বড় ঘরের খাটে গিয়ে শুয়ে হারুনীকে বলল, আমি একটা কথা বলতে চাই, তুমি মন দিয়ে শোনবে কি প্রিয়?

হারুনী বললেন, এত রাতে আবার কি কথা শুনতে হবে। আচ্ছা বল কি বলবে...।

তৃষ্ণা বলতে লাগল, সায়েমা একজন সতী-সাধ্বী বীরাঙ্গনা কুমারী। তার দেহরত্ন অপরূপ যৌবন গরিমায় সুষমামণ্ডিত। প্রস্ফুটিত কমলের সুরভিত সুষমায় দেহ-পল্লবী অপার্থিব মহিমায় যেন গৌরবান্বিত। আঁখিযুগল যেন প্রেমাস্পদের হৃদয় মন্দিরে মায়াবান নিক্ষেপ করতে শিখেছে। কোকিল কণ্ঠী বিনিন্দিত সুধাময় সুর লহরীতে প্রেমিকের প্রাণে মোহের আবেশ জাগিয়ে তোলে। ললিতাঙ্গের লীলায়িত গতিছন্দে প্রিয়জনের হৃদয়তন্ত্রীতে সুমধুর ঝংকার তুলতে থাকে। তরুণী স্থুলাঙ্গী ও কৃষ্ণাঙ্গী নয়, মাঝারি গড়ন। তার উজ্জ্বল গৌরকান্তি ও অনুপম গঠন-সৌষ্ঠব প্রেমিকের নয়ন-মন চুরি করে বিরহী প্রাণে প্রেমের উন্মাদনা জাগায়।

শৈশবধিঅনেক যুবক প্রেম নিবেদনের জন্য ছায়েমার আশপাশে ঘুরত। কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেত না। ছোটবেলা থেকেই ছায়েমার অন্তরে ছিল আল্লাহর ভয়। তাই সে সকলের প্রিয় পাত্র ছিল। তাকওয়া-পরহেযগারীতে তার কোন জুড়ি ছিল না। আজ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! তাকে আজ বনে-বাদারে একজন যুবকের সাথে ঘুরতে হচ্ছে। ছেলেটিও দেখতে কম সুশ্রী নয়। এলেমে-আমলেও বেশ ভাল। উভয়কে যুবক মনে করে কেউ হয়ত বদ-গুমান করবে না। আসলে ওদের মধ্যে যে কোন সময় গোনাহ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। শয়তান যে মানুষের চিরশত্রু। কাজেই পাপের পথ রুদ্ধ করে দেয়া দরকার।

তোরাব হারুনী তৃষ্ণাকে বুঝিয়ে বলল, দেখ! তাদের তো সংসারে কেউ নেই। উভয়ে সর্বহারা। মাথা গোজার ঠাঁই নেই। পা রাখার জায়গা নেই। আপন বলে আশ্রয় দেবে এমন কেউ নেই

ওদের। ওদের যদি আশ্রয়স্থল থাকত, তবে কি এভাবে ঘুরে বেড়াত। ওদের মতো মহৎ গুণের অধিকারী ক'জনকে খুঁজে পাবে? ওদের মতো পবিত্র জীবন পাবে কি এ সংসারে? সাবধান! ওদের প্রতি খারাপ ধারণা করলে বা অপবাদ আরোপ করলে আল্লাহ সইবেন না। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।" (সূরা আন-নূর ঃ আয়াত-৪)।

অন্য আয়াতে বলেন, "যারা সতী-সাধ্বী নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত ও তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।" (সূরা আন-নূর ঃ আয়াত-২৩)।

সাবধান! এরা দ্বীনের মুজাহিদ। এদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে জাহান্নামের কীট হয়ো না।

তৃষ্ণা বলল, ওগো স্বামী! তুমি কি পড়নি কুরআনের আয়াত, আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের দৃষ্টি নত রাখতে এবং যৌনাঙ্গের হেফাযত করতে? এমনিভাবে মুমিন নারীদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন তাদের দৃষ্টি নত রাখতে, যৌনাঙ্গের হেফাজত করতে এবং তাদের সৌন্দর্য গায়রে মাহরামের নিকট প্রকাশ না করতে।" (সূরা আন-নূর ঃ আয়াত ৩০-৩১)।

ওদের কি পরস্পরে দেখা-সাক্ষাত হয় না? ওদের কি লালসাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না? এটা কি গোনাহে কবীরা নয়? এতে কি পর্দার ফরয লঙ্ঘিত হচ্ছে না? তাই বলছি, আমরা ওদের দু'জনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেই। বর্তমানে আমরাই তাদের আপনজন।

তৃষ্ণা এই বলে আরো একটি আয়াত তিলাওয়াত করল, যার অনুবাদ এই,

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরকেও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন, আল্লাহ প্রাচুর্য্যময়,

সর্বজ্ঞ।” (সূরা আন-নূর, আয়াত-৩৩)।

তৃষ্ণা উক্ত আয়াত হারুনীকে শুনিয়ে বলল, অবিবাহিতের বিবাহ কাজ সম্পাদন করার আল্লাহ হুকুম করেছেন। তাই আমরাই ওদের অভিভাবক হয়ে ওদের বাসরঘর সাজিয়ে দিই।

তোরাব হারুনী তৃষ্ণার কথায় মোমের মতো গলে গেলেন এবং বললেন, “আচ্ছা ঠিক আছে, এখন থেকেই ছায়েমা ও খোবায়েবের শাদীর এন্তেজাম শুরু কর। খোবায়ের বাড়ী ফেরার সাথে সাথে তাদের বিবাহপর্ব সমাধা করব।

তৃষ্ণা আনন্দে বাগবাগ। আনন্দের ফোয়ারা উঠছে যেন তার হৃদয় থেকে। তাই বারবার তার যবান থেকে বেরিয়ে আসছে- আলহামদুলিল্লাহ।

রাত প্রায় ১২টা। কথোপকথনের মধ্যদিয়ে সময় কেটে অনেক রাত হয়ে গেছে। তোরাব হারুনী বললেন, এবার একটু ঘুমিয়ে নাও। একটু পরেই ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাবে। রাত আর বেশি বাকি নেই। এই বলে ঘুমিয়ে পড়ল হারুনী। তৃষ্ণাও তার অনুকরণ করল।

সুবেহ সাদিকের আঁধার কেটে উদয়াচলে আবীর রেখা ক্রমশই প্রকাশ পেতে লাগল। কে যেন এক পোঁচ সিঁদুর মেখে দিয়েছে পূর্বাকাশে। একটু পরে কাঁচা কাঁচা রোদে ভরে যাবে বিশ্ব-চরাচর। পাখপাখালিরা কিচির-মিচির আওয়াজ তুলে নিজ নিজ পালকগুলো ঝেড়ে নিয়ে আহারের সন্ধানে আশ্রয়স্থল ত্যাগ করতে লাগল। কুলবধূরা শয্যাত্যাগ করে আপন কাজে মনোনিবেশ করছে। ঠিক এমনি সময় তৃষ্ণার সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। গাত্রোত্থান করে তৃষ্ণা, ছায়েমা ও আমার আম্মা নামায আদায় করলেন।

[দুই]

ইমাম সাহেবের কথাগুলো এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে হারুনীর অন্তরে। তাই তিনি চিন্তা করলেন, আজই কোন একজন হক্কানী আলেমকে ডেকে এ বিতর্কিত মাসআলার সমাধান করতে হবে। তিনি তৃষ্ণাকে বললেন, “আমি একটু বাইরে যাব, আসতে হয়ত বিকেল হয়ে যাবে। নাস্তা-পানি থাকলে সামান্য হাজির কর।”

তৃষ্ণা কিছু বাসি-পান্তা এনে উপস্থিত করল। হারুনী এগুলো খেয়ে জামা-কাপড় পাল্টিয়ে সোজা চলে গেলেন তার বন্ধু মৌলভী জুবায়েবের বাড়ীতে।

মৌলভী জুবায়ের হারুনীর মুখ থেকে গত রাতের ইমাম সাহেবের বক্তব্য শুনে বললেন, ভাই হারুনী! যে মাসআলা উদ্ঘাটনের জন্য আপনি চেষ্টা-তদ্বীর করছেন, তা খুবই স্পর্শকাতর। কারণ, এ পর্যন্ত যেসব আলেম জিহাদের পক্ষে মুখ খুলেছেন, তারা একজনও বেঁচে নেই। বলসেভিকেরা তাদের সবাইকেই শহীদ করে দিয়েছে। বর্তমানে যাদেরকে আমরা আলেম হিসেবে জানি, তাদের অনেকেই বলসেভিকদের গোলাম। এদের মুখ থেকে আসল সত্য বের হবে না। তারা মৃত্যুর ভয়ে হক কথা বলে না। বরং তারা জিহাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করাতে ব্যস্ত। হ্যাঁ, তবে একজন আলেম এখনো বেঁচে আছেন। তিনি আমারই হাদীসের উস্তাদ আল্লামা নাজির আহমদ আলওয়ানী। বয়স সত্তুরের উর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তিও অনেকটা কমে গেছে। তিনি এখন আর বাড়ীর বাইরে বের হন না। তাকে যদি আনা যায়, তবে আসল মাসআলা ও হক কথা জানতে পারবেন। হারুনী বললেন, যেভাবেই হোক দু'এক ঘন্টার জন্য হলেও তাকে আমাদের মসজিদে আনতে হবে। এলাকার শত শত যুবক জিহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আর ইমাম সাহেব হাতেগোনা দু'চারজন লোক নিয়ে এর বিরোধিতা করছেন।

মৌলভী জুবায়ের তোরাব হারুনীকে নিয়ে আলওয়ানের সাথে সাক্ষাতের জন্য রওনা হলেন।

তৃষ্ণা ঘর-সংসারের খুটিনাটি কাজগুলো সেরে নাস্তা তৈরি করে আমার মা ও ছায়েমাকে নিয়ে খেতে বসল। আহারের এক পর্যায়ে তৃষ্ণা মাকে লক্ষণ করে বলল, "চাচী মা! আপনি ছাড়া খোবায়েবের মুরুব্বী বলতে কেউ নেই। তার মাথা গোঁজারও ঠাঁই নেই। আমরা পরামর্শ করেছি, খোবায়েব ভাইকে বিয়ে করাব। এখন তার বিবাহের পূর্ণ বয়স। আপনি রাজি হলে আমরা কনের সন্ধান করতে পারি।

খোবায়েবের বিবাহের কথা শুনে ছায়েমার চেহারা পাংশু হয়ে গেল। তার আহারের মাত্রা কমে গেল। তৃষ্ণাও ভালভাবেই বুঝতে

পেরেছে ছায়েমার মনের ভাব। ছায়েমা শুনেও না শোনার ভান করে জিজ্ঞেস করল, "কি বললে তৃষ্ণা?"

তৃষ্ণা ওষ্ঠযুগলে হাসির রেখা টেনে বলল, "বিয়ের আলাপ করছি চাচী মার সাথে।"

কার বিয়ে জানতে চায় ছায়েমা।

তৃষ্ণা উত্তর দেয়, খোবায়েব ভাইয়ার।

কোথায় বিয়ে করাবে, কনে ঠিক করেছ কি?

তৃষ্ণা উত্তর দিল, সংসারে কি মেয়ের অভাব আছে যে বউ পাব না? খোবায়েবের মত সুপুরুষ আর ক'জন আছে? এতো সুন্দর চেহারা ও সুঠৌল তার অবয়ব। অপরদিকে সে একজন আলেমে দ্বীন এবং বীর মুজাহিদ। তার জন্য কি কনের অভাব হবে? দশ গ্রামের দশ মেয়ে ছুটে আসবে তার পাণি গ্রহণ করার জন্য।

কথাগুলো শুনে ছায়েমার অন্তর থেকে এক দীর্ঘশ্বাস গুমরিয়ে বেরিয়ে এল, যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে তার সমস্ত দেহ ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ছায়েমা খানার পাত্রটি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অর্ধ-আহারেই বেরিয়ে গেল। ওড়নাঞ্চলে চোখের পানি মুছতে লাগল এবং ভাবতে লাগল, এতদিনের স্বপ্নসাধ কি অকালেই সাঙ্গ হবে। মুকুলেই কি ঝরে যাবে এতদিনের লালিত কুসুম। তাহলে কি খোবায়েব আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে? যাকে নিয়ে এতদিন কল্পনার জাল বুনেছি, যাকে আমি হৃদয়ের পিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছি; সে কি আজ আমাকে ফাঁকি দিয়ে অন্যকে নিয়ে সোনার সংসার গড়বে! তৃষ্ণা কি আমার জীবনের স্বপ্নসাধ ভেঙ্গে দিতে যাচ্ছে? তৃষ্ণা কি চায় আমাকে অথৈ সাগরে ভাসিয়ে দিতে? নারী হয়ে কি মানুষ নারীর এত সর্বনাশ করতে পারে!

ছায়েমা এসব চিন্তায় অস্থির ও বেকারার হয়ে কখনো শয্যা গ্রহণ করছে আবার কখনো পায়চারি করছে। কখনোবা কুন্তলগুচ্ছ সজোরে টানছে। আবার কখনো করাঘাতে ছাতি ফাটাচ্ছে। সে যেন উন্মাদিনী, পাগলিনী।

ফাহিমা আক্তার তৃষ্ণা আহারাদি সেরে ছায়েমার গৃহে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করল, "কি গো আপামনি! এসব কি হচ্ছে? প্রেমাস্পদের

চিন্তায় বুঝি এতো অস্থির হয়ে গেলে? খানার জায়গায় খানা পড়ে আছে আর তুমি কিনা চলে এলে। এভাবে কি দিন যাবে?

ছায়েমা অশ্রুসিক্ত নয়নে বলল, "নাগো বোন, আমার কিছুই ভাল লাগছে না। জানি না, কপালে কি আছে?"

এই বলে ছায়েমা শয্যা ত্যাগ করে কেদারায় এসে বসল। তারপর তৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করল, "আসলেই কি খোবায়েব ভাইয়ার জন্য কনে ঠিক করে ফেলেছ? কোথায় কাকে ঠিক করেছ বলবে কি?"

তৃষ্ণা মৃদু হেসে বলল, বলতে পারব না, কিন্তু দেখাতে পারব।

সায়েমা বলল, ঠিক আছে, দেখাও।

তৃষ্ণা ছায়েমার দিকে অঙ্গুলি উঁচিয়ে বলল, এই সুন্দরীকে।

ছায়েমা লজ্জা পেল। বলল, ধুত্তুরি, মিছে কথা বল না।

কিন্তু মনে তার আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করে। খানিক পর আবার জিজ্ঞেস করল, সত্যি করে বল না বোন, কে সে সৌভাগ্যশালিনী নারী?

তাদের কথোপকথনের মধ্যে ওঘর থেকে আমার মা এসে পড়লেন এবং বললেন, "কনের কথা তো বলিসনি বেটি! তাছাড়া তার তো মাথা গোজার ঠাঁইও নেই। বউমাকে আমরা কোথায় রাখব?"

তৃষ্ণা হেসে বলল, "কেন চাচী মা, এ বাড়ীতে কি আপনাদের জায়গা হবে না? ঐ ঘরটি খালি পড়ে আছে। ওঘরেই আপনার পুত্রবধূর বাসরঘর সাজাব।"

বৃদ্ধা আবার প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু কনে কে?"

তৃষ্ণা এবার ছায়েমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই নিন আপনার পুত্রবধূ।"

তৃষ্ণা টান দিয়ে ছায়েমার ওড়নাটি খুলে অলকগুচ্ছ পাকড়াও করে সামনে ধরে বলল, "এটাই আপনার পুত্রবধূ, ভাল করে দেখে নিন।"

বৃদ্ধা ভাঙ্গা গালে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "আমি তো প্রথম দর্শনেই একে পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়েছি। ছেলেমেয়ে দু'জনই মানানসই। তুমি উপযুক্ত পাত্রীই ঠিক করেছ।"

বৃদ্ধা বললেন, "তাহলে ওদের আক্‌দ কবে সুসম্পন্ন হবে?"

তৃষ্ণা বলল, "বর-ই তো পলাতক। কখন আসে আর কখন উধাও হয়ে যায় তার কোন ইয়ত্তা নেই। এবার ফিরে আসলেই

কাজটা সমাধা করব। অমত হলেও এবার আর রক্ষা নেই। কাঁধে জোয়াল না দেয়া পর্যন্ত বাগে আসবে না। একবার ঢোক গিলাতে পারলেই হয়। তারপর দেখব পালায় কোথায়?”

এবার সায়েমা বুঝতে পারল যে, তার ব্যাপারেই আলোচনা হচ্ছে। তার হৃদয় পারাবারে যেন আনন্দের নতুন জোয়ার আসল। কানায় কানায় ভরে গেল আনন্দের ফল্গুধারা। মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় করতে লাগল সে।

সায়েমা তৃষ্ণাকে উদ্দেশ করে বলল, বোন তৃষ্ণা! তোমরা আমাকে নিয়ে এতসব চিন্তা করছ, তা ভাবিনি কোনদিন। আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমাদের মতে আমার কোন অমত নেই। তবে আমার একটি কথা শুনবে কি বোন?

কি কথা বলতে চাও আপামণি? জিজ্ঞেস করল তৃষ্ণা।

ছায়েমা বলল, আমি পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন ও ঘরবাড়ী হারিয়ে তোমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েছি। তোমাদের হুকুম শিরোধার্য। তবে এখন নয়। আমাদের বিয়েটা আরো কিছুদিন পরে হোক। এখন আমরা জিহাদের ময়দানে আছি। যেদিন গোটা দেশটাকে শত্রুমুক্ত করতে পারব, দুঃখিনী মায়ের মুখে হাসি ফুটাতে পারব, অন্যায়-অবিচার, জুলুম-ব্যভিচার ও নির্যাতনের ঘোর অন্ধকার কেটে শান্তির ফোয়ারা প্রবাহিত করতে পারব, ইসলামকে আবার বিজয়ীবেশে দেখব; তখন বিয়ে করে স্থায়ীভাবে দাম্পত্য জীবনের আনন্দ ভোগ করব।

সায়েমার কথা শুনে তৃষ্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে বলল, ছিঃ খুরমুখী, এ ব্যাপারে আবার কথা বলছ! একজন যুবকের সাথে বন-বাদারে ঘুরে বেড়াচ্ছ, এটা কি পাপ নয়? তুমি এতকিছু জেনেও আমাদের কথা বুঝতে পারছ না। যুবক-যুবতী একত্রিত হলেই শয়তান উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে, কি করে গোনাহ করিয়ে তাদের পবিত্রতা নষ্ট করে জাহান্নামে পাঠানো যায়। তোমরা যতই সৎ থাক না কেন শরীয়ত এর অনুমতি দেয় না।

সায়েমা মৃদু হেসে বলল, আমার কথায় ক্ষেপে গেলে বোন? আমাদের প্রতি তুমি নিশ্চয়ই খারাপ ধারণা পোষণ করছ। খোবায়েব

আমাকে বোনের মর্যাদা দিয়েছে। সে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। আমরা উভয়েই এক মনের, এক চিন্তার অধিকারী। খোবায়েব আমাকে কোনদিন ভিন্ন চোখে দেখেনি। তিনি একজন অসহায়া, অবলা, দুঃখিনী বোনকে উদ্ধার করে গর্বিত। কূলহীন পারাবারের চেয়েও উদার তার মন। তিনি কোনদিন আমার সাথে হাসি-তামাশা করেননি। আমার রূপ-লাবণ্যের দিকে খারাপ নজরে তাকাননি। কত নির্জন বাস আমাদের অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু কোনদিন কর-স্পর্শ পর্যন্ত করেননি। জীবন তার পবিত্র। অন্তরে রয়েছে খোদার ভয়। অযথা আমাদের প্রতি খারাপ ধারণা করে গোনাহের বোঝা বহন করিসনে বোন।

তৃষ্ণা বলল, তুমি আমার কথায় রাগ করেছ বোধ হয়। আমি কি তোমাদের ব্যাপারে বদগুমানী করেছি? তোমাকে আর কেউ না চিনতে পারলেও আমি তো শৈশবকাল থেকেই তোমার আমল-আখলাক ও পরহেজগারী সম্বন্ধে জানি। কিন্তু তোমাদের এই চলাচলে পর্দার খেলাপ হচ্ছে, এটা এখনো বলি তখনও বলব। এতে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাই যেভাবেই হোক আমি অতিসত্বর তোমাদের বিবাহ সম্পাদন করবই করব ইনশাআল্লাহ।

ছায়েমা বিনয়সুরে তৃষ্ণাকে বলল, আমার একটা কথা রাখবে কি বোন?

কি কথা? জিজ্ঞেস করল তৃষ্ণা।

সায়েমা বলল, তোমাদের আশাই পূর্ণ হোক। তোমাদের আকাঙ্খাই সফল হোক। তবে আমার ইচ্ছা হল, আমার বিয়েটা সুসম্পন্ন হোক জিহাদের ময়দানের খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল পথে। আমার জীবনের আশা-আকাঙ্খার মধ্যে এটিও একটি। হযরত সাহাবায়ে কেরামগণের (রাঃ) কারো কারো শাদী জিহাদের ময়দানে হয়েছিল। যেমন ইসলামের চরম দুশমন আবু জেহেলের পুত্র ইকরিমা (রাঃ)-এর বিধবা স্ত্রী উম্মে হাকীম (রাঃ)-এর দ্বিতীয় বিবাহ হযরত খালিদ বিন ছাইদ (রাঃ)-এর সঙ্গে জিহাদের ময়দানে হয়েছিল। এই নবদম্পতি জিহাদের ময়দানে খরছুছ নামক স্থানে এক খিমায় বাসর রজনী পালন করেন। জিহাদের ময়দানে বাসর মিলনে উম্মে হাকীম (রাঃ) অমত প্রকাশ করলে খালিদ বিন ছাইদ (রাঃ) বলেন, "আরে

আমি তো আগামীকালই শহীদ হয়ে যাব, কেন এতো অভিভান করছ।” অতপর উম্মে হাকীম (রাঃ) রাজি হয়ে গেলেন।

তারা ময়দানের একপাশে একটি তাঁবুতে রাত্রিযাপন করেন। ভোরে অলিমার আয়োজন হচ্ছিল। এমন সময় তুমুল লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। খালিদ বিন ছাইদ বীরবিক্রমে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদাতবরণ করেন। উক্ত জিহাদে উম্মে হাকীম (রাঃ) তাঁবুর খুঁটি হাতে নিয়ে কাফেরদের সাথে লড়াই করে ৭ জন বড় বড় কাফেরকে হত্যা করে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। সে হিসেবে আমিও চাই আমার বিবাহ জিহাদের ময়দানে সুসম্পন্ন হোক।

তৃষ্ণা ছায়েমার কথা শুনে বলল, তোমার অভিপ্রায় শুনলাম। তবে মানুষের সব আশাই পূরণ হয় না। আর জিহাদের ময়দানে বিবাহ হওয়া জরুরীও নয়। শুভ কাজ যে কোন স্থানেই হতে পারে। খোবায়েব ভাইয়া ফিরে এলেই তোমাদের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হবে। আমি এখন থেকেই বিবাহের আয়োজন করছি। এলাকার লোকজনকে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন করাব। আমার উপঢৌকনের গহনাগুলো তোমাকে পড়ানো হবে। আমি নিজ হাতে তোমাকে বউ সাজাব। কি মজাটাই না হবে! বৃদ্ধাও এতে খুশী। ছায়েমা মুচকি হেসে গৃহ ত্যাগ করল।

[তিন]

বিকেল আনুমানিক তিনটার দিকে তোরাব হারুনী এবং মৌলভী জুবায়ের আলওয়ানে এসে আল্লামা নজির আহমদ আলওয়ানী সাহেবের নিকট পৌঁছলেন। সালাম-মুসাফাহা ও কুশলাদী বিনিময়ের পর মৌলভী জুবায়ের বললেন, “হুজুর! আমরা বহুদূর থেকে আপনার নিকট এসেছি। আশা করি, আমাদের দ্বীনি সমস্যার সমাধান দেবেন।”

হযরত সমস্যা জানতে চাইলে তোরাব হারুনী বললেন, “মুহতারাম! বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী, এ ব্যাপারে আমরা সন্ধিহান হয়ে পড়েছি। আলেম-ওলামা, মসজিদ-মাদ্রাসা, টুপি-দাড়ির ওপর আঘাত, মা-বোনদের ইজ্জতের উপর আঘাত।

এহেন পরিস্থিতিতে কেউ বলছেন, জিহাদ ছাড়া বিকল্প নেই। আবার কেউ বলছেন, ওরা বুঝে না তাই এ ধরনের জুলুম করছে, তাই ওদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় বাঁচার উপায় নেই। আবার কেউ বলছেন, আমাদের আমল খারাপ হয়ে গেছে, তাই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর গজব। তাই বেশি বেশি তওবা, ইস্তিগফার ও দোয়া করতে হবে। এছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। আমাদের এলাকায় কিছু যুবক জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে তৈরি হওয়ায় আমাদের ইমাম সাহেব ও ৪-৫ জন লোক এর চরম বিরোধিতা করছেন এবং চ্যালেঞ্জ করেছেন, যদি কোন আলেম বলতে পারে বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে আইন, তবে দলিল-প্রমাণসহ যেন তার কাছে হাজির হয়। হুজুর! আমাদের দরখাস্ত হল, আল্লাহর ওয়াস্তে যদি একটু কষ্ট করে আমাদের ওখানে গিয়ে সঠিক মাসআলাটি বলে দিয়ে আসতেন, তাহলে আমাদের খুবই উপকার হত।

আল্লামা নজির আহমদ আলওয়ানী সাহেব প্রশ্ন করলেন, এ সমস্ত উক্তি যারা করছেন, তারা আলেম না জাহেল? আর যে ইমাম বর্তমানে জিহাদের বিরোধিতা করছেন, তিনি কোন্ মাযহাবের লোক? এদের সকলের উক্তিই কুরআন ও হাদীসের খেলাফ। জিহাদের বিরোধিতা করলে ঈমান থাকে না। যা হোক, সে কথা পরে হবে।

তিনি আরো বললেন, বাবারা! আমি তো এখন কোথাও যাই না। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের কারণে ঘরে বসেই আল্লাহ আল্লাহ করে সময় কাটাই। আপনারা যে সমস্যা নিয়ে এসেছেন, এ ব্যাপারে ঘরে বসে থাকা জায়েয নয়। এটাও জিহাদেরই অংশ। ঠিক আছে, কষ্ট হলেও যাব। তবে পথ তো অনেক দূরের, যাব কী ভাবে?

হারুনী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, হুজুর! আপনাকে আমরা গাড়ীতে করে নিয়ে যাব এবং বাড়ী পৌঁছে দেব।

তারপর দিন-তারিখ ঠিক হল।

বৃদ্ধ আলেম আল্লামা নজির আহমদ আলওয়ানী তোরাব হারুনীর এলাকায় আগমন করলেন। জিহাদ বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হল। সভায় স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও

এলাকার সর্বস্তরের লোকজন হাজির হল। এমনকি পর্দার আড়ালে মহিলারাও এসে ভীড় জমাল। এলাকার চেয়ারম্যান সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হল। তারপর স্থানীয় ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে জিহাদ বিরোধী উক্ত ইমাম সাহেবকে বক্তব্য রাখান জন্য বলা হল।

ইমাম সাহেব হামদ ও সালাতের পর বললেন,

"প্রিয় এলাকাবাসী! কিছুদিন পূর্বে বুখারার সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি ফতোয়া ছাপিয়ে বিলি করা হয়। তাতে উল্লেখ রয়েছে, আমরা নিরস্ত্র আর আমাদের দুশমন সশস্ত্র। আমরা দুর্বল আর প্রতিপক্ষ সবল। ওদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া আত্মহত্যারই নামান্তর। সেখানে আরো উল্লেখ রয়েছে, 'সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী ও হুকুমতের বিরোধিতাকারীদেরকে শরীয়তের ভাষায় 'বাগী' তথা বিদ্রোহী বলা হয়। আর বাগীর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড'। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, 'বলসেভিকরা তো ইবাদত-বন্দেগীর বিরোধিতা করছে না। যারা বলসেভিকদের বিরোধিতা করে, তাদের বেলায় তারা কঠোরতা অবলম্বন করছে। কাজেই কমিউনিজমের আদর্শ মেনে নিলে ঈমানের মধ্যে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।' আরো বলা হয়েছে যে, 'যারা জিহাদের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তাদেরকে ধরে হুকুমতের হাতে তুলে দেয়া আবশ্যক। আমি আপনাদেরকে যা কিছু বলেছি, তা ফতোয়ার আলোকেই বলেছি।"

ইমাম সাহেব আরো বললেন,

"জাতীয় ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রত্যেক ইমামকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ৪৫ দিনব্যাপী যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেখানেও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য ইমামদেরকে এগিয়ে আসতে বলা হয়েছে। মাইকে আযান দেয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে বলা হল, নবীর যুগে মাইকে আযান দেয়ার প্রচলন ছিল না। শুধু উচ্চ আওয়াজে আযান দিতে বলা হয়েছে। কাজেই মাইকে আযান দেয়া বেদাত বা কুসংস্কার।"

এতটুকু বলে ইমাম সাহেব বিদায়ী সালাম প্রদান করে বসে পড়লেন।

ইমাম সাহেবের আলোচনা শেষ হলে হামদ ও সালাতের মাধ্যমে আল্লামা নজির আহমদ আলওয়ানী তার বক্তব্য শুরু করলেন–

“প্রিয় দেশবাসী! আজ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা উপেক্ষা করে মৃত্যুর বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিছু বলতে ইচ্ছা করেছি। আমার দিল সাক্ষ্য দিচ্ছে, আজকের আলোচনার পর আমি আর বেশীদিন আপনাদের মাঝে থাকব না। আমার অন্যান্য ভাইদের সাথে আমিও জান্নাতে মিলিত হব। হয়ত আমাকেও শহীদ করে দেয়া হবে। হয়ত এটাই আমার জীবনের শেষ আলোচনা। কাজেই আশা রাখি, আপনারা দিলের কান দিয়ে আমার কথাগুলো শুনবেন। সময়ের স্বল্পতায় দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি বিভিন্ন কিতাবাদী থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। প্রিয় দেশরাসী! বর্তমানে পৃথিবীতে যে ক'টি শাসন ব্যবস্থা চালু আছে, তন্মধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও সামরিক শাসনই উল্লেখযোগ্য। এ চারটি শাসন ব্যবস্থার কোনটিকেই ইসলাম সমর্থন করে না। এগুলো মানব-রচিত আইন বা বিধান। আইন প্রবর্তনের একমাত্র মালিক আল্লাহ। উক্ত আইন বা শাসন ব্যবস্থাগুলো কোনটি সরাসরি কুফরী। আবার কোনটি পরোক্ষভাবে কুফরী। কাজেই এ সমস্ত শাসনব্যবস্থা পরিহার করা ওয়াজিব। আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করা প্রত্যেকের উপর ফরয। যারা কমিউনিজমে বিশ্বাসী, তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং তারা কাফের।

প্রিয় দেশবাসী! আপনারা জানেন, বলসেভিকরা হাজার হাজার হক্কানী আলিমকে শহীদ করে দিয়েছে। তাদের অপরাধ, তারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কথা বলতেন, সত্য ও হক কথা বলতেন। তাছাড়া আরো একটি অপরাধ ছিল, তারা জিহাদ করা ফরয বলতেন। এগুলো ছাড়া তাদের আর কোন অপরাধ ছিল না। জিহাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আলেম ফতোয়া দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কুরআন-হাদীসের তেমন এলেম নেই। অল্প কয়েকজনের নাম যদিও ফতোয়ার কাগজে আপনারা দেখেন, তাতে বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের থেকে দস্তখত নেয়া হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী! মহান রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত লক্ষ্যাধিক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকলেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এ তালিম দিয়েছেন। জান্নাতের শান্তি আর জাহান্নামের শাস্তির খবর দিয়েছেন। সকলেই তাদের যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন। এতে অল্পসংখ্যক মানুষ ঈমান এনেছে। যারা ঈমান এনেছে, তারা হল মুসলমান। তারা নবীর তরিকা মত আল্লাহর সমস্ত হুকুম পালন করে থাকে।

প্রিয় দেশবাসী! আসমান-জমিনের একমাত্র মালিক আল্লাহ। যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে; তারাই ফরমাবরদার বান্দা। দুনিয়ার শাসনকার্য পরিচালনা করার হকদার মুসলমান। তারাই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন জারি করবে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। আর যারা কাফির, তারা মুসলমানের গোলাম হিসেবে দুনিয়াতে বসবাস করার অনুমতি রয়েছে। তারা (কাফেররা) জিযিয়া (কর) প্রদান করবে। তারা কোন ফেৎনা-ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে পারবে না। এই শর্তগুলো মেনে থাকলে তাদের জানমাল ও ইজ্জতের হেফাজত ইসলাম করবে। এ সমস্ত শর্ত মেনে যদি তারা ৩৩ কোটি দেবতার পূজা করে, তবে ইসলাম বাধা দেবে না। কিন্তু পরকালে আল্লাহ তাদের জন্য মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

প্রিয় দেশবাসী! এক লাখ বা সোয়া লাখ নবীকে আল্লাহতায়ালা দলিল-প্রমাণসহ প্রেরণ করে মানবজাতিকে দ্বীন বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তারপরও বেঈমানরা ঈমান আনয়ন করেনি। তদুপরি তারা ফেৎনা-ফাসাদে লিপ্ত হয়ে দ্বীনের দীপ শিখাকে নির্বাপিত করতে চায়। মনে হয় আল্লাহতায়ালা অতিষ্ঠ হয়েই কিয়ামতের পূর্বক্ষণে আমাদের প্রিয়নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামিন, খাতামুল নাবিয়্যীন, আমীরুল মুজাহিদীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে তলোয়ার দিয়ে প্রেরণ করেছেন বল প্রয়োগের মাধ্যমে কুফরী ফেৎনার মূলোৎপাটন করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে।

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমাকে কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তলোয়ার দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তলোয়ারের নীচে আমার রিযিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যারা আমার আদর্শ বাদ দিয়ে অন্যের আদর্শ গ্রহণ করবে, তাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত। আর যারা আমার অনুসরণ-অনুকরণ বাদ দিয়ে বিজাতির আনুগত্য করবে, তারা তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে।" (সাহীহুল জামিউস সগীর লিল আলবানী ঃ ২৮২৮ নং হাদীস)।

প্রিয় দেশবাসী! কুফরী ফেৎনার মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীকে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন—

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৩৯)।

প্রিয় দেশবাসী! জিহাদ দু'প্রকার—১. আক্রমণমূলক জিহাদ, ২. প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। আক্রমণমূলক জিহাদ হল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বছরে কমপক্ষে একবার দারুল হরবে অর্থাৎ কাফের রাষ্ট্রে প্রবেশ করে ওদেরকে খুঁজে বের করে আক্রমণ করা। যদিও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়নি বা পরিকল্পনাও করেনি। কাফেরদেরকে সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত রাখাই এর উদ্দেশ্য। আর আক্রমণমূলক জিহাদের নিম্নস্তর হল, মুসলিম কর্তৃক কাফেরদের সীমান্ত বন্ধ করে রাখা। অতএব, মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের উপর ফরয হল, বছরে কমপক্ষে একবার কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা। আর মুসলিম সর্বসাধারণের দায়িত্ব হল সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করা। আর যদি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কাফেরদের রাষ্ট্রে সৈন্য না পাঠান, তবে গুনাহগার তবেন তিনি। (ফতোয়ায়ে শামী, ৩য় খণ্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)।

প্রিয় দেশবাসী! ইসলামী আইন শাস্ত্রের অভিজ্ঞ আলেমগণ বলেন, আক্রমণমূলক জিহাদের উদ্দেশ্য হল, কাফেরদেরকে কর প্রদানে বাধ্য করা। আর উসূলে ফেকাহবিদগণের মতামত হল, বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা এ পর্যন্ত যে, হয়ত

পৃথিবীতে শুধু মুসলমান থাকবে, না হয় কাফেররা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি করে ও কর দিয়ে থাকবে। (হাশিয়াতুশ্ শিরওয়ানী ওয়া ইবনিল কাসিম আলা তুহফাতিল মুহতামা)।

প্রিয় দেশবাসী! প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ হল কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করা এবং মুসলিম দেশে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার দায়ে কাফেরদেরকে বিতাড়িত করা। এটা সবসময়ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন। এতে কোন মাযহাবের আলেমগণের দ্বিমত নেই। নিম্ন বর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে সর্বযুগের সকল মাযহাবের ইমাম, মুহাদ্দিস ও মোফাসসিরগণের অভিমত হল, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে।

শর্তসমূহ হলো-

১. কাফেররা লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে।

২. কাফের ও মুসলমানগণ যুদ্ধের মুখোমুখি হলে।

৩. রাষ্ট্রপ্রধান কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলে।

৪. কোন মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দী হলে।

উল্লেখিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। তখন সন্তান পিতা মাতার অনুমতি ছাড়া, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া, গোলাম মালিকের অনুমতি ছাড়া, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পাওনাদারের অনুমতি ছাড়াই জিহাদে যোগদান করতে পারবে। কারো অনুমতির প্রয়োজন হয় না। যে শহর বা এলাকা কাফের কর্তৃক আক্রান্ত, সে শহর বা এলাকার জনসাধারণের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। উক্ত এলাকার জনসাধারণ যদি জিহাদ করে পরাজিত হয় বা অলসতা করে বা ভয়ে জিহাদ না করে, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। এতে রশদপত্র, বাহন ও খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা থাকুক বা না থাকুক। আহনাফসহ সকল মাযহাবের ইমামগণের অভিমত এটাই। (ইখতিয়ারাতুল ইসলামিয়া, ফতোয়ায়ে কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, ৬০৮ পৃঃ)।

প্রিয় দেশবাসী! হানাফী মাযহাবের আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন, কাফের কর্তৃক যদি মুসলিম সীমান্ত আক্রান্ত হয়, তবে সীমান্তবর্তী মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। আর

দূরবর্তী মুসলমানদের উপর হয় ফরযে কেফায়া। নিকটবর্তী মুসলমান যদি জিহাদ করে শত্রু বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখতে না পারে বা অলসতা করে বা ভয়ে জিহাদ না করে, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের মতই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কারো জন্য জিহাদ থেকে বিরত থাকার অবকাশ নেই। এভাবে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। (ফতোয়ায়ে শামী, ৩য় খণ্ড, ২৩৮ পৃঃ)।

আল্লামী কাসামী (রহঃ) আল্লামা ইবনে নুজাইম এবং ইবনুল হুমাম এ ধরনের ফতোয়াই প্রদান করেছেন। (বাদাইউস সানায়ে ৭ম খণ্ড ৭২ পৃঃ, আলবাহরুর রায়েক ৫ম খণ্ড ১৯১ পৃঃ, আল ফাতহুল কাদীর ১৯১ পৃঃ)।

মালেকী মাযহাবের অভিমত হল–

দুশমন যদি হঠাৎ করে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে, তখন দুশমনকে প্রতিহত করার জন্য সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় নারী-পুরুষ, দাস-দাসী, ছেলে-মেয়ে, গোলাম-মনিব ও শিশু এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সকলেরই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। (হাশিয়ায়ে দশুকী, ২য় খণ্ড, ১৭৪ পৃঃ)।

শাফেয়ীদের মতামত হল–

কাফের বাহিনী যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোন মুসলিম শহরে প্রবেশ করে, তবে ৪৮ মাইলের ভেতরে যারা বসবাস করবে, তাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় এবং ঐসব লোকদের উপরও জিহাদ ফরয হয়ে যায়, যাদের উপর স্বাভাবিকভাবে জিহাদ ফরয হয় না। যেমন- শিশু, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও নারী। (নিহায়াতুল মুহতায, ৮ম খণ্ড, ৫৮ পৃঃ)।

হাম্বলীদের মতামত হল–

১. কাফিররা যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের মুখোমুখি হলে,

২. কাফিররা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করলে,

৩. মুসলমানদের আমীর যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলে,

সকলের উপর জিহাদ ফরযে আইন। (মুগনী ৮ম খণ্ড, ৩৪৫ পৃঃ)।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন, মুসলিম ভূখণ্ড দখলের উদ্দেশ্যে

কাফেররা যদি মুসলিম দেশে অনুপ্রবেশ করে, তবে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য পর্যায়ক্রমে সকল দেশের মুসলমানদের উপর নিঃসন্দেহে জিহাদ ফরযে আইন। মুসলিম দেশগুলো শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে একই দেশের ন্যায়। এমতাবস্থায় কেউ কারো এজাযতের অপেক্ষা করবে না।

ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর বর্ণনা ও এটাই। উক্ত অবস্থাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'নফীরে আম' (সর্বাবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন) বলা হয়। (ফতোয়ায়ে কুবরা ৪র্থ খণ্ড, ৬০৮ পৃঃ)।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, রোমানরা মদীনায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে সীমান্তে সমবেত হয়েছিল। এখনো তারা মদীনায় প্রবেশ করেনি, আক্রমণ করেনি। শুধু যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। এমতাবস্থায় নবীর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহতায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন। এতে যদি সমস্ত মদীনাবাসীর উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়, তবে আমাদের ভূখণ্ডে কাফিররা (বলসেভিকরা) মসজিদ-মাদ্রাসা বন্ধ করে দিচ্ছে, মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করছে, আলেম-ওলামাদের শহীদ করছে, মুসলমানদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুণ্ঠন করছে; এমতাবস্থায় বলসেভিকদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয হবে না কেন? নিশ্চয়ই ফরয হবে। মুসলমানদের দ্বীন, জানমাল, ইজ্জত ও জ্ঞানবুদ্ধি যে কোন উপায়ে সংরক্ষণ করা ফরয। (জামেউল আহকাম, ৮ম খণ্ড, ১৫০ পৃঃ)।

১. ইজ্জতের উপর আক্রমণকারী যদি মুসলমানও হয়, তবু তাকে প্রতিহত করা সমস্ত ফকিহগণের মতে ফরয। প্রতিরোধ করতে গিয়ে যদি হত্যাও করতে হয়, তবে তাও করতে হবে।

২. জান ও মালের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে যদি হত্যাও করতে হয়, তা করেও প্রতিরোধ করা ফরয।

মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের অভিমতও তাই।

যে ব্যক্তি নিজের জান ও মালের সংরক্ষণ করতে গিয়ে নিহত হয়, সেও শহীদ। (ফতোয়ায়ে শামী ৫ম খণ্ড ৩৮৩ পৃঃ, মাওয়াহিবুল জালিল ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩২৩ পৃঃ, তুহফাতুল মুহতায ৪র্থ খণ্ড ১২৪ পৃঃ, আল

ইক্কনা ৪র্থ খণ্ড ২৯০ পৃঃ, আররওযাতুল বাহিয়্যা ২য় খণ্ড ৩৭১ পৃষ্ঠা, আল বাহরুযযাখ্যার ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬৮ পৃঃ, তাজুল উরুস ছহিহুল জামিউস সগীর লিল আলবানী, হাদীস নং ৬২৩১, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)।

ইমাম জাসসাস বলেন, কেউ যদি কাউকে হত্যার জন্য তলোয়ার উত্তোলন করে, তবে সমস্ত মুসলমানদের উপর ফরয হয়ে যায় আক্রমণকারীকে হত্যা করা। এতে কারো দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ১ম খণ্ড ২৪০২ পৃঃ)। এমতাবস্থায় আক্রমণকারী ব্যক্তি নিহত হলে জাহান্নামী হবে যদিও সে মুসলমান হয়। আর মজলুম ব্যক্তি নিহত হলে শহীদ হবে। এটা হল মুসলমান মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলে তার হুকুম। এমতাবস্থায় কাফেররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলে জিহাদ ফরয হবে না কেন? অবশ্যই ফরয হবে।

এতটুকু বলার পর ইমাম সাহেব প্রশ্ন করলেন, হুজুর! বলসেভিকরা তো মুসলমানদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তাছাড়া মুজাহিদরা আক্রমণ করে অন্যত্র চলে যায়। তখন বলসেভিকরা এই এলাকার নিরীহ মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতন আরম্ভ করে। এটা কিভাবে জায়েয হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর হযরত নাজির আহমদ সাহেব বললেন, শাইখুল হাদীস আল্লামা তাইমিয়া বলেন, কাফিররা যদি মুসলমানদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে যদি সৎ ও সম্ভ্রান্ত লোকও থাকে আর যদি হত্যা করা ছাড়া কাফিরদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে তাদেরকে হত্যা করে হলেও কাফিরদেরকে প্রতিহত করতে হবে, যেন অন্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করা যায়। তবে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়া যাবে না। গুলী ছুঁড়বে কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে। এতে যদি কোন মুসলমান মারা যায়, তাহলে কোন গোনাহ হবে না। এ ব্যাপারে সকল ইমামই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (মাযমাউল ফতোয়া ২৮ খণ্ড ৫৩৭ পৃঃ)।

প্রিয় দেশবাসী! আল্লাহতায়ালা বলেন,

"যদি মুসলমানদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা

তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপর যদি তারা একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত ৯)।

প্রিয় দেশবাসী! উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদেরকে দমন করার জন্য যুদ্ধের বিধান রয়েছে। এমতাবস্থায় বেঈমান ও নাস্তিক কমিউনিস্টদের জুলুম বন্ধ করার জন্য যুদ্ধ বা জিহাদ ফরয হবে না কেন? আপনারাই বিচার করুন, যারা জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন, তারা কি কুরআন-হাদীস অনুসারে দিয়েছেন, না মনগড়াভাবে দিয়েছেন। শত শত জনতার পক্ষ থেকে আওয়াজ এলো— নিশ্চয়ই তারা মনগড়া ফতোয়া দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন,

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং দেশের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড বা দেশ থেকে বহিষ্কার করা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" (সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ৩৩)।

এ নির্দেশ হল দেশের ডাকাত বা দেশের শান্তি বিনষ্টকারীদের জন্য। আর যদি কাফেররা মুসলমানদের জানমাল, ইজ্জত-আবরুর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাদেরকে প্রতিহত করা ফরযে আইন হবে না কেন? তার ব্যাখ্যা ফতোয়া প্রদানকারী নামধারী আলেমগণ দেবেন কি? আল্লামা তাইমিয়া বলেন, "ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা, যারা মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়াকে বিনষ্ট করতে চায়। (আল ফতোয়াল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, ৬০৮ পৃঃ)।

প্রিয় দেশবাসী! আমি এতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এবং বড় বড় কিতাবের উদ্ধৃতিগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আশা করি বুঝতে কারো বাকি নেই। অতএব, বলসেভিকদের বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করা সকলের উপর ফরয ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এতে শিশু এবং মহিলারাও বাদ যাবে না। তাদেরকেও জিহাদ করতে হবে। ওদের সাথে জিহাদ করতে গিয়ে যারা নিহত হবে, তারা নিঃসন্দেহে শহীদ হবে এবং সাথে সাথে জান্নাতে যাবে; এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তিনি আরো বলেন, ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি হল পাঁচটি। কলেমা, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। এ পাঁচটি খুঁটির যে কোন একটি বাদ দিলে বা অস্বীকার করলে সে আর মুসলমান থাকে না। যে কোন এবাদত করতে হলে ঈমান লাগবে। ঈমান ছাড়া কোন এবাদতই গ্রণযোগ্য হবে না এবং এর বিনিময়ে আখিরাতেও কোন কিছু মিলবে না। প্রত্যেক ইবাদতের মূল হল ঈমান। এটা মহামূল্যবান সম্পদ। আর এই ঈমানের বুনিয়াদ বা ভিত্তি হল তিনটি। মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন–

১. যে ব্যক্তি কালিম পড়েছে তার উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাক, কোন গোনাহের কারণে কাউকে কাফের বলো না, কোন বদ আমলের কারণে কাউকে ইসলামের বহির্ভূত মনে কর না। (হ্যাঁ, যদি প্রকাশ্যে কুফরী পাওয়া যায় তবে বলা যেতে পারে)।

২. যেদিন থেকে মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সেদিন থেকে এই উম্মতের শেষ লোকেরা (কাজ্জাব ও ফাত্তান) দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত এ জিহাদ চলতে থাকবে। কোন জালেম বাদশাহর জুলুম বা কোন ন্যায়পরায়ণ ইনসাফগার বাদশাহর ইনসাফ দ্বারা জিহাদকে বন্ধ করতে পারবে না।

৩. তাকদিরের উপর বিশ্বাস করা। (আবু দাউদ ও মেশকাত)

প্রিয় দেশবাসী! উক্ত হাদীসের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র জিহাদ হল ঈমানের দ্বিতীয় খুঁটি। কোন মুসলমান যদি জিহাদ বাদ দিয়ে মুমিন হওয়ান দাবী করে, তবে সে হবে মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ। কেউ যদি কোন কারণে বা অলসতা করে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ত্যাগ করে, তাহলে সে গোনাহে কবীরা করল কিন্তু বেঈমান হবে না (তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেবেন)। কারণ

এগুলো ইসলামের বুনিয়াদ– ঈমানের বুনিয়াদ নয়। আর জিহাদ ত্যাগ করলে মানুষ ঈমানদারই থাকে না। কারণ, জিহাদ হল ঈমানের বুনিয়াদ। তাই মহানবী (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধে লগাতার কয়েক ওয়াক্ত নামায তরক করেছেন জিহাদের কাজ করতে গিয়ে। তিনি ইসলামের বুনিয়াদ নামায তরক করে ঈমানের বুনিয়াদ জিহাদকে ঠিক রেখেছেন। কাজেই, জিহাদ ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

প্রিয় দেশবাসী! আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বলসেভিকরা হাজার হাজার হক্কানী আলেমকে নির্মমভাবে শহীদ করে দিয়েছে এবং হাজাব হাজার আলেমকে বন্দী করে নির্যাতন করছে। তাদের অপরাধ শুধু এটুকু যে, তারা হক্ব কথা বলতেন এবং কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতেন।

হে আমার মুসলমান ভাই ও যুবক বন্ধুরা! এ দেশের বড় বড় মাদ্রাসা ও বড় বড় মসজিদগুলোতে বলসেভিকদের গুপ্তচর ঢুকেছে। তাদের উচ্চ প্রশিক্ষণ দিয়ে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় পূর্ণ শিক্ষা দিয়ে আলেমের বেশ ধরিয়ে তোমাদের মাঝে ছেড়ে দিয়েছে। কেউ শুধু তালিমের উপর জোড়ালো বয়ান করে, কেউ শুধু দাওয়াতের উপর গুরুত্ব দেয়, কেউ শুধু আত্মশুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেয়। একদল অন্য দলকে দেখতে পারে না। এভাবে তারা পুরো জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। কেউ ইলম চর্চাকেই একমাত্র দ্বীনের কাজ বলে দাবী করছে। আর নামধারী ব্যবসায়ী পীরেরা আত্মশুদ্ধির দোহাই দিয়ে এটাকেই একমাত্র কাজ বলে দাবী করছে। এ সবগুলো দলই পৃথক পৃথকভাবে জিহাদের বিরোধিতা করে উম্মতকে জিহাদ থেকে বিরত রাখছে। এগুলো হল বলসেভিকদের অতি সূক্ষ্ম কূটকৌশল। অর্থাৎ মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য তালিমের বেশে মাদ্রাসায়, তাবলীগের বেশে তাবলীগে, ইমামের বেশে মসজিদে, পীরের বেশে খানকায় ঢুকে পুরো সমাজকেই ওরা গ্রাস করে নিয়েছে। এদের চালাকী সরলমনা মুসলমানগণ মোটেই ধরতে পারে না।

প্রিয় দেশবাসী! সাবধান, সাবধান, সাবধান! ওদের খপ্পরে পড়ে ঈমানহারা হবেন না। এ আগ্রাসন ঠেকাতে হলে জিহাদ ছাড়া অন্য কোন আমল নেই। হে যুবকরা! তোমরা জাগো, হাতে অস্ত্র তুলে

নাও। দেশ বাঁচাও, দ্বীনকে রক্ষা করো। ঝাঁকে ঝাঁকে শাহাদাতবরণ করে জান্নাতে চলো। ঐ সমস্ত গুপ্তচর আলেমের বেশধারী ধোঁকাবাজদের কবলে পড়ে ঈমান ধ্বংস করো না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার বিধান ফরয জিহাদকে আদায় করে দ্বীনকে বিজয়ী করার তাওফীক দাও। আমীন।

এই বলে আল্লামা নাজির আহমদ আলওয়ানী সাহেব বয়ান শেষ করেন। উক্ত বয়ানের পর বাড়ী ফেরার পথে বলসেভিকরা আল্লামা নাজির আহমদ আলওয়ানী সাহেবকে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়।

আল্লামা নজির আহমদ আলওয়ানীর তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে বোকাইলীর জনসাধারণের ঘুম ভেঙ্গে গেল। জাগরণের নবজোয়ারে হৃদয় কানায় কানায় ভরে গেল। টগবগে যুবকদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রতিশোধের শোণিতধারা সঞ্চালন হতে লাগল। শাহাদাতের সুধা পান করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। সাড়া পড়ে গেল বোকাইলীর ঘরে ঘরে। মায়েরা নিজ সন্তানদেরকে জিহাদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে লাগল। বউ-ঝিরা স্বামীদেরকে জিহাদে যাওয়ার জন্য নানা ধরনের ভর্ৎসনা বাক্য উচ্চারণ করে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। পিতারাও মায়াজাল ছিন্ন করে সন্তানদেরকে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে যেতে উৎসাহ দিতে লাগল। এমনকি মহিলারাও স্বামী থেকে যুদ্ধের অনুমতি নিয়ে তৈরি হতে লাগল।

[চার]

যামিনীর আঁধার নাশিয়ে সূর্যটা পূবাকাশে উদিত হয়ে ক্রমশ অগ্নিশর্মা ধারণ করে পুরো দুনিয়াটা যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পাগলপ্রায়। আবার ক্লান্ত-শ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে মুখ থুবড়ে অস্তাচলে হারিয়ে যায়।

ছায়েমা প্রতিনিয়ত খোবায়েবের আগমনের পথপানে অঘুম নয়নে, অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। হয়ত হতভাগা এ মুহূর্তে ফিরে আসবে। হয়ত অনাহারে ওর প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত। তাই কিছু খাবার সবসময় মজুদ রাখতে হবে, যেন আসার সাথে সাথে সম্মুখে হাজির করা যায়। দূরে কোন কাফেলা দৃষ্টিগোচর হলেই মনে করে, ঐ বুঝি

খোবায়েব ফিরে আসছে। সংবাদ নিয়ে আসছে আনোয়ার পাশার। হয়ত প্রত্যুষেই আমাদের তুর্কমেনিস্তানের দিকে পা বাড়াতে হবে। এমনিভাবে কত কাফেলা আসে-যায়, কিন্তু খোবায়েব আসে না।

পালাক্রমে দিনরাত পরিবর্তন হচ্ছে। প্রহরের পর প্রহর, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু খোবায়েবের খবর নেই। বিরহ বেদনা ছায়েমার অন্তর ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। কুসুম সাদৃশ তনু নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। নীরব-নিথর একা একা বসে অশ্রু ঝরাচ্ছে। কেউ তো হৃদয় গহীনে অনুপ্রবেশ করে তার বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারে না।

তৃষ্ণা সবসময় ছায়েমার খানাপিনা, অযু-গোসল ও আরাম-আয়েশের দিকে নজর রাখে। শাসনের সুরে অনেক সময় ছায়েমাকে গোসল করানো, খাবার খাওয়া ও বিশ্রাম নেয়ার জন্য তাকিদ দেয়। তা সত্ত্বেও ছায়েমার দেহপল্লব কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। মনমরা ও নিরানন্দ জীবনযাপন করছে ছায়েমা।

খোবায়েবের বিরহ দহনেই তার এ অবস্থা। তাছাড়া চোখে তার জিহাদের স্বপ্ন। মনে মনে কত হামলাই না করছে আর বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কোন অভিযানই সে একা করছে না। খোবায়েবকে সঙ্গে রাখছে সব হামলাতেই। এ ধরনের কল্পনা শয়নে-স্বপনে, ভোর বিহানে ছায়েমার অন্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে মনে দুশমনের কেল্লায় প্রচণ্ড আক্রমণ করে বিজয়ী হয়ে গনীমতের মাল কুড়িয়ে এনে গরীব অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করছে। তাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে বলসেভিকরা যখন পালাতে থাকে, তখন অট্টহাসিতে লাফিয়ে উঠে ছায়েমা। এসব চিন্তা করে কখনো কখনো ভাবনার গহীন বনে হারিয়ে যায়। ছায়েমা মনে মনে কল্পনা করে, আমি তো ঘোড়া দৌড়াতে পারি না। দু'এক বার যাও আরোহন করেছি, তা অন্যের সাহায্যে। যুদ্ধের জন্য অস্ত্র চালনা শিক্ষা করা তো খুবই জরুরী। তাই তো ঘোড়সয়ারের প্রয়োজনীয়তার কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। না, আজ থেকেই আমাকে অশ্রারোহন শিখতে হবে।

যেমন পণ তেমন কাজ।

ছায়েমা প্রতিদিন গাত্রোত্থান করে ফজরের নামায আদায় করে তিলাওয়াতে বসে। একটানা ৩ পারা তিলাওয়াত করে পোশাক পাল্টিয়ে তোরাব হারুনীর ঘোড়া নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ঘোড়া তাকে দু'এক দিন খুবই বিরক্ত করেছে। ছায়েমা ঘোটকের পৃষ্ঠদেশে সওয়ার হওয়ার পর হয়ত দাঁড়িয়ে থাকে, না হয় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করে। এতে অশ্বপৃষ্ঠে বসে থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। কখনো কখনো ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু ছায়েমার প্রত্যয় দৃঢ়। ঘোড়ার এরূপ আচরণে জিদ ধরে বসল ছায়েমা– শক্ত জিদ। যেভাবেই হোক তাকে অশ্ব চালানো শিখতেই হবে। সে হবে একজন অশ্বারোহী সৈনিক।

তাছাড়া আরো একটি জান্নাতি আনন্দ তার অন্তরে দোলা খাচ্ছে। তাহল, খোবায়েব ফিরে এলে ঘোড়সওয়ারী প্রতিযোগিতায় তাকে হারাবে। কারণ, খোবায়েব ঘোড়সওয়ারে ততো পাকা নয়। খোবায়েবকে হারিয়ে বিজয়ী হবে ছায়েমা। এসব দুষ্টুমী চিন্তা তার পেটে পেটে। এভাবে চার-পাঁচ দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ছায়েমা ও অশ্বের মাঝে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন হল। যেমন দু'মেরুর মাঝে সেতুবন্ধন। কখন কি করতে হয়, তা কিছু কিছু ধরতে পেরেছে।

তোরাব হারুনী ও তৃষ্ণা ছায়েমার কাণ্ড দেখে শুধু হাসে। বেশ ক'দিন কয়েকবার অশ্ব থেকে পড়ে গিয়ে কুঁকিয়ে উঠেছিল ছায়েমা। তা ওরা দেখেনি। দেখলে হয়ত তাদের হাসি থামত না।

সকাল-বিকাল দু'বেলায়ই এখন চলছে অশ্বারোহনের অনুশীলন। আবার ছুটে চলে দূর থেকে বহুদূরে। হারিয়ে যায় নিরুদ্দেশে। পবনবেগে দৌড়াতে পারে তার পাগলা ঘোড়া। আনন্দের সীমা পেরিয়ে ছুটে যায় মহানন্দের ওপারে। খুশীতে বাক্‌বাকুম। ঘোড়দৌড় এখন তার নতুন স্বপ্ন। আবার চাঁদনী রাতেও কিছু সময় তাকে অশ্ব নিয়ে দৌঁড়াতে দেখা যায়।

এভাবে দু'তিন সপ্তাহের মধ্যেই ছায়েমা অশ্ব চালনায় একজন সুদক্ষ সিপাহী বনে গেল। এখন প্রশস্ত রাস্তা থেকে নিয়ে সরু ও আঁকাবাঁকা পথে, পাহাড়ী এলাকায় বন-জঙ্গলেও কংকরময় প্রান্তরে

অশ্ব ছুটানো তার জন্য কোন ব্যাপার নয়।

ছায়েমা খুশীতে বাক্‌বাকুম। মনে মনে ভাবে, খোবায়েব ভাইয়া এবার আসুক, মজা দেখাব। আরো কত ভাবনা তার মনে। একবার তৃষ্ণা কৃত্রিম বিরক্ত ভরে ছায়েমাকে বলল, তুমি না একজন সুন্দরী তরুণী। অশ্ব দৌড়ানো কি তোমার জন্য শোভা পায়? দিনমান যুবকদের মতো অশ্ব নিয়ে ছুটাছুটি কর, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। এভাবে কি তোমার দিন যাবে বোন?

ছায়েমা তৃষ্ণাকে স্পষ্ট ভাষায় গ্রীবা নাড়িয়ে বলল, তুমি কিচ্ছু বুঝ না। মনে হয় একেবারে ছোট্ট খুকী তুমি। আমাকে বলসেভিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। তাই যুদ্ধের যাবতীয় কলাকৌশল রপ্ত করতে হবে। তুমি ভাবতে পার আমি মেয়ে মানুষ, অশ্ব চালানো ঠিক নয়। যদি তা-ই হয় তোমার চিন্তার সাথে কুরআন-হাদীসের কোন মিল নেই। উম্মুহাতুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) জঙ্গে জামালে সিপাহসালারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। আমিও আজ সে সুন্নতকে জিন্দা করতে চাচ্ছি। তৃষ্ণা মুচকি হেসে বলল, কোনদিনই কোন বিষয়ে তোমার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারি না। আজ বুঝি পারব!

এবার ছায়েমা কয়েক ধাপ এগিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন কৌশল শিখতে আরম্ভ করল। যেমন— অশ্বের পৃষ্ঠদেশে আসন গেড়ে বসে, কখনো শুয়ে, কখনো দাঁড়িয়ে দৌড়ানো। আবার কখনো ঘোড়াকে ক্রলিং করানো ইত্যাদি। ছায়েমা এখন রীতিমত দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে মাইলের পর মাইল দৌড়াতে পারে। রাস্তার দু'ধারে শত শত দর্শক প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকে এই দৃশ্য অবলোকনের অভিপ্রায়ে।

বুকাইলীর প্রতিটি মানুষের প্রিয়জনে পরিণত হল ছায়েমা। অল্প দিনের মধ্যেই পুরো এলাকার তার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ল। যেন সবাই তার আপনজন। এছাড়া সবাই জানে ছায়েমা তোরাব হারুনীর আত্মীয়। তাই সকাল-সন্ধ্যা ভীড় জমায় আশপাশের গ্রামের যুবকরা। যুবকদের ভালবাসা উপচে পড়ে ছায়েমার উপর। কিন্তু ছায়েমা সবসময় যুবকদের এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে। তবে সকলের সাথেই

হাসিমুখে কথা বলে। মাঝে-মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদেরকে আনন্দ দেয়। ছায়েমা এবার সকলের ভাই, সকলের আপনজন। সকলেরই বন্ধু ও প্রিয়তম।

যুবকদের পাশাপাশি যুবতীরাও পিছিয়ে নেই। তারাও রীতিমত দল বেঁধে ছায়েমার সাথে দেখা করতে তোরাব হারুনীর বাড়িতে যাওয়া-আসা করে। সত্যিকার অর্থে, ছয়েমার জন্য পাগল না হয়ে থাকতে পারে এমন ক'জন আছে? যুবকরা চায় বন্ধু হিসেবে তাকে কাছে পেতে। যুবতীরাও চায় প্রেমিকা সেজে চিরদিন তার সাথে ছায়ার মত থাকতে।

ছায়েমার কার্যকলাপে মনে হয় সে একজন বিচক্ষণ, চতুর, চঞ্চল ও কর্মঠ যুবক। আবার কথা-বার্তায়, আকার-আকৃতিতে মনে হয় চঞ্চলা হরিণী সাদৃশ্য তরুণী। কিন্তু কেউ-ই তার আসল পরিচয় বুঝতে পারে না।

ছায়েমার প্রতি যুবক-যুবতীদের যে মমতা ও ভালবাসা, তাকে কাজে লাগাতে সে ফন্দি আঁটতে থাকে, কিভাবে এই যুবসমাজকে দ্বীনের পথে, ধর্মের পথে, জিহাদের পথে ফিরিয়ে আনা যায়। এ নিয়ে সারাক্ষণ ভাবনায় বিভোর ছায়েমা, অবশ্যই তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর সম্মুখে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তাকে।

ছায়েমা এরই মধ্যে একদিন অপরাহ্নে তোরাব হারুনীর বাড়ির দক্ষিণের সবুজ-শ্যামল প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণীদের লক্ষ্য করে দৃপ্তকণ্ঠে ভাষণ দেয়-

"ওহে আমার প্রাণপ্রিয় ভাই ও বোনেরা! আজ আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, মলিন বদনে তোমাদের দু'চারটি কথা বলতে চাই। আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো গ্রহণ করবে।"

ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে সবাই ছায়েমার মুখের দিকে তাকায়। ছায়েমা সুললিত ভাষায় মধুরকণ্ঠে পবিত্র কালামে পাক থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে বলল-

"মহামহিম বিধাতা পবিত্র কালামে এরশাদ করেন, 'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ

অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন। যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। তিনি প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে যেন তাকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন। যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।' (সূরা তাওবা ঃ আয়াত ৩২–৩৩)।

উক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, কাফের-মুশরিক ও বেইমানরা আল্লাহর দ্বীনকে নিভিয়ে দিতে উদ্যত হলেও আল্লাহ তা রক্ষা করবেন। যদিও তাদের কাছে তা হলাহল মনে হবে।

অপর আয়াতে আল্লাহ নবী বা রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন, 'আল্লাহ নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন অন্যসব ভ্রান্ত ধর্মের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য।'

মানব রচিত যত ধর্ম দুনিয়াতে থাকুক না কেন, একমাত্র ইসলামকেই অন্যসব ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এটা ঈমানের দাবীদার প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান ছাড়াও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রভাবে সত্যধর্ম ইসলামের আলোকরশ্মি ম্লান হতে চলেছে। নবীর যুগ থেকে সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগ পর্যন্ত ইসলাম অর্ধ-পৃথিবীতে অন্যসব মতবাদের ঊর্ধ্বে শির উঁচিয়ে স্ব গৌরবে দণ্ডায়মান ছিল। আজ ইসলামের বিজয় পতাকা ভূলুণ্ঠিত। পবিত্র হেজাজ ছিল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ও জন্মভূমি। সেখান থেকেও বিতাড়িত ইসলাম আজ অসহায় হয়ে কেঁদে কেঁদে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। বিশাল জগতে আজ ইসলামকে এক ইঞ্চি জায়গা দিতেও ব্যর্থ হচ্ছে। ইসলামের জন্ম হয় মক্কায়, মৃত্যু হয় দামেস্কে এবং সমাধিস্থ হয় বাগদাদে।

হে আমার প্রাণপ্রিয় তরুণ সমাজ! মুসলমান হওয়ার অপরাধে বলসেভিকরা আমাদেরকে পাঠার মত বলি দিচ্ছে, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে, হায়েনাদের রোষানল থেকে মাছুম বাচ্চারাও রেহাই পাচ্ছে না। হরণ করে নিচ্ছে আমাদের স্বাধীকার ও সার্বভৌমত্ব, কেড়ে নিচ্ছে বাক্ স্বাধীনতা। হুমকীর সম্মুখীন আমাদের তাহজীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি। বেশ কতগুলো

মুসলিম স্বাধীন দেশ নিয়ে লেলিনবাদীরা বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ার স্বপ্ন দেখছে।

ওহে মুসলিম বীর সেনানীরা! তোমরা কি ভুলে গেছ তোমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস? ভুলে গেছ কি দ্বীগ্বিজয়ী বীরত্বগাঁথা পুরনো কাহিনী। তুমি তো ছিলে বীরের জাতি, তোমার কটিদেশে ঝুলতো শাণিত তলোয়ার, বক্ষে বাঁধা থাকতো লৌহবর্ম, মস্তকে ছিল শীরস্ত্রাণ, তুমি ছিলে শাসক জাতি। তোমার ছিল সিংহাসন আর মস্তকে ছিল রাজমুকুট! হে সিংহশার্দুল! একদিন তোমার গর্জনে কাঁপত বিশ্ব। কিন্তু আজ তুমি ইঁদুর ছানায় পরিণত হয়েছ। তুমি তো ছিলে চিরস্বাধীন, চির বাঁধা-বন্ধনহীন, ছিলে আজাদ। কেন আজ তোমরা কৃতদাসের ন্যায় জীবনযাপন করছ, তা কি একবারও ভেবে দেখনি?

হে যুব সম্প্রদায়! তোমরা ছিলে মহিয়ান-গরিয়ান প্রস্ফূটিত কুসুমের ন্যায় নির্মল, সুরভিত, সুশোভিত। তোমার হাতে শোভা পেত তলোয়ার। আজ তোমাকে দেখা যায় নর্দমা–ডাস্টবিন পরিস্কার করতে। তোমাকে দেখা যায় ধোপা–মুচি আর নরসুন্দরের কাজ করতে! একটিবার আঁখি মেলে তাকিয়ে দেখ তোমার অতীত ইতিহাস। তুমি নিজেকে জানার চেষ্টা কর, তুমি ইতিহাস থেকে তোমার পরিচয় সংগ্রহ কর। কাপুরুষতা, সংকীর্ণতা, হীনমন্যতা, দুর্বলতা ও অলসতা ঝেড়ে ফেলে আবার কোমড় সোজা ও শক্ত করে দাঁড়াও। বিজয় তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আল্লাহর রহমত ও নুসরত তোমাদের দিকে ধেঁয়ে আসছে।”

ছায়েমার তেজোদ্বীপ্ত ভাষণ শুনে উপস্থিত যুবক-যুবতীদের শিরায় শিরায় ও ধমনিতে ধমনিতে প্রতিশোধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হল। খালিদ বিন অলিদের শোণীতধারা শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হতে লাগল। সকলে একবাক্যে বলে ওঠল, “ওহে বীর পুরুষ! ওহে মুসাফির! আমরা তোমার নেতৃত্বে দ্বীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে আদৌ কার্পণ্য করব না। সবসময় বদান্যতার পরিচয় দিয়ে যাব ইন্‌শাআল্লাহ।”

যুবকদের স্বীকারোক্তিতে ছায়েমা তার শ্বেত দন্তপাটি বের করে মহাউল্লাসে হাসছে। যেন মেঘের আড়ালে কিরণমালী প্রভা বিচ্ছুরিত

করছে। ছায়েমার হাসি দেখে যুবকদের অন্তরে আনন্দের দোলা লাগল। হৃদয়ে হৃদয়ে পুলক–শিহরণে ঘুমন্ত প্রাণে সাড়া জাগল। শাহাদাতের পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে ছুটে চলার বজ্র শপথ নেয়। কেউ আজ পিছিয়ে নেই। তারা বলসেভিকদের উপর আক্রমণ করে দ্বীনকে এখনই বিজয়ী করতে পাগলপারা হয়ে উঠল।

[পাঁচ]

এতক্ষণে সূর্য নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে ঈষৎ রক্তবর্ণ ধারণ করে অস্তপারে দণ্ডায়মান। অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়ত গোধূলীতে হারিয়ে যাবে। ছায়েমা নামাজের অজুহাতে সকলকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করল।

তরুণ–তরুণীরা মন্থরগতিতে নির্বাক আননে পদযুগল সঞ্চালন করে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে লাগল। সকলের হৃদয়মন্দিরের বন্ধতোরণ খুলে কি একটা ভাবনা যেন স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসেছে। মনে মনে প্রতিশোধের পরিকল্পনা করছে। ক্রোধানলে জ্বলেপুড়ে ছাই হচ্ছে প্রতিটি অন্তর। সকলের চোখে-মুখে প্রতিশোধের অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সকলের মনে এসব চিন্তা ঘুরপাক খেতে খেতে কখন যে নিজস্ব নিবাসে পৌঁছল, তা কেউ টেরই পেল না।

নিশিথীনীর মধ্যপ্রহর পর্যন্ত কারো চোখে তন্দ্রা নেই। আছে শুধু একরাশ ভাবনা, আহ্, কত সুন্দর উপদেশ, কত মধুর বচন। সত্যি এ যুবক কোন মানুষ নয়, হয়ত আমাদেরকে তিমিরাচ্ছন্ন ও কণ্টাকাকীর্ণ পথ থেকে আলোর পথে, মুক্তির পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ এ সাধককে প্রেরণ করেছেন। কখন যামিনী পোহায়ে ভোর হবে, আবার যুবকের সান্নিধ্যে ছুটে যাবে, শুনবে তার সুমধুর মুখনিসৃত বাণী আর সঞ্জিবনী সুধা, কানায় কানায় ভরে যাবে হৃদয়–সে অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

ছায়েমা বাড়ি এসে নামায পড়ে তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করল। আধা পারা পাঠ করে ছুটে গেল খোবায়েবের বৃদ্ধা মায়ের ঘরে।

সকলে বৃদ্ধাকে আম্মি বলে ডাকে। তাই ছায়েমাও অন্যদের সুরে সুর মিলিয়ে আম্মি ডেকে ভেতরে প্রবেশ করল। তৃষ্ণাকে বলে খাবার এনে নিজ হাতে বৃদ্ধাকে খাওয়াল এবং নিজেও কিছু খেল। কেননা, আজ প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে প্রয়োজনীয় আহার্য তার পেটে ঢুকেনি। শুধু খোবায়েবের চিন্তায় এমনটা হয়েছে। অন্যসব রজনীর মতো বাক্যালাপে সময় ব্যয় না করে বিরহ বেদনা বুকে নিয়ে নিজ কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তৃষ্ণা ছায়েমার নীরবতা অবলোকন করে জিজ্ঞেস করল, ছায়েমা, তোমাকে কেমন অসুস্থ মনে হচ্ছে বোন!

ছায়েমা কোন উত্তর দেয় না।

নিঝুম রাত। আঁধারে ছেয়ে গেছে চারদিক। অঘুম নয়নে হতভাগিনী একাকী শয্যায় এপাশ-ওপাশ করছে। খোবায়েবের এখনো কোন খবর নেই। তাহলে কি সে দুশমনের হাতে বন্দী হয়েছে! নাকি আনোয়ার পাশার সাথে যোগ দিয়ে অভিযান চালাচ্ছে। নাকি নতুন কোন গ্রুপ তৈরি করে নিজেই অভিযানে মেতে উঠেছে। নানা প্রশ্ন এসে ছায়েমার অন্তর তাড়া করছে। সীমাহীন নৈরাশ্যে ছায়েমার অন্তর ফেটে চৌচির হওয়ার উপক্রম। অনুশোচনা ও আত্মগ্লানির তুষারানলে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হচ্ছে। শোকাকুল ছায়েমা একাকিনী গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট। অনাগত ভবিষ্যতের বীভৎস মূর্তি কল্পনা করে কাঁদছে। গৃহের ক্ষুদ্র দীপশিখার নিষ্প্রভ জ্যোতি বিরহিনীর সমবেদনা জানাতে যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কি একটা শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র চকিতে মাথা তুলে জানতে চাইল, খোবায়েব ফিরল কিনা। ছায়েমা ছায়েমা বলে মধুর কণ্ঠে ডাকছে কিনা। অধৈর্য হয়ে ছায়েমা এবার শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো আগারের বাইরে। ততক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদ গগনতলে উঁকি মেরে উদিত হচ্ছে। অস্পষ্ট ক্ষীণ আলোকবর্তিকায় দেখতে পেল, সমগ্র বিশ্বচরাচর স্বপ্নের আবেশে যেন নির্জীব-নিঃসাড়। ধরণীবক্ষে জন-প্রাণী একটিও জেগে নেই।

ছায়েমার মন আর সইছে না। একাগ্রচিত্তে ভাবছে, এখনই ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে যাবে খোবায়েবের সন্ধানে সুদূর তুর্কিস্তানে। খোবায়েবের যাত্রাপথের কাল্পনিক দৃশ্যাবলী ছায়েমার মানস নেত্রে

চিত্রপটের ন্যায় ফুটে উঠেছে। তার বন্ধনহীন কল্পনার স্রোতপথে-প্রান্তরে, গিরি-শিখায়, উষর ভূমে কেবলই ছুটে বেড়াচ্ছে খোবায়েবের সন্ধানে। অবিরাম কল্পনা স্রোতে ভেসে ভেসে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছায়েমা পুনঃ শয্যায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

প্রভাত সমীরণ একটু পরেই বইতে লাগল। বনের পাখীরা ইতিমধ্যে একে একে জেগে উঠার আবাহনী শুরু করে দিয়েছে। ছায়েমা অন্যদিনের মত গাত্রোত্থান করে নামাযে দণ্ডায়মান হল।

ভোর ৬টা। কুয়াশায় ঢাকা সারা দুনিয়া। পার্শ্ববর্তী মহল্লার যুবক-যুবতীরা ঘুম থেকে উঠেই কেউ হাত-মুখ ধুয়ে, কেউবা মিসওয়াক করতে করতে তোরাব হারুনীর নিবাসের দিকে ধেয়ে আসছে। বাঁধনহারা স্রোতস্বিনীর ন্যায় আঙ্গিনা কানায় কানায় ভরে উঠে। বৃক্ষ পল্লব থেকে এখনো ফোঁটা ফোঁটা শিশির ঝরছে।

ছায়েমা তিলাওয়াতে মশগুল। আকস্মাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বাতায়নের ফাঁক দিয়ে বাইরে দৃষ্টিপাত করতেই দেখল, আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য। ছায়েমা জুতাজোড়া পরিধান করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল অপেক্ষমান জনতার মাঝে। সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ। ছায়েমা গুরুগম্ভীর সুরে সালামের উত্তর দিয়ে সবাইকে বসতে বলল।

সবাই শিশির ভেজা আঙ্গিনায় গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে গেল। ছায়েমা একবার ফিল্ড মার্শালের ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক গ্রীবা ঘুরিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে কি যেন দেখে নিল। তারপর সবাইকে সম্বোধন করে বলল–

"হে আমার টগবগে মুজাহিদ সাথী ও বন্ধুরা! এ নশ্বর জগতে আমরা চিরদিন থাকব না। এ সুন্দর বসুন্ধরায় রাজত্ব করেছিলেন কতই না রাজা-মহারাজ ও ভূপালেরা। কিন্তু তাদের সকলকেই নির্ধারিত সময়ে সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করে অন্ধকার কবরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমরাও এখানে চিরদিন থাকতে পারব না। আমাদেরকে হাজির হতে হবে বিচার দিবসে। হিসাব না নিয়ে কাউকে ছাড়া হবে না। আর হিসাব দিয়ে জান্নাতে যাওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন, চার ব্যক্তি বিনা

হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে–

১. নবীগণ, ২. ছিদ্দিকগণ (সত্যবাদী), ৩. ছালেহীন (নেককারগণ), ৪. শুহাদা (আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী)।

আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া কেউ নবী হতে পারে না। আর এখন নবুওতীর দরজাও বন্ধ। এখন আর কোন নবী আসবেন না। সে হিসেবে আমরা নবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব না। নবী হওয়ার আশা করা বা দোয়া করাও জায়েয নয়। কাজেই, আমাদের পক্ষে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়, ছিদ্দীকগণের দলভুক্ত হওয়াও আদৌ সম্ভব নয়, কেননা সিদ্দিক হওয়ার জন্য আল্লাহর হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক যখন যেভাবে নাজিল হয়েছে তা বিনা বাক্যে বিনা চিন্তায় অম্লান বদনে মেনে নেয়া জরুরী। সোয়া লাখ সাহাবীর মধ্য থেকে একমাত্র হযরত আবুবকর (রাঃ)কে ছিদ্দীক বলা হত। কাজেই ছিদ্দীক দাবী করার দুঃসাহসও কারো নেই; তাই বিনা হিসেবে বেহেস্তে যাওয়ার আশা করা ঠিক নয়।

তৃতীয়, ছালেহীন। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পর গুনাহে কবিরা থেকে বিরত থাকা। এমন কে আছে যে নিজেকে ছালেহ বলে দাবী করতে পারে? কাজেই ছালেহীনদের দলভুক্ত হয়েও জান্নাতে প্রবেশ করা কঠিন ব্যাপার।

প্রিয় বন্ধুরা! বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার চারটি পন্থা থেকে তিনটির নাগাল আমরা পাচ্ছি না। আর বাকি থাকছে শুধু একটি। আর তা হলো শুহাদা। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুসলিমার জন্য বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার একটি রাজপথ খুলে রেখেছেন, তা হল আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া। শহীদের শোণিতধারা ভূতলে পতিত হওয়ার আগেই তার আত্মা জান্নাতে পৌঁছে যায়। আত্মার বাহন হবে সবুজ রঙের বিহঙ্গ।

ওহে আমার বীর মুজাহিদ সাথী ও বন্ধুরা! আমরা আমাদের সব ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করে থাকি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাজি-খুশি করার জন্য কিছু ইবাদতকে আমাদের উপর অবশ্য করণীয় বা ফরজ করে দিয়েছেন। যেমন- নামাজ,

রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) উম্মতকে এসব এবাদত নিজে শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজেও তা পালন করেছেন। বান্দা যদি একাগ্রচিত্তে এসব এবাদত পালন করে, তবে আল্লাহ নিশ্চই খুশি হবেন। কিন্তু নবীসহ কোন ছাহাবাকে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত আদায় করার সাথে সাথে আল্লাহ খুশি হয়েছেন বা জান্নাতের খুশ-খবরী প্রদান করেছেন, এমনটি শোনা যায় না। কিন্তু নবী ও ছাহাবায়ে কেরাম এমন একটি ইবাদত করেছিলেন, যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ সাথে সাথে জান্নাতের সুখবর দিয়েছিলেন। তাহল– বদর যুদ্ধ।

৩১৩ জন ছাহাবাকে নিয়ে আমীরুল মুজাহিদীন মুহাম্মদ (সাঃ) ৩ হাজারের মোকাবেলায় লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। উক্ত ৩১৩ জনকেই জান্নাতী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ৩১৩ জনকেই বলা হয় 'বদরী ছাহাবী'।

হে আমার প্রিয় বন্ধুরা! আমি তোমাদেরকে আরো একটি চমৎকার ঘটনা শোনাব। আশা করি তোমরা একাগ্রচিত্তে শুনবে। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) ষষ্ঠ হিজরীতে চৌদ্দশ' ছাহাবী নিয়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে এসে তাঁবু খাটালেন। মুসলমানদের আগমনে মক্কার কাফেররা ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করতে পারে বিধায় তিনি হযরত উসমান (রাঃ)কে কুরাইশ দলপতির নিকটে পাঠিয়ে দিলেন এ সংবাদ দিয়ে যে, 'তুমি গিয়ে কুরাইশদের জানিয়ে দাও, আমরা উমরা পালন করে ফিরে যাব। আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য আসিনি।'

এ সংবাদ নিয়ে উসমান (রাঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন। মুনাফিকদের মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)-এর নিকট সংবাদ এল যে, কুরাইশরা হযরত উসমান (রাঃ)কে নির্মমভাবে শহীদ করেছে। মহানবী (সাঃ) উসমানের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য ১৪শ' সাহাবাকে হাতে হাত রেখে বায়আত করালেন যে, আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও উসমানের রক্তের বদলা নেব। নবীসহ ১৪শ' সাহাবা শহীদ হওয়ার জন্য শপথ নেয়ার সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে খোশখবর এসে গেল– "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন

তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। তারপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।” (সূরা আল-ফাতহ ঃ আয়াত ১৮)।

প্রিয় বন্ধুরা! উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম শুধু যুদ্ধ করে শহীদ হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। এখনো যুদ্ধ করেননি বা শহীদ হননি। এতেই আল্লাহ তাদের উপর খুশি হয়ে গেলেন। জিহাদ এমন একটি ইবাদত, যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সওয়াবে ভরপুর।

হে আমার যুবক ভাইয়েরা! আসুন বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য, আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য এবং ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য আমরা জিহাদের পথকে বেছে নেই। এসো জীবন বিলিয়ে দিয়ে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করি। রক্ষা করি মুসলমানদের জানমাল, মান-ইজ্জত ও তাহজীব-তামাদ্দুনকে আর প্রতিষ্ঠা করি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।

সায়েমার তেজোদীপ্ত ভাষণে যুবকদের মাঝে জিহাদের আগ্রহ অনেক গুণ বেড়ে গেল। তারা বলসেভিকদের উপর এ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। ও-পাড়ার কলেজ পড়ুয়া ছাত্র জিয়াউর রহমান তুরিদী দাঁড়িয়ে বলল, 'মাননীয় বীরবর! আপনাকে সহস্র মোবারকবাদ। আপনার মূল্যবান উপদেশ আজ দু'দিন যাবত শুনলাম। কিন্তু খালি হাতে এতো শক্তিশালী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আমাদের পক্ষে কি করে সম্ভব? প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রণকৌশলী বিশাল বাহিনীর সাথে আনাড়ি ও অদক্ষ লোকদের দিয়ে যুদ্ধের মত কঠিন কাজে উস্কিয়ে দিচ্ছেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমার তো মনে হয় এটা হবে আত্মহত্যারই শামিল। আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে খুশি হব।

ছায়েমা গ্রীবা দুলিয়ে শান্ত ও মার্জিত ভাষায় বলল, “হ্যাঁ, আমি এ প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিলাম। তোমাকে ধন্যবাদ। এবার শোন, আজ সন্ধ্যায় প্রতি গ্রাম থেকে দু'জন করে বুদ্ধিমান ও সাহসী যুবক আমার এখানে পাঠিয়ে দিবে। আমি চেষ্টা করব সামান্য প্রশিক্ষণ দেয়ার।”

এতটুকু বলতে না বলতে সবাই বলে উঠল, আমরা সবাই

প্রস্তুত। আপনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করব।

ছায়েমা তাদের আগ্রহ দেখে খুশিতে আত্মহারা। সে বলল, ভাইয়েরা! তোমাদের সবাইকেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তবে প্রথমে দশজনকে প্রশিক্ষণ দেব। তারপর আস্তে আস্তে সবাইকেই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। জিয়া দাঁড়িয়ে পাঁচটি গ্রামের বাছাই করা দশজন যুবকের নাম উল্লেখ করল, যাদের সবাই এখানে উপস্থিত ছিল। ছায়েমা দশজনের নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে বলল, তোমরা পরে আমার সাথে সাক্ষাত করবে। অতঃপর সবাইকে বিদায় দিয়ে ছায়েমা অন্দর মহলে প্রবেশ করল।

[ছয়]

ছায়েমা খাবার খেয়ে বিছানায় গেল বটে, কিন্তু তার মনে চিন্তা ও পেরেশানির শেষ নেই। নিষ্ঠুর খোবায়েবের বিরহ যাতনায় ও মর্মবেদনায় বেচারির হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। আজ কতদিন অতীতের গর্ভে বিলীন হতে যাচ্ছে, পলাতক পলায়ন করেছে। ডানা মেলেছে সুদূরের পথে। আজও ফিরে আসেনি। নাহ! খোবায়েব হয়ত বেঁচে নেই। নিশ্চয়ই ওপারে পলায়ন করেছে। যদি বেঁচেই থাকত, তাহলে বুড়ো মা ও আমাকে রেখে এতদিন নিখোঁজ থাকতে পারে না। নয়ত বন্দী হয়ে আছে নিষ্ঠুর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। আহ্! কতই না ভাল মানুষ ছিল খোবায়েব।

নানা দুশ্চিন্তায় ছায়েমার মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। মস্তকে উল্কাপিণ্ডের আঘাত হানতে থাকে। এত ব্যথা এ হৃদয়ে সংকুলান হচ্ছে না ছায়েমার। অবুঝ বালিকার ন্যায় কেঁদে কেঁদে অশ্রু ঝরিয়ে হৃদয়ের অগ্নিশিখা নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

ছায়েমার কান্নার সুর গৃহাভ্যন্তরে সীমিত থাকতে ব্যর্থ হয়ে গৃহের ছিদ্রপথে বেরিয়ে এসে তোরাব হারুনী ও তৃষ্ণার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। উভয়ে হতচকিত হয়ে ছুটে গেল ছায়েমার ঘরে। অস্থির ছায়েমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অবুঝ হৃদয় প্রবোধ মানছে না মেয়েটার।

তোরাব হারুনী স্নেহমাখা কণ্ঠে বুঝিয়ে বললেন, ছায়েমা তুমি শান্ত হও। আমি আগামী দিনই খোবায়েবের সন্ধানে বের হব। এ ব্যথা তো শুধু তোমার একার নয়, এ ব্যথা আমাদের সকলেরই অন্তরে। তুমি ছব্‌রে জামিল এখতিয়ার কর এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাক, যেন আমি খোবায়েবকে খুঁজে বের করে সাথে নিয়েই ঘরে ফিরতে পারি।

এতক্ষণে ছায়েমার মলিন বদনে কিছুটা হাসির রেখা প্রস্ফুটিত হল। যেন সাইমুম ঝড়ে নীল গগনের মেঘমালা অপসারণ করে সবিতার দীপ্ত প্রভা বিচ্ছুরিত করার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় ছায়েমার মুখমণ্ডল সুষমামণ্ডিত হল। অপরূপ পুলক শিহরণে সারাটি কক্ষ উজালা হয়ে উঠছে। এবার ছায়েমা মুখ খুলে হারুনীকে বলল, ভাইজান, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু।

হারুনী মুচকি হেসে বললেন, আরে উন্মাদিনী, আমি তো বলছি, খোবায়েবকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরব। নয়ত তার সঠিক সংবাদ নিয়ে আসব।

ছায়েমা বলল, সংবাদ নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরবেন কিন্তু।

হারুনী বললেন, হ্যাঁ যতটা সম্ভব জলদি ফিরব। যেহেতু তার কোন ঠিকানা আমার কাছে নেই, তাই একটু সময় তো লাগবেই। অন্তত এক সপ্তাহ। কারণ, তুর্কমেনিস্তান যাওয়া-আসায়ই প্রায় সপ্তাহ খানেক সময় দরকার। তারপর তাকে খুঁজে বের করা।

ছায়েমা বলল, সত্যিই তুর্কমেনিস্তান তো আর ঘরের কোণে নয়, সে তো অনেক দূরের পথ। তবে ভাইজান, আপনি প্রথমে ওখানে না গিয়ে সমরকন্দে যাবেন। তাসকন্দ, সমরকন্দ ও বুখারার দিকেই নাকি আনোয়ার পাশা অভিযান চালাচ্ছেন। হয়ত ওখানে গেলে খোবায়েবের কোন না কোন সংবাদ পেয়ে যাবেন।

হারুনী বললেন, হ্যা তাই করব।

দুপুর ১২টা। বাইরে রোদ খাঁ খাঁ করছে। ছায়েমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজ গৃহে ফিরে হারুনী তৃষ্ণাকে ডেকে বললেন, আমাকে এক্ষুণি বাজারে যেতে হবে। কয়েক দিনের বাজার-সওদা করতে হবে। আমি

আগামীকালই সকালে খোবায়েবের সন্ধানে বের হব। মেহমানদের দেখা-শোনা ও সেবা-শুশ্রূষার ভার তোমার উপর রইল।

এই বলে তোরাব হারুনী বাজারের দিকে ঘোড়া নিয়ে ছুটল।

ছায়েমা শয্যা ত্যাগ করে পার্শ্বের কেদারায় বসে ভাবছে, খোবায়েবকে খুঁজে আনতে যদি কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়, তবে এতদিনে আমি অশ্ব চালনায় আরো পারদর্শী হয়ে যাব। খোবায়েব ভাইয়াকে আমি অশ্ব চালনায় হার মানিয়েই ছাড়ব। তখন কি মজা হবে! এবার ফিরে আসলে আর কোনদিন তাকে একাকী যেতে দেব না। খোয়ায়েব ফিরে আসলে সে অধীর আগ্রহে আমার কাছে সফরের কারগুজারী শোনাতে চাইবে। আমি মুখ ভার করে সরে যাব। আমি প্রথমে তার সাথে কথাই বলব না। ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকব। এরূপ নানা মান-অভিমানের জাল একাকী নিজ হৃদয়দর্পনে বুনতে থাকে ছায়েমা তার ইয়ত্তা নেই।

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম। গোসল সেরে নামাজের এন্তেজাম করতে হবে। ছায়েমা আমার আম্মাকে গোসল করিয়ে নিজেও গোসল সেরে নিল। এরপর আম্মার শরীরে তেল মালিশ করে নামাজ পড়তে চলে গেল। তৃষ্ণা খানা এনে হাজির করল। উভয়ে একসাথে আহার করল। এরপর ছায়েমা বিশ্রামের জন্য নিজ গৃহের দিকে অগ্রসর হল।

বিকেল ৪টার কিছু পূর্বেই তোরাব হারুনীর দহলিজে ছায়েমার বক্তব্য শোনার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ভীড় জমতে থাকে। ছায়েমা অন্যদিনের মত আজও বৃক্ষমূলে হাজির হয়ে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বলল—

"হে আমার মুজাহিদ বন্ধুরা! কমিউনিস্টরা আমাদের চরম দুশমন। তারা আল্লাহর নীতিমালাকে পদদলিত করে লেনিনের মতাদর্শকে আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করছে। ধনী-গরীবের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। সমাজে সৃষ্টি করছে শ্রেণীবৈষম্য। আল্লাহ কাউকে সম্পদ দান করেছেন আর কাউকে করেছেন পথের ভিখারী। কাউকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন আর কাউকে করেছেন অসুন্দর। কেউ চিকন আর কেউ মোটা।

কাউকে দিয়েছেন অগাধ জ্ঞান আবার কাউকে রেখেছেন মূর্খ। এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা। এসব আল্লাহর কুদরত ও হেকমত। আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মের খেলাপ করে যারা সাম্যের গান গায়, তারা কাফের, বেঈমান, মুরতাদ ও জিন্দীক। তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

'আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানে এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই কর না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি।' (সূরা বাকারা ঃ ১৯১ আয়াত)।'

প্রিয় বন্ধুরা! আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে এতই নিকৃষ্ট মনে করেন যে, তাদেরকে হত্যা করা মহাপুণ্যের কাজ। তাদেরকে যখন যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যায়, সেখানে সে অবস্থায় তাকে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। এমনকি যে হেরেম শরীফে জীব হত্যা হারাম, সেই হেরেম শরীফেও যদি তাদেরকে যুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, সেখানেই হত্যা করে হেরেমকে রঞ্জিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হে আমার প্রিয় বন্ধুরা! তোমরা জান এবং মাল ব্যয় করে বলসেভিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়। গতকালের অঙ্গীকার অনুযায়ী তোমাদের জান তো পেয়েছি, কিন্তু মালের কথা কিছুই বলা হয়নি। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীনের কবর রচিত হচ্ছে আর আনোয়ার পাশার মুজাহিদ বাহিনী অর্থাভাবে জিহাদের কাজ পুরোপুরি করতে পারছেন না। কতই না আফসোস! কতই না পরিতাপ! তোমাদের মাল যদি আল্লাহর রাস্তায় এবং দ্বীনের প্রয়োজনে খরচ না হয়, তবে এমন হতভাগা আর কে আছে বল? মুসলমানরা অট্টালিকার মালিক হচ্ছে, গাড়ীর মালিক হচ্ছে, মিল-ফ্যাক্টরির মালিক হচ্ছে। মুসলমানদের ঘরে আজ বাদ্যযন্ত্র সোভা পাচ্ছে। রং-বেরঙের ফার্নিচার আর হরেক রকম মালামালে ঘর

ভর্তি। মুসলমান গৃহের শোকেস বোঝাই করছে বিভিন্ন খেলনা দিয়ে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপ-পিরিচ, থালা-বাটি ও নানা রকমের জিনিস দিয়ে। এগুলো ছাড়াও দামী দামী পোশাক-পরিচ্ছদ ও কসমেটিক মালামাল দিয়ে ঘর ভর্তি করা হয়েছে, যা একজন মুসলমানের গৃহে থাকা শোভা পায় না। তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের দেশী-বিদেশী দামী দামী মূর্তি সোভা পাচ্ছে মুসলমানের ঘরে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক্।

হে আমার প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! সাহাবায়ে কিরামের পরনে ভাল কাপড় ছিল না, পেটে খাবার ছিল না, মাথায় তেল ছিল না, রোগের পথ্য ছিল না, মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। তারা ফকির আর অসহায়বেশে দিনযাপন করতেন। এমনকি মৃত্যুর পর অনেকের কাফনের কাপড়ও কপালে জুটেনি। মাথা ঢাকলে পা খালি, আর পা ঢাকলে মাথা খালি থাকত। তারা ফকিরবেশে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এমনকি তারা অর্ধ-পৃথিবী শাসন করেছিলেন। কিন্ত তখন আল্লাহর যমিনে দ্বীন বিজয়ী ছিল।

প্রিয় বন্ধুরা! পরে মুসলমানরা যখন বিলাসিতায় মেতে উঠল, দ্বীনের চেয়ে জীবনের মূল্য বেশী মনে করতে লাগল, সম্পদ পুঞ্জিভূত করতে আরম্ভ করল, যাকাত দেয়া প্রায় বন্ধ করে দিল; তখন থেকেই দ্বীনের ঝাণ্ডা নিম্নগামী হতে লাগল। রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে দূরে সরতে লাগল। রাজার জাতি গোলামের জাতিতে পরিণত হতে লাগল। সাহাবায়ে কিরাম মাল অর্জন করেছেন দ্বীনের স্বার্থে এবং মাল খরচ করেছেন দ্বীনের কাজে। বর্তমানে মুসলমানরা মাল জমায় দুনিয়ার স্বার্থে আর খরচও করে দুনিয়ার স্বার্থে। তারা দ্বীনের জন্য মাল খরচ করতে রাজি হয় না। এ সমস্ত মালদারদের জন্য আল্লাহর হুশিয়ার বাণী হল—

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে; তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ জানিয়ে দিন।" (সূরা তওবা ঃ আয়াত ৩৪)।

"যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে; (সেদিন বলা হবে)

এগুলো সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন আস্বাদন কর জমা করে রাখার স্বাদ।” (সূরা তওবা ঃ আয়াত ৩৫)।

প্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধন-সম্পদ যদি দ্বীনের প্রয়োজনে খরচ না করা হয়, তবে কিয়ামতের দিন এই সম্পদই হবে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। জিহাদ করতে হলে জীবনের সঙ্গে প্রচুর অর্থ-সম্পদেরও দরকার। অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, ওষুধপত্র, খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন ছাড়াও অতিমূল্যবান কেমিক্যালের প্রয়োজন হয়। জিহাদে বের হওয়ার আগেই অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের মজুদ রাখতে হয়। মহানবী (সাঃ) তা-ই করেছেন–

“আজ অনেক দুঃখ ও পরিতাপের সাথে বলতে হয়, মুসলমানের ঘরে অর্থ-সম্পদ মজুদ থাকতে আনোয়ার পাশার মুজাহিদরা অনাহারে-অর্ধাহারে ও বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরছে। তাদের কাছে রসদ পৌঁছান প্রতিটি উম্মতে মুসলিমার উপর তো ফরযে আইন। কিন্তু তা তারা আদায় করছে না। আর আনোয়ার পাশার মুজাহিদরা বনে-জঙ্গলে পাহাড়-কন্দরে অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যুর দুয়ারে হাজির হচ্ছে।”

ছায়েমার অনলবর্ষী বক্তৃতার পর জিয়াউর রহমান তোরিদী দাঁড়িয়ে বলল, হে আমার যুবক বন্ধুরা! আজ দু’দিন যাবত আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতার জবান থেকে মহামূল্যবান উপদেশমালা শুনে আসছি, যা অতীতে কখনো শুনিনি। আমরা সবাই জিহাদের জন্য অঙ্গীকার করেছি। জিহাদ করতে হলে এখনই একটি মজবুত ‘বাইতুলমাল’ গঠন করতে হবে। আমার ইচ্ছা হল, যার যার সামর্থ অনুযায়ী অর্থ এই মুহূর্তে জমা করা হোক।

তার কথায় সকলেই একমত হয়ে জনাব দেলোয়ার হুযাইফীকে ক্যাশিয়ার নিযুক্ত করে অর্থ প্রদানের স্বীকারোক্তি নিতে আরম্ভ করল। সকলেই তিন দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করল।

মৌলভী দেলোয়ার হুযাইফী একজন সমাজসেবক। এলাকায় তার যথেষ্ট সুনাম আছে। বয়স চল্লিশোর্ধ। সকলের পরামর্শক্রমে

তাকে আমীর ও জিয়াউর রহমান তোরিদীকে কমান্ডার নিযুক্ত করা হল। অতঃপর ছায়েমা তালিকাভুক্ত ১০ জনকে রাতে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করল।

লোকজন যার যার বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গেল।

ছায়েমা অন্দর মহলে প্রবেশ করে আম্মার খোঁজ নিল। তোরাব হারুনী গৃহে ফিরেছেন কিনা তা তৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল। তারপর অজু করে মাগরিবের নামায আদায় করে তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করল। ছায়েমা নামাযরত অবস্থায় তোরাব হারুনী বাজার করে ফিরে আসলেন। হারুনী নামায আদায় করে ছায়েমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তৃষ্ণা চা-বিস্কুট নিয়ে এল। উভয়ে চা পান করতে করতে দেশের অবস্থার উপর কিছু আলোচনা করছিলেন। এমন সময় নির্বাচিত ১০ জনের কাফেলা মেহমানখানায় এসে উপস্থিত হল।

ছায়েমা সময় নষ্ট না করে সাথীদের প্রশিক্ষণে আত্মনিয়োগ করার প্রতি মনোনিবেশ করল। সে স্ববিনয়ে তোরাব হারুনীকে বলল, ভাইজান! আমাদের জন্য বাড়ীর ভেতরে একটি রুম খালি করে দিলে খুবই ভাল হয়। আমরা সেখানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেব।

হারুনী সাহেব অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘর খালি করে দিলেন। ছায়েমা সবাইকে নিয়ে ঘরে বসে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিল এবং হারুনীকে হেফাজতকৃত অস্ত্রগুলো নিয়ে আসার অনুরোধ জানাল।

ছায়েমা একটি একটি করে অস্ত্র হাতে নিয়ে তার নাম, কার্যকারিতা, আবিষ্কারক ও তৈরির সাল মুখস্ত করিয়ে প্রতিটি অস্ত্র তিন ভাগে (বাট, বডি ও বেরেল) ভাগ করে বুঝাতে লাগল। তাছাড়া অস্ত্রে প্রতিটি অংশ পৃথক পৃথকভাবে খুলে প্রতিটি পার্টসের নাম মুখস্ত করাতে লাগল। এক একটা অস্ত্র বারংবার লাগান ও খোলা, বারবার দেখিয়ে এক একজনকে পৃথক পৃথকভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা দিল।

তারপর সাথীদেরকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে কয়েক প্রকারের ফায়ার পজিশন শিক্ষা দিল; অর্থাৎ কায়িমান (দাঁড়ানো অবস্থা), রাকিয়ান (অর্ধ দাঁড়ানো বা রুকু অবস্থা), জালিছান (বসা অবস্থা), মুস্তাজিয়ান (শোয়া অবস্থা) কিভাবে ফায়ার করতে হবে এবং অস্ত্র

কিভাবে মজবুত করে ধরতে হবে, কিভাবে নিশানা ঠিক করতে হবে, কিভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ রাখতে হবে এবং কিভাবে ট্রিগার চাপতে হবে– এসব বিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষা দিল।

তোরাব হারুনী ও অন্যরা ছায়েমার রণকৌশল অস্ত্রশস্ত্র দেখে খুবই বিস্মিত হল। মৌলভী দেলোয়ার হুযাইফী বললেন, "বাবা! এই অল্প বয়সে তুমি এগুলো শিখলে কোথায়? এ বয়সে তো সেনাবাহিনীতেও ভর্তি হওয়া যায় না। তুমি শিখলে কী করে?"

ছায়েমা চোখের পানি মুছতে মুছতে জীবনের ছোটখাট ঘটনাবলী এক এক করে বলতে লাগল। উপস্থিত জনতা বেদনায় কেঁদে কেঁদে জার জার হয়ে গেল। তারপর আমীর সাহেবকে হুকুম দিলেন, ১০ জন করে ১০টি গ্রুপ তৈরি করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে। আর ১০ জনকে কিছু অস্ত্র দিয়ে বিদায় দিল।

রাত আর তেমন নেই। ছায়েমা একটু নিদ্রার আশায় শয্যা গ্রহণ করল।

[সাত]

নিশিথিনীর বিদায়ের পালা। বৃক্ষশাখে দোয়েল, শ্যামা, কোকিল ও পাপিয়ারা সুমধুর কলকাকলি জুড়ে দিয়েছে। কিরণমালীর আগমন বার্তা জানিয়ে ছোবহে ছাদিক বিদায় নেয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ছায়েমা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। কৃষক বধূরা ভোরের কাজে ব্যস্ত। কেউ বাড়ীঘর ঝাড়ু দিচ্ছে, কেউ কলসী কাঁখে পানি আনতে ছুটে চলছে, কেউবা আবার নাস্তা তৈরির জন্য থালা-বাটি ঘষে-মেজে পরিষ্কার করছে। কৃষকরা হাল-গরু নিয়ে নিজ নিজ খামারের দিকে এগুচ্ছে।

ছায়েমা জায়নামাযে বসে তিলাওয়াত করছে। তোরাব হারুনী তুর্কমেনিস্তান যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিচ্ছেন। তৃষ্ণা নাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত। ঠিক এমন সময় গাঁয়ের এক মাতব্বরের কন্যা সাত বাড়ী পেরিয়ে অপথে-কুপথে পেককাদা মাড়িয়ে শিশিরে কামিজ-উড়না সিক্ত করে ভাবী ভাবী ডাকতে ডাকতে অন্দর মহলে প্রবেশ করল। তৃষ্ণা কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝে নেয় এ আর কেউ নয়– রাশেদার বোন মাসুমা। তৃষ্ণা ক্ষীণ আওয়াজে

বলল, কে গো, মাসুমা? এতো কাকডাকা ভোরে নদী সাঁতরিয়ে কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে কি উদ্দেশ্যে আগমন বোন? সে কতদিন হল এসেছিলে! এতদিন পর বুঝি ভাবীর কথা মনে পড়েছে? বস বোন, ঐ মোড়াটি টেনে বস। তোমার ভাইয়া অনেক দূরে যাবে, তাই তাড়াহুরা করে নাস্তা তৈরি করছি।

মাসুমা রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "ভাবী! আগে আমার দু'টি কথা শোন, তারপর তোমার কাজ কর। আমি এখনই চলে যাব।"

তৃষ্ণা বলল, "কী ব্যাপার! এক্ষুণি চলে যাবে কেন?"

মাসুমা বলল, শোন ভাবী, একটু এদিকে তাকাও, আমার দু'টো কথা শোন।"

তৃষ্ণা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগে তোমার কথাই বল। আমি কান খাড়া রেখে তোমার কথা শুনছি আর আমার হাতে কাজও চালিয়ে যাই।"

মাসুমা বলতে লাগল, "গত রাত ১১টার দিকে রাশেদ ভাইয়া বাজার থেকে এসে আব্বাজানের কাছে চুপি চুপি বলল, আপনাদের বাড়ীতে নাকি মুজাহিদ কমান্ডার থাকেন এবং তিনি কিনা লোকদের জিহাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এই সংবাদ রাশেদ ভাইয়া কমিউনিস্ট নেতার কাছে বলে দিয়েছে। কমিউনিস্ট নেতা আবার থানায় গিয়ে এ ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে। থানা থেকে বলা হয়েছে, আজকের মধ্যেই তারা সিআইডি পাঠাবে রিপোর্ট করার জন্য। ঘটনা সত্য হলে একদল পুলিশ নিয়ে আগামীকাল রাতে আসবে আপনাদেরকে ধরার জন্য। পুলিশসহ কয়েকজন নেতা আমাদের বাড়ীতে রাতে খাওয়া-দাওয়াও করবে। আমার ভাইয়া ইদানীং নামায-রোযা সব ছেড়ে দিয়ে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। আব্বার অবস্থাও অনেকটা একই ধরনের। ভাবী, আমার মন দুরু দুরু করছে, না জানি কি হয়। মুসাফির ভাইয়ার কিছু হলে আমি তা সইতে পারব না। কমিউনিস্ট বাপ-ভাইয়ের আমার দরকার নেই। আমার আম্মা কত করে তাদেরকে অনুরোধ করেছেন, বলসেভিকদের পেছনে না যাওয়ার জন্য। কিন্তু তারা আম্মার কথার পাত্তাই দেয় না। তাছাড়া মাসখানেক আগে আমার আব্বা মসজিদ থেকে এক নামাযীকে ধরে

নিয়ে শহীদ করে দিয়েছে। আম্মা এ কাজে নিষেধ করায় তাকে তালাক দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। আব্বা বলছেন, বর্তমানে দুনিয়ার বাঁচতে হলে নাকি কমিউনিস্ট হয়ে থাকতে হবে। ইসলাম নাকি এখন অচল হয়ে গেছে।”

ছায়েমা অপরিচিতা কণ্ঠস্বর শুনে তিলাওয়াত বন্ধ করে দিয়ে আড়ি পেতে মাসুমার কথাগুলো শুনছিল। কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করে বেরিয়ে আসে ছায়েমা। ছায়েমা মাসুমাকে তার কক্ষে নিয়ে যায়। তারপর মাসুমার কাছ থেকে পুরো ঘটনা জানার চেষ্টা করে। ছায়েমা প্রশ্ন করল—

ঃ বোন, তুমি একটা কথা বলেছ যে, জীবন দিয়ে হলেও মুসাফিরের জীবন রক্ষা করবে। বলি, মুসাফিরটা কে?

ঃ মুসাফির আমার সামনেই। সে তো আপনিই।

ঃ তুমি বলছ, বাপ-ভাইয়ের দরকার নেই, তার মানে বুঝলাম না?

ঃ আমার আব্বা ও ভাই রাশেদ কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। ইদানীং নামায ছেড়ে দিয়েছে এবং বলে বেড়াচ্ছে, ইসলাম নাকি এখন অচল হয়ে গেছে। এখন নাকি কমিউনিজম ছাড়া অন্য কিছু চলবে না। এ ধরনের উক্তি ও আচরণের পর কারো ঈমান থাকতে পারে না। কাজেই, তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। গতকাল আপনার কথায় বুঝতে পারলাম, যারা মুরতাদ হয়ে যায় তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমি চাই, এই মুরতাদদের হত্যা করে জান্নাতে যেতে।

ছায়েমা মুচকি হেসে মাসুমার স্কন্ধদেশে একটু ঝাঁকুনী দিয়ে বলল, “বোন! আমিও তোমার মত একজন অবলা নারী।”

এতটুকু বলতেই মাসুমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। অধীর আগ্রহে ছায়েমার প্রতি মনোনিবেশ করল। তারপর ছায়েমা তাঁর জীবন বৃত্তান্ত খানিকটা মাসুমাকে শুনিয়ে তাঁর জ্যাকেটটা খুলে দিল। তারপর মাথার ক্যাপ খুলে দিলে অলকগুচ্ছ নেমে এল কটিদেশে।

এবার ছায়েমা মাসুমাকে বলল, “বোন! তোমার কথাগুলো যদি সত্যিই অন্তর থেকে বলে থাক, আর সত্যিই যদি দ্বীনের ভালবাসা তোমার অন্তরে জন্মে থাকে, তবে এ সমস্ত নরাধমকে শায়েস্তা করার অনেক উপায় আমার কাছে আছে। তুমি যদি তা করতে পার, তবে

তোমার জান্নাতের জিম্মাদারী আমি নিতে পারি। ”

মাছুমা ছায়েমার হস্তদ্বয় সজোরে চেপে ধরে বলল, “বোন! আমি নিজেকে আপনার হাতে সপে দিলাম। ওদের হত্যা করে আমার মনের আগুন নির্বাপিত করার রাস্তা আপনি বাতলিয়ে দিন। আশা করি, আপনি আমাকে যে প্রযুক্তি দিবেন, আমি তা-ই পারব। অবশ্যই পারব। যদি আমি না পারি, তবে আমি মাছুমা নই।”

মাছুমার মনোবল দেখে ছায়েমা একটি গ্রেনেড এনে সেটা শক্ত করে ধরা, দাঁতের সাহায্যে রিং সোজা করে খুলতে শেখা এবং নিক্ষেপ করে জমিনে শুয়ে পড়তে হয় বা কোনকিছুর আড়ালে লুকাতে হয় ইত্যাদি বিষয়াদি খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিল। মাছুমাকে তাদের বাড়ীর একটি নক্শা কাগজে এঁকে দিতে বলল। মাছুমা চোখের পলকে নক্শা তৈরী করে ছায়েমার নিকট পেশ করল।

ছায়েমা বলল, মেহমানরা যখন মেহমানখানায় খেতে বসবে, তখন মেহমানখানার পাশের ঘরের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তুমি জমিনে লুটিয়ে পড়বে অথবা দেয়ালের আড়ালে চলে যাবে। আক্রমণ যেন লক্ষভ্রষ্ট না হয়। এই বলে গ্রেনেডটি মাছুমার হাতে দিয়ে বলল, আর সাবধান! কেউ যেন এটা না দেখে, খুব সাবধানে রাখবে।

মাছুমা গ্রেনেড নিয়ে আঁকা-বাঁকা পথে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

ছায়েমা তোবার হারুনীকে ডেকে বলল, “ভাইজান! আপনি দু’-এক ঘন্টা পরে রওনা দিন। আর সবাইকে এক্ষুণি বলে দিন, ওরা যেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনার বাড়ীতে না আসে। এমনকি দু’-চারজন একত্রে চলাফেলা না করে। আর আমাদের তৎপরতার ব্যাপারে কেউ যেন মুখ না খোলে। কারণ, গোয়েন্দারা আজ দিনের বেলায় গ্রামে বের হবে, আর রাতে অপারেশনে নামবে। কথার নড়চড় হলে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।”

এই কথা শোনামাত্র হারুনী তাড়াতাড়ি সংবাদ পৌঁছাতে চলে যান।

মাছুমা বাড়ীতে গিয়ে দেখে, তার পিতা-মাতা দু’জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে। এমনকি ওর পিতা মাছুমাকেও গালি দিতে বাদ দিচ্ছে না। পিতা-পুত্রের কথা হলো, এ বাড়ীর সবাইকে

কমিউনিস্ট হতে হবে এবং মনে-প্রাণে কমুনিজমে বিশ্বাস করতে হবে। আর মা-কন্যার কথা হল, জীবন চলে গেলেও ঈমানের বিনিময়ে কুফরী করা সম্ভব নয়।

রাশেদ উত্তেজিত হয়ে তার পিতাকে বলল, তোমার মত এমন কাপুরুষ কাজাকিস্তানে দ্বিতীয়টি আর নেই। এরকম মাগীকে সাত তালাক দিয়ে নাক-কান কেটে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারনি। ছিঃ এমন মায়ের প্রতি ধিক্কার! ধিক্কার তোমার মত পিতার প্রতি।

তাদের ঝগড়া দেখে মাছুমার ভয় হচ্ছে এবং দুঃখে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। মনে মনে ভাবছে, মাত্র দু'-সন্তানের জনক মায়ের এই বয়সে স্বামীকে হারাতে বসেছে। মাত্র একমাস আগে বলসেভিকরা কেড়ে নিয়েছে এক নামাজীর প্রাণ। নিজের ঔরসজাত সন্তান হয়েও নিজের মাকে এই ধরনের কথা বলতে পারে! এসব চিন্তা করতে করতে মাছুমা কেঁদে অস্থির। কখনো মায়ের আঁচলে তাঁর সুন্দর চেহারা লুকাচ্ছে, কখনো বা নিজ ওড়নার আঁচলে মুখ ঢাকছে।

মাছুমার কান্না দেখে রাশেদ অকথ্য ভাষায় গালি দিয়ে বলল, "হারামজাদী! মায়ের পথ ধরছ বুঝি! তোর কপালে দুঃখ আছে। তুই এখন আর ছোট্ট খুকী নস। বিয়েশাদী দিতে হবে। বাপের ঘরে থাকতে পারবিনে। কাজেই বুড়ো মাগীর পথ ধরিস্‌নে। এখনো সময় আছে, ভাল হয়ে যা। আজ শহর থেকে ৮/১০ জন মেহমান আসবে। ওদের রান্না করে খাওয়াতে হবে। রান্নার এন্তেজাম তোকেই করতে হবে। শয়তান বুড়ি নাকি আমার মেহমানের রান্না করবে না। দেখি আব্বু এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেন।"

এসব কথা-বার্তায় মাছুমার অন্তরের অগ্নিশিখা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। মাছুমা ভাইয়ের কথায় শুধু বলল, "ভাইয়া! আপনি যে কি আবোল-তাবোল বকছেন। সব রান্না কি আম্মুই করেন? কোনদিন কি আপনার কোন মেহমান না খেয়ে গেছেন? আপনার এত রাগারাগি করা ঠিক হয়নি। ঠিক আছে, আম্মু রান্না না করলেও আমি নিজে রান্না করবো।"

মাছুমার কথায় রাশেদ খুব খুশী হল। বলল, "দেখ মাছুমা! তুই আমার একমাত্র আদরের বোন, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি অনেক

স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু যদি আমার মতের বাইরে চলিস আর ইসলাম ইসলাম জপ করিস, তবে তোকে বলসেভিক যুবকদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তারপর ওরা...”

মাছুমা ভাইয়ের পৈচাশিক মনোভাব ভাল করেই বুঝতে পারে। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে যে, আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না, আজ রাতেই নাফরমান পিতা ও ভাইয়ের জীবনের যবনিকা টানতে হবে। এ জন্য আজই সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

মাছুমা পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে শ্রদ্ধেয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝাতে লাগল, “আম্মী! আমরা নারীকূলে জন্ম নিয়েছি। আমাদের অতটা জিদ ধরা সাজে না। আমরা যদি বিধাতার অভিশাপ না হতাম, তবে কেন নারী হয়ে জন্ম নিয়েছি? আম্মী তুমি রাগ কর না, আব্বু ও ভাইয়া তোমার-আমার চেয়ে কম বুঝে না। উনারা যা বুঝেছেন, তা ঠিকই বুঝেছেন। এ নিয়ে আমাদের আর বাড়াবাড়ি করা ঠিক না।”

ফাতিমা মেয়ের দিকে বিস্ফারিত লোচনে তাকিয়ে বলল, “মাছুমা! এতদিন মনে করেছিলাম তুই বুঝি আমার পক্ষের লোক। তোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার চিন্তার অবধি ছিল না। আজ আমি তোর চিন্তা থেকে মুক্তি পেলাম। তোরা বাপ-বেটা, বোন-ভ্রাতা এক পক্ষ নিয়েছিস। আর আমি আমার আদর্শে অটুট রয়েছি। এখন আর আমার কোন চিন্তা নেই। এ ঘরে হয়তো আর থাকা হবে না। নির্ভেজাল হয়েছি। নিশ্চিন্ত হয়েছি। বেঈমান স্বামী ও বেঈমান সন্তানাদি থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। এই ধরাধামের আলো-বাতাস থেকে মুক্ত হতে চাই। হে আল্লাহ! তোমার অবলা বান্দার ঈমানকে হেফাযত করার তাওফীক দাও। পিতার পথে চলতে দাও। শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে চির শান্তির নীড় জান্নাতে পলায়ন করার তাওফীক দাও।”

মাছুমার বাবা কালু মোড়ল দন্তপাটি খিঁচে হিংস্র বাঘের ন্যায় তর্জন-গর্জন করে বলল, “কুলাঙ্গার, হারামজাদী, নটি; চোখের সামনে এতসব বকাবাজি। হারামজাদির বুকের পাটা কত বড়। স্বামীর সামনে এতসব কথা। তোর কপাল তুই নিজে খাইলি। তোর মতো মাগী নিয়ে আমার মতো ভদ্রমানুষ (সমাজের সর্দার) ঘর-

সংসার করতে পারে না। যা, কাল ভোরেই তোর ফয়সালা করব। মেহমান বিদায় দিয়ে তোর ঝামেলা থেকে নিজে মুক্তি পাব। ছেলে রাশেদকে উদ্দেশ করে বলল, তুই লক্ষ্য রাখবি, হারামজাদি যেন পালাতে না পারে। মাছুমা! তুমি শয়তানীর আঁচল ছাড়নি কিন্তু। কাল সকালেই তোমরা দেখতে পারবে কমিউনিজম-বর্জিতা কুলাঙ্গার হারামজাদির পরিণাম। আমি বাজারে যাচ্ছি। মেহমানদের জন্য বাজার করতে হবে। মাছুমা তুমি মসলা পিষে রেখ।"

এই বলে কালু মোড়ল ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজারাভিমুখে যাত্রা করল।

রাশেদ পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায় কি-না সে উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। মাছুমা আম্মীর পার্শ্বে গিয়ে নিজ উড়নিতে অশ্রু মুছে দিয়ে বলল, "আম্মী! তুমি শান্ত হও, এত বিচলিত হয়ো না। আল্লাহ ইসলামের পক্ষে আছেন ও থাকবেন। কয়েকটা ঘন্টা অপেক্ষা করুন, আল্লাহর ফয়সালা দেখতে পাবেন।"

ফাতিমা চোখ দু'টি কপালে তুলে বলল, "দু'মুখো মানুষের সাথে আমার কোন কথা নেই। বেঈমান পিতা ও ভ্রাতার কাছে মহা-মূল্যবান ঈমান বিক্রি করলি। তুই আর আমাকে আম্মী বলে ডাকিস্নে। এতে আমার লজ্জা হয়। আমার কাছে আসিস্নে তুই। দুর হ আমার চোখের সামনে থেকে। তোর কাজে তুই যা।"

মাছুমা এই সুযোগে দৌড়িয়ে গেল তোরাব হারুনীর গৃহে। হারুনী সবেমাত্র মহল্লা থেকে ঘুরে আসলেন সংবাদ দিয়ে। হারুনী সফরে যাওয়ার ব্যাপারে ছায়েমার সাথে আলাপ করছেন। ছায়েমা হারুনীকে যেতে বারণ করে বলল, "অত্র এলাকায় কখন কি হয় বলা যায় না। কাজেই দু'দিন অপেক্ষা করুন।"

মাছুমা সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল। তারপর তাদের বাড়ীর ঝগড়া-ঝাটির কথা জানাল। ছায়েমা খানিকটা চিন্তা করে ছোট্ট একটি চিঠি লিখল। চিঠির ভাষ্য এ ধরনের–

"মাননীয় থানা কর্মকর্তা! ইদানিং এ এলাকার মুজাহিদদের কিছু আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। কাজেই আজ রাতে না আসলে ভাল হয়। যারা আপনার নিকট সংবাদ দিয়েছে, তারা ভাল লোক নয়। হয়ত এটা একটা কূটকৌশল হতে পারে। এ ব্যাপারে চিন্তা করে পদক্ষেপ

নিতে অনুরোধ করছি।”

চিঠিখানা নিয়ে হারুনী সাহেব থানার এক কনস্টেবলের হাতে পৌঁছেয়ে দিলেন। থানা কর্মকর্তা তা পাঠ করে সহকর্মীদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন।

এলাকা থেকে ফিরে গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিলেন যে, এলাকায় তেমন কিছু পাইনি। তবে কালু মোড়লের বাড়ীতে তুমুল ঝগড়া শুনেছি। ঝগড়ার কারণও কিছু বর্ণনা করল। থানা কর্মকর্তা চিন্তা করে বললেন, কিছু ঘটুক আর নাই ঘটুক আমরা যদি এলাকায় না যাই, তবে আমাদের বিরুদ্ধে উপরে রিপোর্ট হতে পারে। এমনকি চাকুরী হারাতে পারি। তাই ২৮ জন কনেস্টবলের একটি গ্রুপ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে পাঠান হবে। যাতে সফল অভিযান চালিয়ে মুজহিদদেরকে গ্রেফতার অথবা তাদের অস্ত্র উদ্ধার করতে পারে।

[আট]

বিকাল বেলা। সমীরণ সন্ধ্যার বার্তা নিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাস্কর নিঃস্পভ হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে বিদায় নিবে। তমশা ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিক। ঝাঁকে ঝাঁকে শালিকেরা বাঁশবাগানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। আরো কত নাম না-জানা পাখ-পাখালিরা নিজ নিজ নীড়ে ফিরে যেতে লাগল। কুল-বধূরা সন্ধ্যা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কুমারীরা ছাগল পাল খোয়াড়ে তুলতে ব্যস্ত। বালিকারা শামাদান পরিষ্কার করে তেল ভর্তি করে প্রদীপ প্রজ্বলিত করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে।

মাছুমাকে আজ সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের মত সুষমামণ্ডিত দেখাচ্ছে। অন্যদিনের মত আজ তাকে অস্থির দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার কাজগুলো গুছিয়ে মেহমানখানার শোভাবর্ধনে লেগে গেল। ঘরটি সুন্দর করে ঝাড়ু দিয়ে টেবিল-চেয়ার মুছে, খাটে তোশক বিছিয়ে উপরে নকশী কাঁথা বিছিয়ে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করল। টেবিলে টেবিল ক্লথ বিছিয়ে পুষ্পদানী দিয়ে সাজাল। বালিশগুলোতে নিজ হস্তাংকিত কভারগুলো পড়িয়ে দিল। এতে উজ্জ্বলতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেল। কলসী ভর্তি পানি ও বদনা রেখে দিল মেহমানখানার এক

পার্শ্বে। মাছুমার আতিথেয়তা ও আপ্যায়নের আয়োজন দেখে তার পিতা ও ভাই সবাই আনন্দে আত্মহারা। মাছুমা এখন রন্ধনশালায় প্রবেশ করে হরেক রকম সুস্বাদ খাবার প্রস্তুত করতে লাগল। খাবারের সুঘ্রাণে পুরো এলাকাটাই বিমোহিত হয়ে গেল।

রাত প্রায় ৮টা পার হয়ে গেছে। এখনো মেহমান এসে পৌঁছায়নি। মাছুমার আম্মা ফাতেমা ওঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে অঝোরে কাঁদছেন আর মনে মনে ভাবছেন, “হায় আল্লাহ! এক সময় আমার ঘরে আলেম-ওলামাদের খাওয়া-দাওয়া হত। আজ সে বাড়িতেই রান্না হচ্ছে কমিউনিষ্ট হায়েনাদের খাবার। আহ্, জামানার এত বিবর্তন! কোনদিন ভাবতেও পারিনি, এ সোনার সংসার এমনিভাবে ছারখার হয়ে যাবে। ছোটকাল থেকে এ বাড়ীতে আছি। জীবন বিলিয়ে দিয়ে সংসার সাজিয়েছি। দিন-রাত বাদির মত কাজ করে জীবন ক্ষয় করেছি। আর আজ এ ঘর থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে! এ সুন্দর গড়া সংসারে অন্য নারী এসে সংসার পাতবে। হে আল্লাহ্! এ হতভাগিনীর প্রতি রহম কর। ছবর ও ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দান কর। হে আল্লাহ্! তোমার এ অবলা দাসির ঈমানের হেফাজত কর এবং তার প্রার্থনা কবুল কর।”

রাত ৯টা বাজার এখনো কয়েক মিনিট বাকি। হঠাৎ কয়েক জোড়া বুট জুতার শব্দ কানে আসতে লাগল। ফাতেমা বাতায়নের ছিদ্রপথে তাকিয়ে দেখলেন বহির্বাটিতে বেশকিছু অস্ত্রধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ে সরকারী খাকী পোশাক। ফাতেমার বুঝতে আর বাকি রইল না, এরা থানার লোক।

মাছুমার পিতা ও ভাই গোলামের মত তাদেরকে দরজা খুলে ঘরের ভেতরে নিয়ে এল। অপরাধী গোলাম তার মনিবের নিকট যেভাবে বিনয় ব্যবহার দেখায়, বাপ-বেটাও ঠিক একইরূপ করছে। দ্বীনের দুশমনের সাথে এ ধরনের ব্যবহার ফাতেমা মোটেই বরদাশ্ত করতে পারে না। তারপরও এগুলো তাকে দেখতে হল।

ওঘর থেকে মাছুমা জগ-গ্লাস-প্লেট-দস্তরখানাসহ চা-বিস্কুট নিয়ে ওদেরকে নাস্তা দেয়। মাছুমা নিজ হাতেই নাস্তা পরিবেশন করছে। অনেকেই একাধিক কাপ চা পান করেছে। ওদের মধ্য থেকে এক

লোক বলল, "জীবনে বহু চা পান করেছি বটে; কিন্তু এত মজাদার চা আর কোনদিন পান করিনি।"

মাছুমার আব্বা কালু মোড়ল স্বগর্বে বলে ওঠলেন, "এ চা আমার মেয়ে নিজেই তৈরি করেছে।"

অন্য একজন বলে বলল, "মোড়ল সাহেব! এ দেখতে যেমন পরমাসুন্দরী, তার কাজ-কামও মনে হয় তেমন সুন্দর। যেমন পিতা তেমন মেয়ে। আহ্, কি সুন্দর তার ব্যবহার, মন কেড়ে নেয়া আচরণ।"

কেউবা মাছুমার উড়নী টেনে কাছে নিয়ে চানাচুর মুখে তুলে দিতে উদ্যত। কিন্তু মাছুমা এসব থেকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে।

মাছুমাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করতে চায়। কেউ বলে, "মা! আমার বাসায় চল।" কেউ বলে, "আমাদের বাড়ীকে বেড়াতে যাবে কি আপা?" আবার কেউবা চা-পান বর্জন করে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে মাছুমার দিকে তাকিয়ে আছে। মাছুমা যেন তাদের ভোগের সামগ্রী, চিত্তরঞ্জনের নর্তকী।

চা পানের পর্ব শেষ হলে নিয়ে আসা হল ১০/১২ লিটার মদের পিপা। এবার চলছে মদপানের পালা। মাছুমাকে মদ ঢেলে দেয়ার কথা বললে সে এক অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ে। মাছুমা পবিত্র হাতে কাফেরদেরকে মদ ঢেলে দেবে, এটা সে বরদাশ্‌ত করতে পারে না বলেই বুদ্ধি করে কেটে পড়ল। ঐসব কুকুরের বাচ্চারা গলা পর্যন্ত মদপান করে আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করল। চক্ষুগুলো রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে অনেকেই। আনন্দময় পরিবেশে সময় অতিবাহিত করছে মেহমানরা।

এরই মধ্যে পাশ্ববর্তী এলাকার সাত-আট যুবক এসে ঘরে প্রবেশ করে। ওরা এসে দেখল, এ যেন একটা পাগলের হাট বসেছে। যুবকগুলো রাশেদের দাওয়াতী মেহমান। এলাকার কমিউনিষ্ট চর। যুবকদের ভাগ্যে আর মদ জুটল না। তবে এতক্ষণ মদের নেশা অনেকটা কমে এসেছে। এখন আজে-বাজে গল্পে আসর জমজমাট।

রাত প্রায় ১২টার কাছাকাছি। গৃহকর্তা কালু মোড়ল ঘরে প্রবেশপূর্বক স্ববিনয় নিবেদন করলেন, "স্যার! রাত তো অনেক হয়ে গেছে, আহারাদী সেরে নিলে ভাল হয়। কারণ, খানা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।"

মোড়লের কথায় সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করলে রাশেদ ও মাছুমা ওঘর থেকে খানা আনতে লাগল। রাশেদ তার বন্ধু কমরেড লুলুকে নিয়ে খানা পরিবেশন করছে। মাছুমা ভেতর থেকে খাবারগুলো এনে ওদের হাতে এগিয়ে দিচ্ছে।

ছায়েমা এশার নামায আদায় করে অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। কখনো শয্যা গ্রহণ করছে আবার শয্যা ত্যাগ করে বাড়ীর বাইরে এসে পায়চারি করছে। তোরাব হারুনী ছায়েমার অস্থিরতা আঁচ করতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনো ঘুমাওনি যে? রাতে কি আর কোন কাজ বাকি আছে?"

ছায়েমা উত্তর দিল, "ভাইয়্যা! আমি একটু ওদিক থেকে ঘুরে আসতে চাই। কিছুই ভাল লাগছে না।"

হারুনী বলল, "এতো রাতে অযথা ঘুরাফেরা করতে যাওয়া কি ঠিক হবে? যাও ঘরে যাও, এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়। আমি সকালেই খোবায়েবের সন্ধানে রওনা দেব।"

ছায়েমা হারুনীর কথামত মিছামিছি ঘুমের ভান করে শয্যা গ্রহণ করল। হারুনী নিজ গৃহে চলে গেলেন। ছায়েমা চুপি চুপি ক্লাশিনকভ লোড করে স্কন্ধে তুলে নিল আর হাতে নিল একটি গ্রেনেড। এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল মাছুমাদের গৃহাভিমুখে। কয়েক বাড়ী পার হলেই মাছুমাদের বাড়ী। ছায়েমা আস্তে আস্তে মাছুমাদের রান্নাঘরের পেছনের আম্র বৃক্ষের আড়ালে এসে দাঁড়াল এবং সবকিছু অবলোকন করছে। এমন সময় মাছুমাকে মেহমানখানা থেকে রান্নাঘরের দিকে আসতে দেখে খুব ক্ষীণস্বরে ডাকল, "মাছুমা, মাছুমা! আমি তোমার খোঁজ নিতে এসেছি।"

ছায়েমার ডাক প্রথমে বুঝতে পারেনি মাছুমা। হঠাৎ মনুষ্য ছায়ামূর্তি দেখে চমকে উঠল মাছুমা। তারপর সাহসে ভর করে এক-পা দু'-পা এগিয়ে আম্র বৃক্ষের নিকট গিয়ে দেখে ছায়েমা ফিল্ড মার্শালের মত দাঁড়িয়ে।

মাছুমা এই দুঃসময়ে সায়েমাকে পেয়ে খুশীতে আত্মহারা। মাছুমা ছায়েমাকে লক্ষ্য করে বলল, "ভাইজান! সরি, আপামণি! এত রাতে এখানে কি মনে করে?

ছায়েমা বলল, আরে এতসব আলাপ করার সময় নেই। বলো বলো শিগ্‌গির বলো, প্রোগ্রামের কি করেছ?

মাছুমা বলল, থানা থেকে ২৮ জন কনস্টেবল ও গ্রামের ৮ জন পাতিনেতা এসেছে। আর ওদের সাথে আমার পাষণ্ড পিতা ও ভ্রাতা রয়েছে। ওরা সবাই ভোজে লিপ্ত। রাশেদ ভাই আর কমরেড লুলু খানা পরিবেশন করছে। আমি এক্ষুণি কর্ম হাসিলের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

ছায়েমা চুপি চুপি বলল, তুমি ঐ দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করবে। সাবধান! লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন না হয়। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি। কেউ যদি অক্ষত বা আহত অবস্থায় পালাতে চেষ্টা করে, আমি এখন থেকে ব্রাশফায়ারে ঝাঁঝরা করে দেব।

মাছুমা গ্রেনেড হাতে ছুটে গেল দেয়ালের আড়ালে। তারপর দাঁতের সাহায্যে পিন বা রিং খুলে উচ্চারণ করল— 'অমা রামাইতা ইয রামাইতা অলা কিন্নাল্লাহা রামা।' সাথে সাথে গ্রেনেডটা নিক্ষেপ করল আহাররত দুশমনদের উপর। চোখের পলকে বিকট শব্দে গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হয়ে কেড়ে নিল প্রায় সবার প্রাণ। ২/৪ জন গুরুতর আহত হয়ে চিৎকার দিয়ে উঠছিল। ছায়েমা সাথে সাথে ব্রাশফায়ারে তাদের শেষ শব্দও থামিয়ে দেয়। তারাও লুটিয়ে পড়ল ভূমিতলে।

ছায়েমা তার অস্ত্রটি একটু দূরে লুকিয়ে রেখে চলে এলো মাছুমাদের আঙ্গিনায়। অকস্মাৎ প্রলয় নিনাদে গ্রামবাসীর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। পুলিশদের নিকট ছিল প্রচুর গোলা-বারুদ। গ্রেনেড বিস্ফোরণের সাথে সাথে একযোগে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রলয় নিনাদের সৃষ্টি হয়। কোথায় কি ঘটছে গ্রামবাসীরা সহজে বুঝতে উঠতে পারছে না। অনেকেই মনে করছে, ঘরের পেছন থেকে আওয়াজ হচ্ছে, তাই হতবুদ্ধি হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করল।

হৈ-হল্লা, কান্নাকাটি ও আর্তচিৎকারে ভরে ওঠল চারদিক। অশ্বের চিৎকার, কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ, মোরগের ডাক, গাধার চিৎকার ও বালক-বালিকাদের আর্তনাদে আসমান-যমিন প্রকম্পিত। সে দৃশ্য নিজ চোখে না দেখলে কেউ সহজে বুঝতে পারবে না। আগুনের লেলিহান শিখা আর ধুম্রকুণ্ডলী মিশ্রিত হয়ে এক আতংক সৃষ্টি হল। মনে হচ্ছে, কিয়ামত শুরু হয়েছে।

ফাতেমা রাগে-ক্ষোভে, দুঃখে-বেদনা ও অনুশোচনায় ঘরে শুয়ে কাঁদছিলেন। বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজে তার ঘরটা কেঁপে উঠল। তাক থেকে হাঁড়ি পাতিলগুলো হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়তে লাগল। খাটটিও মরমর শব্দে কুঁকিয়ে উঠল। শয্যা থেকে ওঠে দৌড়িয়ে বাইরে চলে এসে ফাতেমা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ফাতেমা চিৎকার দিয়ে ডাকতে লাগলেন, "মাছুমা, মাছুমা! একি হল, তুই কি জীবিত আসিস মা!"

মাছুমা দৌড়িয়ে মায়ের নিকট এসে কাঁদতে লাগল।

ছায়েমা মাছুমাকে খুব সতর্ক করে বলেছিল, "সাবধান! জীবন গেলেও এ ঘটনা কাউকে বলা যাবে না। অন্যথায় মহাবিপদ নেমে আসবে পুরো এলাকায়। আর কেউ যদি এ ব্যাপারে কিছু জানতে চায়, তবে বলবে, "সবাই এক সাথে খানা খেয়ে খোশগল্পে লিপ্ত ছিল। এমন সময় একজনের হাতে একটি লাল রঙের লোহার কি যেন ছিল। দেখতে অনেকটা আতাফলের মত দাগকাটা। লেবুর মত একটু লম্বা। পার্শ্বে একটি রিং ছিল। এ বস্তুটা হাতে নিয়ে দেখাদেখি করছিল। আমি যখন চা আনতে রান্না ঘরে যাই, তখনই বিকট একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি ধোঁয়া ও আগুনে পুরো এলাকা ছেয়ে আছে। এতটুকুই আমি দেখেছি।"

ছায়েমা মাছুমাকে আরো বলল, "আর যতটুকু পারিস তার চেয়ে একটু বেশী কান্নাকাটি করার চেষ্টা করবি। তবে সাবধান! গোপনীয়তা যেন প্রকাশ না পায়। অন্যথায় জীবনে রক্ষা নেই।"

এই বলে ছায়েমা হারুনীর বাড়ীর দিকে চলে যায়।

অগ্নিশিখা ও ধুম্রকুণ্ডলী দেখে এলাকার লোকজন ছুটে আসল মাছুমাদের বাড়ীতে। মাছুমা ও তার মা কৃত্রিম অচেতন হয়ে উঠানে পড়ে আছে। লোকজন ভেবেছিল হয়ত মারা গেছে। একজন ওদেরকে ধরে চিৎকার দিয়ে বলল, "আরে, এরা যে এখনো মরেনি, জীবিত আছে।" কেউ মাথায় পানি ঢালছে। কেউ হাত-পায়ে তেল মালিশ করছে। অন্য লোকেরা মেহমানখানার আগুন নেভানোর জন্য চেষ্টা করছে। আগুন নেভাতে পারলেও আসবাবপত্র রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া লাশগুলো পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

মাছুমার হুঁশ ফিরে এলে উক্ত ঘটনার বর্ণনা দিল। ইসলামপ্রিয় জনগণের অন্তরে উক্ত ঘটনায় আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগল। কেউ বলল, ওদের অস্ত্রই ওদের জীবন কেড়ে নিয়েছে। আবার কেউ বলছে, পরের জন্য গোর খনন করলে নিজেকেই সেই গোরে যেতে হয়। কেউ বলছে, এটা আর কিছু নয় আল্লাহর গজব। এলাকার গণ্যমান্য লোকজন জড়ো হয়ে পরামর্শ করলেন যে, এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিয়ে বসে থাকা ঠিক হবে না। এখনই প্রশাসনের গোচরে দেয়া দরকার। সবাই এতে একমত হলেন। তারপর তিনজন এ সংবাদ নিয়ে রাতেই চলে গেলেন থানায়।

থানা সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বিশাল এক টিম নিয়ে পরিদর্শনের জন্য চলে এলো ঘটনাস্থলে। গাড়ীগুলো পার্কিং করা হল মাছুমাদের বাড়ীর দহলিজে। সারারাত চলল নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মাছুমার জবানবন্দীও ওরা রেকর্ড করল। শেষ পর্যন্ত রিপোর্ট তৈরী হল, অসর্তকতাবশত গ্রেনেড নড়াচাড়া করার কারণে বিস্ফোরিত হয়ে এ দুর্ঘটনা সূত্রপাত হয়েছে।

তারা পোড়া লাশগুলো গাড়ীতে তুলে থানায় নিয়ে গেল।

পরদিন ভোরেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। ছুটে এলো সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারগণ। তাছাড়া এমপি, ডিসি ও মেজিস্ট্রেটসহ সব কর্মকর্তারা এসে হাজির। আসলেন এলাকার নেতা-পাতিনেতারাও। সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করছেন।

এদিকে সুচতুর ছায়েমা বিধ্বস্ত পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে এমপি ও ডিসি সাহেবের বরাবর দু'টি দরখাস্ত লিখে মাছুমার হাতে দিয়ে বলল, এ দু'টি দরখাস্ত তমি নিজ হাতে তাদেরকে দেবে। দেয়ার সময় যেন তোমার চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ঝরতে থাকে। তোমাকে যেন ওরা দেখতে পায় অনাথিনী, হতভাগিনী ও দুঃখিনীর বেশে। তোমার কান্নায় যেন সকলের পাষাণ অন্তর কেঁদে উঠে। তা না হলে পরিস্থিতি উল্টো দিকে গড়াতে পারে। এখানে রয়েছে অনেক গুপ্তচর। ওরা কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে সব পর্যবেক্ষণ করছে।

মাছুমা সাধারণ পোশাক পরিধান করে। অলকগুচ্ছ এলোমেলো করে ছেঁড়া উড়নিতে মাথা ঢেকে এক উন্মাদিনীর বেশে দরখাস্ত দু'টি

কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মাছুমার কান্নায় উপস্থিত জনতার চোখেও অশ্রুর বণ্যা বইতে লাগল। কেউ স্থির থাকতে পারেনি। একে তো মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বীভৎস চিত্র, অন্যদিকে এ পরিবারটির করুণ পরিনতি। পুরুষ লোক বলতে কেউ নেই। ওদের উপর ছায়া ধরবে এমন কেউ নেই সংসারে। সুখে-দুঃখে. এগিয়ে আসার এমন কেউ রইল না। দু'জন ব্যক্তিই জীবিত আছে এ পরিবারে। আর তারা দু'জনই মহিলা। সকলেই মর্মাহত। এ সংসার দেখা-শোনার গুরুদায়িত্ব কে কাঁধে তুলে নেবে, সে লোকের অভাব। কে কাকে কত দিন দেখবে, এসব চিন্তায় সকলেই চিন্তিত।

মাননীয় এমপি ও ডিসি সাহেব দরখাস্ত দু'টি মনে মনে পড়তে শুরু করলেন। এলাকার লোকজন অপলক নেত্রে চেয়ে আছেন জেলা প্রশাসক ও এসপি সাহেবের নয়নাভিমুখে। উভয়ের চোখেই অশ্রুর রেখা। উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে কে যেন বলে ওঠল, "স্যার! দরখাস্তের বিষয়বস্তু জানতে চাই। দয়া করে জানালে ভাল হয়।"

এমপি সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন, "এ অসহায় পরিবারের নিরাপত্তা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য এ দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে।"

উপস্থিত লোকেরা অধীর আগ্রহে তাদের মুখ থেকে নগদ একটা কিছু জানতে চাইলে এমপি সাহেব বললেন, "এ পরিবারের জন্য নগদ ১০ হাজার ডলার আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করব।"

১০ হাজার ডলারের একটি চেক মাছুমার হাতে দিয়ে বললেন, "সরকারীভাবে আরো কিছু করার চেষ্টা করব।"

জেলা প্রশাসক দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার ফান্ড থেকে এ অসহায় পরিবারটির জন্য ৫ হাজার ডলার অনুদান মঞ্জুর করা হল। আগামী ৩ দিনের মধ্যে থানা কমিউনিষ্ট নেতা যেন আমার অফিস থেকে ডলার নিয়ে আসেন। আর স্থানীয় ব্যাংকে একটা একাউন্ট খুলে সেখানে যেন টাকাগুলো জমা রাখা হয়। তাদের প্রয়োজন মত তুলে যেন খরচ করতে পারে।"

ডিসি সাহেব মাছুমাকে কাছে ডেকে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "মা! তোমার লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ প্রতিমাসে আমি নিজেই পাঠিয়ে দিব। তুমি ভালভাবে লেখাপড়া করতে থাক।"

২য় খণ্ড — ৫ নং ফর্মা

তিনি স্থানীয় বলসেভিক নেতাদেরকে বললেন, “আপনারা এ পরিবারটির প্রতি সুনজর রাখবেন। যদি অপ্রীতিকর কোন কিছু শুনি, তবে চূড়ান্ত এ্যাকশন নেব।”

তিনি মাছুমাকে আরো বললেন, “বেটি মাঝেমধ্যে তোমার আম্মীকে নিয়ে আমার বাসায় বেড়াতে যেও। যদি কোন অসুবিধে হয়, তখনই আমাকে অবগত করবে। আমি তা দেখব।”

এ বলে তারা নিজ নিজ গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন। এলাকার লোকজনও নিজ নিজ বাড়ী চলে গেল।

[নয়]

আমি অশ্বারোহী মুজাহিদকে (পত্রবাহক) স্ববিনয় নিবেদন করলাম, “ভাইজান! এখান থেকে রণাঙ্গন কত দূর? আপনার সাথে ওখানে যাওয়া যাবে কি?”

অশ্বারোহী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, “ভাই! তোমার পরিচয় কি?”

আমি আমার সঠিক পরিচয় দিতে গিয়ে বললাম, “আমার নাম খোবায়েব। নিবাস আমলাআতায় অন্তর্গত জামবুলে। আমার আব্বা আমলাআতার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ জামেউল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপরিচালক ছিলেন। বলসেভিকরা তাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করে দিয়েছে।”

এতটুকু বলে আমি আমার বিভিন্ন সফল অভিযানের কথা এক এক করে বর্ণনা করলাম। ছায়েমা মালাকানীর কথা, আমীর সাহেব ও জাফর ভাই-এর অভিযান এবং উভয়ের শাহাদাতের কথা খুলে বললাম।

অশ্বারোহী অত্যন্ত দুঃসাহসী ও বিচক্ষণ একজন মুজাহিদ। তিনি সহজেই আমার কথাগুলো মেনে নেবে বা বিশ্বাস করবে, এমনটি নন। তিনি আমার আপাদমস্তক খুব ভালভাবে অবলোকন করতে লাগলেন। অভিযানগুলোর কথা তিনি আগেই পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং লোক মুখে শুনেছেন। এমনকি শহীদ কমান্ডার আনোয়ার পাশা ও (রহঃ) নাকি মুজাহিদদের বলেছেন, “তোমাদের আরো একটি দুঃসাহসী কাফেলা জিহাদ করছেন। সে কাফেলার সেনাপতিকে পেলে নিশ্চয় আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আরো কঠিন অভিযান চালাতে পারতাম। কিন্তু

আফছোছ! ওদের সাথে আজো কোন যোগাযোগ হয়নি।"

প্রবীণ অশ্বারোহী আমাকে হাতের ইশারায় আরো একটু নিকটে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎস! অভিযানগুলোর কথা যা বলেছ, তা সত্য। আমাদের প্রাণপ্রিয় সেনাপতির পবিত্র জবান থেকেও বারবার এসব হামলার কথা শুনেছি। তবে তোমাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না। কারণ, তোমার আপাদমস্তকে কমিউনিজমের নির্দশন বিরাজ করছে। তাছাড়া এ অল্প বয়সে এসব অভিযান চালানো তোমার পক্ষে কি করে সম্ভব, তা একজন সমরবিদ মেনে নিতে পারে না। অপরদিকে এত বড় বড় হামলাও দু'একজনের পক্ষে চালানো এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা অবিশ্বাস্য।"

আমি উত্তর দিলাম, "মোহতারাম! আপনার ধারণা পবিত্র কালামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আপনি কি সূরা বাকারা ২৪৯নং আয়াতটি পাঠ করেননি— অল্পসংখ্যক দুর্বল ঈমানদার জালুতের বিশাল শক্তিশালী বাহিনীকে ধরাশায়ী করেছিল। আর দাউদ জালুতকে হত্যা করেছিল আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহ যদি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ কাফেলার প্রতি রাজী থাকেন, তার সাহায্য আর অনুগ্রহ যদি শামেলে হাল হয়ে যায়, তবে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে।"

আমার কথা শুনে অশ্বারোহী আবার প্রশ্ন করলেন, "বৎস! তোমার কথা সত্য, তবে ফতোয়া তো বাহ্যিক অবস্থার উপর হয়ে থাকে। আমি বেশ-ভুষায় তোমাকে কি করে একজন মুজাহিদ জ্ঞান করতে পারি, বল?"

আমি উত্তরে বললাম, "তা ঠিক, তবে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'যুদ্ধ কূট-কৌশলের নাম'। সে হিসাবেই এই মুহূর্তে আমার বেশ-ভুষা এমন দেখাচ্ছে। তারপর আমি এক এক করে দু'তিনজন মেজর ও জেনারেলের পরিচয়পত্র বের করে তার হাতে দিলাম। তিনি সেগুলো ভালভাবে দেখে মুচকি হাসলেন।"

আমাদের কথোপকথন হচ্ছিল সিপাহী আনোয়ার পাশার আখেরী বার্তা পৌছিয়ে রণাঙ্গনে ফেরার পথে এক বৃক্ষের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে। রাস্তাটি নিরিবিলি নয়, বহু লোকজন এ রাস্তায় যাতায়াত করে। যাতায়াত করে অনেক গাড়ী-ঘোড়াও। হঠাৎ সাইরেন বাজিয়ে

একটি দ্রুতগামী গাড়ী এদিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কোন শক্তিশালী দুশমন এপথে আসছে। সাথে আসছে দেহরক্ষীর গাড়ী বহর। তাই সাইরেনের আওয়াজ কানে আসার সাথে সাথে আমাকে বললেন, "খাতরাহ! খাতরাহ!" এই বলে তিনি দ্রুত অশ্ব নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালেন।

'খাতরাহ-খাতরাহ' উচ্চারণে আমি বুঝলাম, হয়তো আর রক্ষা নেই। তাই আমিও দ্রুত পালানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু এতক্ষণে গাড়ী-বহর আমার নিকটে এসে থেমে গেল। সাথে সাথে কয়েকটি ফাঁকা গুলীর বিকট আওয়াজ আমার দু'দিক দিয়ে চলে গেল। আমি শুয়ে পড়ার চিন্তা করেও দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ, শুয়ে পড়লে হয়ত ওরা বুঝবে আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদ। দাঁড়ানোর সাথে সাথে দু'জন লাল ফৌজ আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল গাড়ীতে। আমাকে গাড়ীতে তুলে পূর্বের ন্যায় সাইরেন বাজিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলল। একটি পতাকাবাহী শ্বেতবর্ণের প্রাইভেট কারকে কেন্দ্র করে সম্মুখে-পশ্চাতে তিন-তিনটি সেনাবাহিনীর গাড়ী ছিল। প্রত্যেক গাড়ীতেই ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। পরে জানতে পারলাম, প্রাইভেট কারটি ছিল লেলিনের একান্ত সহকর্মী মিস্টার কলিনের। তিনি রাজধানী আলমাআতা থেকে আসছেন, যাবেন মিলিউস্ত শহরে। তাই নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে চলছেন।

একজন সেনা অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পরিচয় কি খোকা?"

আমি বললাম, "স্যার! আমার নাম কমরেড খোবায়েব, বাড়ী জামবুলে, লেখাপড়া করি আমলাআতা কলেজে।"

অফিসার আবার প্রশ্ন করলেন, "জামবুল তো বহুদূর, এখানে আসলে কেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "স্যার, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলাম।"

"যে লোকটির সাথে আলাপ করছিলে, লোকটি কে এবং তার সাথে কি আলাপ করছিলে? সত্য করে বল। তা না হলে গাড়ীর চাকায় পিষ্ট করে ফেলব।" অফিসার বলল।

আমি ভয়ে কেঁপে কেঁপে বললাম, "স্যার, অশ্বারোহী আমাকে ডেকে তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আসকাবাদ যাওয়ার রাস্তা জিজ্ঞেস করছিল। আমি বলতে না বলতে কেন যেন লোকটি 'পালাও পালাও' বলে পালিয়ে যায়। তার কথামত আমিও পালাতে চাচ্ছিলাম।"

ঃ সে কি আনোয়ার পাশার অশ্বারোহী লোক নয়? অফিসার জিজ্ঞেস করে?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ সে কি একজন মুজাহিদ?

ঃ স্যার মুজাহিদ নাম শুনেছি বটে, কিন্তু কোনদিন দেখার সুযোগ হয়নি। তবে লোকটার প্রতি আমার সন্দেহ ছিল প্রচুর। বিচক্ষণ ও অশ্ব চালনায় দক্ষ এমন লোক দ্বিতীয়টি আর দেখিনি।

এবার অফিসার অন্যজনকে উদ্দেশ করে বললেন, ছেলেটির কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ এলাকায় মুজাহিদদের তৎপরতা অনেক পূর্বে থেকেই শুনে আসছি। আজ তা স্বচক্ষে দেখে গেলাম। এসব এলাকায় অভিযান চালিয়ে সফল হওয়া যাবে তা আশা করা যায় না। তবে এসব এলাকায় বিপুলসংখ্যক কমান্ডো অভিযান চালাতে পারলে হয়ত কিছুটা সাফল্য লাভ করা যেত। অফিসে গিয়ে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছব।

জোহরের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। এখনো নামাজ পড়া হয়নি। কিছুক্ষণ পরেই ওয়াক্ত বিদায় নিবে। আমি খুব অস্থিরতা বোধ করছিলাম। তাছাড়া মর্মে মর্মে আনোয়ার পাশার শাহাদাতের অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। দীর্ঘদিনের আশা-আকাংখা, প্রচেষ্টা আর পুঞ্জিভূত উদ্দীপনা আকস্মাৎ এক ঝঞ্ঝাবায়ু যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার অজান্তে বিষমাখা তীর যেন আমার কলিজা বিদীর্ণ করে ওপারে চলে গেল। যেন কোন অবাঞ্ছিত শিকারী হৃদয়ে লালিত কস্তুরী ভাণ্ডটি (আনোয়ার পাশার সাক্ষাত) আমাকে বধ করে হরণ করে নিয়ে গেল। আমি এমনই এক মর্মবেদনায় অস্থিরতার পারাবারে সাঁতার কাটছিলাম।

অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে যুবক! মনে হয় তুমি কি যেন ভাবছ?"

আমি বললাম, "স্যার অনাকাংখিত গ্রেফতারি আমাকে ব্যথিত করে তুলেছে। বারবার আমার আম্মার কথা মনে পড়ছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এ মর্মবেদনায় আমার তনুমন চুরমার হয়ে যাচ্ছে।"

অফিসার হঠাৎ আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে গগন-ফাটা এক ধমক দিয়ে বলল, "অশ্বারোহী যুবকের সাথে তোমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অশ্বারোহী আর কেউ নয়, আনোয়ার পাশার মুজাহিদ। কাজেই তোমাকে মাটির তলে জীবন্ত পুঁতে ফেলব।"

অফিসারের ধমকে আমি আরো ভয় পেয়ে গেলাম। শরীরের কম্পন ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি অন্য কোন উপায় না দেখে এ অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলাম।

অনেক বন-বাদাড় মাঠ-ঘাট পেরিয়ে গাড়ী বহর এগিয়ে চলছে। কোথাও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। মিস্টার কলিন তার আরো দু'জন বন্ধুকে নিয়ে মিলিউন্ডে যাবেন এক জনসভার প্রধান অথিতি হিসেবে। সেখানে লক্ষ জনতার বিশাল সভা। রাস্তায়- রাস্তায়, মোড়ে-মোড়ে নিরাপত্তা খুব জোরদার করা হয়েছে মিস্টার কলিনের আগমন উপলক্ষে। মাঝে-মাঝে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। অভ্যর্থনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে জাগায় জাগায়। মিস্টার কলিন ২/১ মিনিট গাড়ী থামিয়ে হাত নাড়িয়ে অভ্যর্থনা গ্রহণ করে চলছেন।

অশ্বারোহী আবু সুফিয়ান দূর থেকে ঘাড় ফিরিয়ে আমার গ্রেফতারের দৃশ্য দেখছিলেন। এ দৃশ্য তাকে মর্মাহত করে তুলল। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, হায়েনারা নিরপরাধ একজন মুজাহিদকে ধরে নিয়ে গেল। হয়ত তাকে আর জ্যান্ত রাখবে না। অসহায় ভাইটির মুক্তির জন্য কোন চেষ্টা না করলে, এটা হবে অমানবিক ও কাপুরুষতা। এসব ভেবে একটি গ্রুপের নিকট ওয়ারলেসে জানিয়ে দিলেন যে, "একটি গাড়ী বহর মিলিউন্ডের দিকে এগিয়ে আসছে। সাইরেন বাজানো গাড়ীটিতে ওরা একজন তরুণ মুজাহিদকে বন্দী করে তুলে নিয়েছে। নিশানধারী সাদা গাড়ীতে হয়ত কোন নামকরা কমিউনিষ্ট নেতা থাকতে পারে। যদি সম্ভব হয়, তোমরা তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা কর।"

আবু সুফিয়ান ওয়ারলেসে জানিয়ে দিলেন, ১৭ নম্বর গ্রুপের কমান্ডার মুজাহিদুল ইসলাম হরবীকে। মুজাহিদুল ইসলাম হরবী স্বয়ং আনোয়ার পাশার নিকট প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। আনোয়ার পাশার সাথে অনেক যুদ্ধে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন বহুবার। তাই হরবীর নাম জানে না এমন লোক কমই আছে।

মুজাহিদুল ইসলাম সাথীদেরকে নিয়ে পরামর্শ করলেন, কিভাবে গাড়ী বহরে আক্রমণ করে আমাকে উদ্ধার করতে পারে। একজন মুজাহিদ কমান্ডার হরবীকে পরামর্শ দিলেন, মিলিউন্ডগামী মহাসড়কে যে বেইলী ব্রীজ রয়েছে, সে ব্রীজের দু'-একটি পাত যদি খুলে ফেলতে পারি, তবে একটি গাড়ীও পার হতে পারবে না। তারপর আমরা আক্রমণ চালালে হয়ত কামিয়াব হব।

হরবী এ পরামর্শ মেনে নিয়ে সবাইকে অস্ত্রে সজ্জিত হতে নির্দেশ দিলেন। এমএলআর, এলএমজি ও ক্লাসিনকোভ ও বিপুল পরিমাণ গোলা-বারূদ ও ডিনামাইট নিয়ে ব্রীজে চলে আসলেন। অল্প সময়ে পাত খোলা সম্ভব নয়। তাই ব্রীজের নীচ দিয়ে মধ্যখানে ডিনামাইট ফিট করে দূরে পজিশন নিয়ে বসে গেলেন। একটি তেলবাহী ট্রাক ব্রীজে উঠার সাথে সাথে ডিনামাইটটি বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়ে যায় এবং ব্রীজটির কতক অংশ ধসে পড়ে। ট্রাকটি আশ্রয় নেয় নদীগর্ভে। পানির উপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করে।

এর অল্পক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ী বহর ব্রীজটির নিকট আসল। কিন্ত পার হওয়ার উপায়? সবাই গাড়ী থেকে নেমে উপায় খুঁজতে শুরু করে। এরই মধ্যে দু'দিক থেকে আরম্ভ হল গোলাবৃষ্টি। প্রথমেই সাতটি গাড়ীর সবক'টি চাকা ঝাঁঝরা হয়ে গেল ফায়ারে ফায়ারে। সৈনিকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গুলীর জবাব গুলীতে দিতে লাগল। এই সুযোগে আমি আস্তে আস্তে নদীর কূল ঘেঁষে চলে এলাম বহুদূরে। প্রচন্ড গোলাগুলীতে ৩ জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করলেন। আর ১৩ জন দুশমন প্রাণ হারাল। মারা গেল বলসেভিকদের প্রাণপ্রিয় নেতা মিস্টার লেলিনের একান্ত বন্ধু মিস্টার কলিন। ৩ জন মুজাহিদ সামান্য আহত হলেন। দুশমন আহত হল ডজনখানেক। ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে উভয় পক্ষের গোলাগুলি থেমে গেল।

আমার ধারণা হল যে, উভয়পক্ষের গুলীর সংখ্যা হয়ত কমে আসছে। তা না হলে সবগুলো দুশমন নিহত না হওয়া পর্যন্ত হরবী যুদ্ধ ক্ষ্যান্ত করতেন না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, মুজাহিদরা আহতদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন, আর অন্যরা কিছুক্ষণ পরপর ফায়ার করে চলেছেন।

সন্ধ্যার আর তেমন একটা বাকী নেই। সূর্যটা নিস্তেজ হয়ে পশ্চিম আকাশে ঢলতে আরম্ভ করল। এতক্ষণে আমি চলে এসেছি নদীর কূল বেয়ে অনেক দূরে– দুশমনের নাগালের বাইরে। যোহর-আসর কাজা হয়েছে। তাই নদীর পানিতে অজু করে নিকটের এক বাঁশ বাগানের ভেতর দাঁড়িয়ে কাযা নামাজসহ মাগরিবের নামাজ পড়ছিলাম।

দূর থেকে একজন লোক আমাকে দেখে চুপি চুপি এগিয়ে এলেন বাঁশ বাগানের একদম নিকটে। বাঁশ বাগানে আমাকে নামাজ পড়তে দেখে লোকটি সন্দেহ করেছে আমি আনোর পাশার দলের মুজাহিদ কি-না। তাই নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুতপদে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে আমার গা শিউরে উঠে। চেয়ে দেখি লোকটি আমার নিকট দণ্ডায়মান। লোকটি আমাকে প্রশ্ন করল, "তোমার পরিচয় কি? সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে এখানে কি করছ?"

আমি জবাবে কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই চুপটি করে অংগুলি গণনায় তাছবিহ পাঠ করতে লাগলাম।

আগন্তুক কি যেন একটু ভেবে খুব নম্রসুরে বললেন, "বাবা, তোমার সাথে আর কোন লোক আছে কি?"

উত্তর দিলাম, "জ্বী না, আমি একাই।"

তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন তার গৃহাভিমুখে এবং বলতে লাগলেন, "এলাকার অবস্থা খুবই নাজুক। গত দু'দিন আগে রাতের আঁধারে লাল ফৌজরা পুরো গ্রামে ক্রেকডাউন লাগিয়ে দশজন মুজাহিদকে ধরে নিয়ে গেছে। তাছাড়া ১৫/২০ জন দ্বীনদার পরহেজগার আলেম-ওলামাকেও ধরে নিয়ে গেছে। জ্বালিয়ে দিয়েছে ৬টি বাড়ী। পাশবিক অত্যাচার করেছে মুসলিম মহিলাদের উপর।"

তিনি আরো বললেন, আমদের এলাকায় আনোয়র পাশার খুব প্রভাব ছিল। এমন পরিবার খুব কমই ছিল, যে পরিবারে ২/১ জন

মুজাহিদ আশ্রয় নেয়নি। দুঃখের বিষয়, ওলামাদের ফতোয়া প্রকাশের পর অনেকেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, যার কারণে পরপর ক্রেকডাউন লাগিয়ে বলসেভিকরা ধরে নিয়ে গেছে মুজাহিদ ও তাদের সর্মথকদের।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আনোয়ার পাশা কোথায় আছেন তা বলতে পারেন কি?"

লোকটি উত্তর দিলেন, "না, বলতে পারব না। তবে ধারণা হচ্ছে যে, তিনি ওলীপুর, বোলগ্রেড, চাখার, দিমাল্যান্ড ও জুমুরিয়া এলাকায় আছেন। ওসব এলাকায় প্রায় ঘরে ঘরে মুজাহিদ।"

তার কথায় বুঝতে পারলাম, আনোয়ার পাশার শাহাদতের সংবাদ এসব এলাকায় এখনো পৌঁছেনি। আমরা আলাপ করতে করতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার বাড়ীতে এসে পৌছলাম।

[দশ]

দিনমণি অস্তাচলে হারিয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চারদিক। নিঝুম-নিথর রজনী। চারদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব বিরাজ করছে। বিশ্ব প্রকৃতি যেন পরিশ্রান্ত হয়ে মুখ থুবড়ে নিদ্রায় অচেতন। দূর আকাশে কয়েকটি নক্ষত্র মিট মিট করে জ্বলছে। এছাড়া কোন প্রাণী জেগে নেই।

ছায়েমা নামাজ আদায় করে তিলাওয়াত করছে। তোরাব হারুনী ছায়েমার গৃহে প্রবেশ করে বললেন, "এলাকার পরিবেশ বেশ থমথমে। জানি না কখন কি ঘটে যায়। তোমরা সাবধানে থেক। আমি প্রত্যুষেই খোবায়েবের সন্ধানে তুর্কিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হব।"

হারুনী ছায়েমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

এদিকে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ধেয়ে আসছে এলাকার যুবক-যুবতীরা। ছায়েমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো যুবকদের নিকট। একই সুরে ভেসে আসল সালামের ধ্বনি। ছায়েমা সালামের জবাব প্রদান করে সবাইকে সম্বোধন করে বলল, "হে আমার যুবক-যুবতী ভাই ও বোনেরা! ইসলাম নামক বৃক্ষের গোড়ায় তোমাদের মত যুবক-যুবতীদের তপ্ত লহুসিঞ্চন ব্যতীত সজীব হবে না। যুগে যুগে

মুজাহিদরা তাদের শোণিতধারা ইসলাম নামক বৃক্ষের গোড়ায় ঢেলে দিয়ে সজীব রেখেছে। কাজেই তোমাদেরকেও সে জানবাজ মুজাহিদদের পদাংক অনুসরণ করতে হবে।

মৌলভী দেলোয়ার হুযাইফি দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আমার মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা সবাই মুসাফির ভাইয়ের নিকট জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেছ। আমি মনে করি, এ অঙ্গীকার মুসাফিরের হাতে নয়, এ অঙ্গীকার স্বয়ং আল্লাহর হাতে। এ শপথ তাঁর রাসূলের হাতে। সুতারাং কেউ মুনাফিকী করবে না। তোমাদের ওয়াদাকৃত অর্থকড়ি অনতিবিলম্বে বাইতুলমালে জমা দিয়ে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি ক্রয়ে সহযোগিতা কর।"

মৌলভী হুযাইফীর ভাষণ শেষ করতে না করতেই মাহফিলের একপার্শ্ব থেকে মাছুমা দাঁড়িয়ে বলল, "জনাব আমীর মোহ্তারাম! আমি আমার পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যুতে সরকারীভাবে যে অনুদান পেয়েছি, তা সম্পূর্ণই জিহাদের জন্য বাইতুলমালে জমা দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। এ অর্থের মধ্যে আমার আম্মার অংশও রয়েছে। তিনি নিজেই খুশী হয়ে তার অংশও দ্বীনের রাস্তায় খরচ করার অনুমতি দিয়েছেন। সবগুলো টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবেন। সবমিলে টাকার পরিমাণ হবে প্রায় ১৫ হাজার ডলার।"

মাছুমার বক্তব্য শেষ হলে ছায়েমা দাঁড়িয়ে বলল, "হে আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা! মাছুমার বক্তব্য হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই একজন নামকরা মুনাফিক ছিল। নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধের ময়দানেও গিয়েছিল। সে সবসময় মুসলমানদের অনিষ্ঠ চিন্তায় লিপ্ত থাকত। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই নবী করিম (সাঃ) ও সাহাবীদের বিরুদ্ধে আনসারদেরকে উত্তেজিত করে তুলল এই বলে যে, তোমরা তাদেরকে কোন সহযোগিতা দিবে না এবং তাদেরকে দেশে আশ্রয় না দিয়ে বের করে দাও। উক্ত কথাগুলো জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) নিজ কানে শুনে মহানবী (সাঃ)-এর নিকট বলে দিলেন। মহানবী (সাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল যে, আমি ওসব কিছুই বলিনি, জায়েদ ইবনে

আরকাম মিথ্যা বলেছে। হুজুর (সাঃ) তার কথাই মেনে নিলেন। এদিকে হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, হে আমার নবী! আপনি হুকুম দিন, আমি এক্ষুণি মিথ্যাবাদী পাপিষ্ট আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। হযরত নবী করিম (সাঃ) ওমরকে বারণ করলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর ছেলের নামও ছিল আব্দুল্লাহ্। তিনি ছিলেন খাঁটি ঈমানদার। তিনি এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার পাপিষ্ঠ পিতাকে যদি হত্যা করতে বলেন, তবে আমাকে হুকুম দিন। আমি তাকে হত্যা করব। সুবহানাল্লাহ্! কি ছিল নবীপ্রেম। দ্বীনের খাতিরে পিতা পুত্রের সম্পর্ক ছিল এমনটিই। আজ মাছুমাও এ সত্যটি প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে, তার পিতা ও ভ্রাতার হত্যার মধ্যদিয়ে।"

ছায়েমার কথায় সকলেই আঁচ করতে পারল মাছুমার পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যুর রহস্য কি। অতঃপর রাত গভীর হওয়াতে সবাইকে বিদায় দিয়ে ছায়েমা নিজ গৃহে গিয়ে নামাজ আদায় করে শুয়ে পড়ল।

রাত পোহায়ে ভোর হয়েছে। তোরাব হারুনী তৈরী হচ্ছেন খোবায়েবের সন্ধানে যাওয়ার। খোবায়েবের বৃদ্ধা জননী এসে হারুনীকে বললেন, "বাবা! তুর্কিস্তান তো অনেক দূরের পথ। দেশের অবস্থা ভাল নয়, খুব সাবধানে পথ চলবে আর বেশী বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আল্লাহ যেন তোমাদেরকে আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনেন। পথে-ঘাটে বেশী বিলম্ব করো না কিন্তু। খোবায়েবের সন্ধান পেলে তাকে সংগে করে নিয়ে এসো। আর যদি তাকে জিহাদের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় অথবা তাকে নিয়ে আসলে জিহাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়; তবে ওকে আনার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করবে না। আমার হুকুমের চেয়ে আল্লাহর হুকুমের প্রাধান্য বেশী। আমার খেদমতের চেয়ে দ্বীনের খেদমতের প্রয়োজন বেশী।

অত্যন্ত শান্ত মেজাজে কথাগুলো বললেন খোবায়েবের বৃদ্ধা মা।

ছায়েমা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কান পেতে কথাগুলো শুনছিল আর মনে মনে ভাবছিল যে, "হায়! এ কত করুণ দৃশ্য! নিজেই ভাসমান তৃণের মত! তদুপরি একমাত্র আদরের সন্তানকে আল্লাহ পথে সপে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে, এতো সহজ ব্যাপার নয়। এমন মা

ক'জনার আছে। সত্যিকার অর্থে, তিনি এ যুগের বিবি খানছা (রাঃ)-এর ভূমিকা পালন করছেন। ছায়েমা আরো ভাবছিল যে, হয়ত ইহজগতে খোবায়েবের সাক্ষাত আর পাব না। আরো কত রাজ্যের চিন্তা ছায়েমার কচি মনে শিউলীর মত ভেসে বেড়াতে লাগল।

তৃষ্ণা নাস্তা এনে হাজির করলে ছায়েমা নিজ হাতে নাস্তা পরিবেশন করল। হারুনী খানা খাচ্ছেন আর ফাঁকে ফাঁকে তৃষ্ণাকে উপদেশ দিচ্ছেন– তৃষ্ণা যেন ঘর-সংসার ভালভাবে দেখাশোনা করে আর ঘরে উপস্থিত দু'জন মেহমানের প্রতি যেন নজর রাখে। মেহমানদের আদর-আপ্যায়নে যেন কোন প্রকারের ত্রুটি না হয়। ছায়েমাকে বললেন, সে যেন বেশী আবেগের বশে কোন কিছু না করে।

ঘড়ির কাটা সকাল ৮টা পার হয়ে গেছে। আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। কারণ, সকাল ৯টার মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে যাবে। হারুনী সকলের নিকট থেকে বিদায় ও দোয়া নিয়ে রিকশায় চড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রিকশা এসে স্টেশনে থামল। হারুনী টিকিট খরিদ করে ট্রেনের অপেক্ষায় বিশ্রামাগারে এসে বসলেন।

এমন সময় একজন লোক এসে হারুনীর পরিচয় জানতে চাইল। গায়ে তার মামুলী পোশাক। চোখ দু'টো তার সন্ধানী। প্রতি চাহনিতে যেন সে কিছু আবিষ্কার করছে। হারুনী তার পূর্ণ পরিচয় দিলেন। কিন্তু লোকটির যেন এতে তৃপ্তি হল না। সে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে অনেক বিষয় জানতে চাইল। হারুনী বুঝতে পারলেন, লোকটি সাধারণ ব্যক্তি নয়। এ হয়ত পদস্থ কোন গোয়েন্দা হবে। তাই হারুনী প্রশ্নের উত্তরগুলো সতর্কতার সাথে দিলেন।

এর মধ্যে ট্রেন এসে ষ্টেশনে দাঁড়াল। হারুনী ঝটপট করে ট্রেনে উঠে নিজ আসনটি গ্রহণ করলেন। ট্রেনটি এবার প্রলয় সিংগা বাজিয়ে পাগলা ঘোড়ার মত সামনে এগিয়ে চলল। মেইল ট্রেন হওয়ায় সব স্টেশনে দাঁড়ায়নি। স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে শুধু বড় বড় স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। রাজধানীগামী ট্রেনটি এত অল্পসংখ্যক যাত্রী নিয়ে চলতে দেখে হারুনী অবাক হয়ে গেল। স্টেশনে অন্য সময়ের মত ভীড় নেই। মনে হয় দেশে লোকসংখ্যা অনেকটা কমে গেছে। হারুনী ট্রেনে বসে বসে ভাবছেন স্টেশনে প্রশ্নকারীকে নিয়ে। এমতাবস্থায়

দেখেন, প্রশ্নকারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তার সাথে আরো কয়েকজন শক্তিশালী লোক। সকলেই অস্ত্রধারী। কাছে এসে প্রশ্নকারী আঙ্গুলি নির্দেশ করল। সাথে সাথে অস্ত্রধারী লোকগুলো হারুনীকে গ্রেফতার করল। হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিল তার হাতে। কেন তাকে গ্রেফতার করা হল, কি তার অপরাধ— কিছুই বুঝতে পারেননি হারুনী। পুঞ্জীভূত বেদনায় অন্তর ভারাক্রান্ত। অশ্রুধারা আর বাঁধ মানছে না। আঁখিযুগলের অশ্রু গড়িয়ে সুর্মা ধুয়ে গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। ধমনীর উষ্ণ রুধিরধারা আরো চঞ্চল উদ্যমে হৃদপিণ্ড শতধা বিদীর্ণ করার উপক্রম। মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করার মতো কেউ নেই হারুনীর সাথে। মুক্তির পথ আবিস্কারের জন্য কতই না চিন্তার অথৈ পারাবার মন্থন করে ফিরে আসলেন অববাহিকায়— চরম ও পরম মুক্তিদাতা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে।

হারুনী মনে মনে স্বকাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে আমার পরওয়ারদেগার মওলা! তুমি আমার জীবনের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দাও। তোমার এ অপরাধী বান্দাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার কুদরত আর হিকমতের কোন সীমা নেই। কাফেররা তোমার পরম বন্ধু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল আর তুমি তোমার মহিমা দ্বারা অগ্নিকুণ্ডকে পুষ্পোদ্যানে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলে। হযরত ইউনুস (আঃ)কে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে মৎস-উদরে আশ্রয় দিয়ে আবার উদ্ধার করেছিলে। তোমার কুদরত বোঝার সাধ্য কারো নেই। আমি আজ ভিখারীবেশে বুক ভরা আশা নিয়ে তোমার দুয়ারে হাজির হয়েছি। আসন্ন বিপদ থেকে তুমি ছাড়া মুক্তি দেয়ার আর কেউ নেই। এ দাসের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তুমি আমাকে মুক্তি দিয়ে দাও।"

হারুনী সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

দুপুর ১২টা। ট্রেনটি এসে দাঁড়াল খানডেরা স্টেশনে। পুলিশ হারুনীকে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেল। খারডেরা স্টেশনের অদূরেই থানা হেডকোয়ার্টার । হারুনীকে থানা গারদে ঢুকিয়ে দিল। কেন তার উপর এমন জুলুম— হারুনী জিজ্ঞেস করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন অনেক আগেই। কক্ষটি এতই সংকীর্ণ ছিল যে, এর মধ্যে

৫/৬ জন লোকের সংকুলান হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষুদ পরিসরে গাদাগাদি করে আসামী ঢুকানো হয়েছে ১২ জন। বসা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব না। কক্ষটি ছিল প্রায় আলো-বাতাসপ্রুফ অর্থাৎ তার ভেতরে কোন আলো-বাতাস প্রায় প্রবেশ করতে পারে না। অন্ধকার প্রকোষ্ট। মনে হয় দুনিয়ার সব অন্ধকার বন্দি করে রেখেছে কক্ষটিতে। ভেতরে একজন লোক সংকুচিত হয়ে ঢুকতে পারে। মলমূত্রের উৎকট গন্ধে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কখন দিন হয় আর কখন রাত হয় তা টের পাওয়া খুবই মুশকিল। এ কক্ষটিতে কেউ চার-পাঁচদিন, কেউ আট-দশদিন যাবত ঈমানী পরীক্ষা দিতে চলছে। এর আগেও নাকি কয়েকজন ছিল। তাদের মধ্যে থেকে কেউ পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন আবার কাউকে পাগল আখ্যা দিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে। এই ১২ জনের মধ্যে কেউ তাদের গ্রেফতারের কারণ জানে না।

বন্দীদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকই ছিলেন আলেম। অন্ধকারের কারণে হারুনী প্রথমে তাদেরকে চিনতে পারেনি, সকলের চেহারা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দীর্ঘক্ষণ আঁধারের সাথে সম্পর্ক হওয়ার পর একটু একটু দৃষ্টিগোচর হওয়ায় আশপাশের দু'-একজনকে কিছু প্রশ্ন করেন। এরই মধ্যে হারুনী বন্দীদের পরিচয় জানতে পারেন। তাদের চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ঝরছিল। কারো মুখে ছিল না কোন ভাষা, ছিল না হাসি। শোকাতুর বন্দীদের নেত্রযুগলে ভেসে উঠছিল দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্রবক্ষের অফুরন্ত বেদনার তরঙ্গমালা। ঘন নীলাভ উর্মিমালা সগর্বে মাথা উঁচু করে কোথায় কোন্ সুদূরে যেন চলেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

হারুনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দু'-একজনকে প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের দাড়ি মুন্ডানো দেখছি, আবার কথা-বার্তায় আলেম বলে মনে হয়! তার কারণটা জানতে পারি কি?"

বন্দীদের মধ্য থেকে একজন কেঁদে কেঁদে উত্তর দিল, "ভাইজান! আমরা সবাই ঈমানের ছাত্র। আজ এক সপ্তাহ যাবত এই হলে ঈমানের পরীক্ষা দিতে চলছি। হলে ঢোকানোর পূর্বেই হায়েনারা আমাদের **পবিত্র** দাড়ি মুণ্ডন করে দিয়েছে। খুলে নিয়েছে সুন্নতি

পোশাক, পড়িয়ে দিয়েছে লেংটি। আবার কাউকে পড়িয়েছে হাফপ্যান্ট। এতটুকু বলতে না বলতেই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।”

হারুনী আরো জানতে চাইলেন, এ ক'দিনে তারা কি ধরনের খাবার দিয়েছে?

উত্তরে একজন বললেন, দৈনিক কয়েক টুকরা রুটি আর শূকরের গোস্ত। আর পানির বদলে দিয়েছে মদ।

এতটুকু বলতে না বলতে লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠলেন।

সকলেরই অনাহার-অর্ধাহারে শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চক্ষুদ্বয় কোঠরাগত। বন্দীদের মধ্যে মাওলানা ইসমাঈল কারাভী ছিলেন প্রবীণ আলেম। বয়স ষাট-এর কোঠায়। তিনি ছিলেন কারাভী শহরের জামে মসজিদের খতিব ও প্রাচীন বিদ্যাপীঠ মাদ্রাসায়ে খোদাদাদের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস। হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা এসে ভীড় জমাত তার কাছে। জটিল জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য জনসাধারণ থেকে নিয়ে আমীর-ওমারাগণও ছুটে আসতেন দূরদূরান্ত থেকে। সেকালে ফকীহুল উম্মাহ্ বলতে একমাত্র তাঁকেই বুঝাত। আর অন্যান্য বন্দীরা কেউ কোন মাদ্রাসার শিক্ষক বা কোন মসজিদের ইমাম।

আল্লামা ইসমাঈল কারাভী বললেন, এ বন্দিজীবন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত উপঢৌকন। এটা আমাদের কর্মফল। আমরা কুরআন-হাদীস অধ্যায়ন করেছি এবং চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবত অধ্যাপনায় নিয়োজিত রয়েছি। কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল মাগাজী পড়িয়েছি। কিন্ত কোনদিন নিজে জিহাদ করা তো দূরের কথা, মনে জিহাদের কল্পনাও করিনি। নবী-রসূলগণ ছাহাবীদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং জিহাদে পাঠিয়েছেন। নিজেরাও বহু যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। আর আমরা ছাত্রদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করিনি। তাই আল্লাহ্পাক শাস্তিস্বরূপ আমদেরকে দান করেছেন লানত।

তিনি আরো বললেন, আনোয়ার পাশা জিহাদের দাওয়াত নিয়ে আমাদের পিছনে পিছনে পাগলের মত ছুটাছুটি করেছেন, ফতোয়া চেয়েছেন। তখন আমরা পাত্তা দেইনি। তার আহ্বানে সাড়া দেইনি।

বরং জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে সরলমনা মুসলমানদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছি। বলসেভিকদের পক্ষে উকালতি করেছি।

তিনি আরো বললেন, আনোয়ার পাশার সেদিনের কথাগুলো আজও ভুলতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন, 'হুজুর! আপনাদেরকে মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকা থেকে টেনে এনে ময়দানে নামাতে চাই না। আপনাদের নিকট থেকে শুধু এতটুকু সাহায্য চাই যে, আপনারা মিম্বরে মিম্বরে, সভা-সমিতিতে, মিটিং-সেমিনারে জিহাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও ফাজায়েল সম্পর্কে একটু আলোচনা করুন। যুবসমাজকে একটু উৎসাহিত করুন। শাহাদাতের ফজিলত আর মুজাহিদের মর্যাদা উম্মতকে বলে দিন; আর্থিক সহযোগিতা সম্ভব হলে করুন আর না করুন, আপনাদের থেকে শুধু এতটুকু আশা করি।'

তিনি বলেন, "জিহাদ ঈমানের অংশ কিতাবে পড়েছি। তা সত্ত্বেও আমরা জিহাদের বিরোধিতা করে ঈমান হারিয়েছি। আনোয়ার পাশার কথাগুলো আজো আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা ভেবেছিলাম, তালিম ও দাওয়াতের মাধ্যমে মুক্তি পাব। ভেবেছিলাম, খতমে ইউনুস, খতমে খাজেগান, খতমে আম্বিয়া ও দোয়ার মাধ্যমে নাজাত পাব। আজ তার উল্টোটা হয়েছে। আর হবেই না বা কেন। কাফেদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নবী তো জিহাদ ছাড়া অন্য কোন আমল করেননি। ধনী-গরীবের মালিক আল্লাহ, তা জেনেও ধনী-গরীব এক সমান করার কুফ্‌রী শ্লোগানে আমরা অংশ নিয়েছি। আজ তার বীভৎস চেহারা নিজ চোখে দেখছি। এখন ভয় হচ্ছে যে, এ অন্ধকার কারা কক্ষে ওদের পিটুনি খেয়ে প্রাণ হারালে শহীদ হব কিনা, শহীদের মর্যাদা পাব কিনা।"

কথাগুলো হারুনীর অন্তরে শেলের মত আঘাত হানছিল।

[এগার]

মিস্টার কলিনের মৃত্যুর সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে দেশব্যাপী। সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল পার্শ্ববর্তী দেশসমূহেও। এত কঠোর নিরাপত্তার মধ্যদিয়েও কলিনের প্রাণ সংহার করেছে মুজাহিদরা! এটা মামুলী বা সাধারণ ঘটনা নয়। তাই

দেশজুড়ে অশান্তির ঝঞ্ঝা-বায়ু বইতে লাগল। সবাই অজানা এক আতঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হল।

আমার আশ্রয়দাতা কৃষক পাক্কা ঈমানদার মানুষ। নাম তার হারেছ মিকাইলী। মিকাইলী নামেই তিনি পরিচিত। তিনি ছিলেন দানবীর। তার জীবনের অর্জিত সম্পদের সিংহভাগ দান করে দিয়েছেন মুজাহিদ ফান্ডে। তার এহছান নেই, এমন কোন পরিবার অত্র এলাকায় খুঁজে বের করা মুশকিল। কয়েক গ্রামজুড়ে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে। তিনি দু'-সন্তানের জনক। এক ছেলের নাম মাহমুদ। ১৪ বৎসর বয়সেই মাহমুদ আনোয়ার পাশার মুজাহিদ বাহিনীতে অংশ নেয়। এক বৎসর জিহাদ করার পর শাহাদাতবরণ করে। ক্রিনোপল পাহাড়ের পাদদেশে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। কবরের আশেপাশ সুঘ্রাণে ভরা। এটি জিয়ারতগাহে পরিণত করা হয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে ভীড় জমায় এখানে। তাই কবরকে কেন্দ্র করে এখানে ছোট একটি মাজার ও একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

মাহমুদের ছোট বোন মাহমুদা। বয়স ১১/১২ বৎসর। কৈশোর পেরিয়ে সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে। শহীদ ভাইটির কথা তার স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে প্রায়ই। ব্যাকুল হয় তার মন। আজ কতদিন হল ভাইটি শাহাদাতবরণ করেছে। কিন্তু আজও ভাইটির জন্য আঁখিযুগল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ঝরে। ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসে চাপা দীর্ঘশ্বাস। পিতা-মাতা যদিও মাহমুদের বেদনা অনেকটা সহ্য করে নিয়েছেন, তবুও মাঝেমধ্যে নির্জনে কেঁদে কেঁদে খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেন। মাহমুদা ভাইয়ের শাহাদাতের খবর পেয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, জীবনের বিনিময়ে হলেও ভাইয়ের হত্যাকারীদের প্রতিশোধ সে নেবে। লাল ফৌজদেরকে হত্যা করে অন্তরের জ্বালা মেটাবে। ভাইয়ের চিন্তায় সোনার দেহ জ্বলেপুড়ে ছাই হতে চলেছে তার। কিভাবে তার এ আশা পূরণ হবে, তা নিয়েই ভাবে সারাক্ষণ।

হারেছ মিকাইলী হেফাজতের জন্য আমাকে অন্দর বাটিতে আশ্রয় দিলেন। আমি যেন কোনক্রমেই বহির্বাটিতে বের না হই,

সেজন্য খুব শক্তভাবে নিষেধ করেছেন। তাই আমি অন্দর বাটিতেই সময় অতিবাহিত করছি। আমার দেখাশোনার দায়িত্ব মাহমুদার নিকট ন্যাস্ত করেছেন হারেছ মিকাইলী। আমার অজু-গোসল, খানাপিনা আঞ্জামের ব্যবস্থা মাহমুদাই করে থাকে।

মিস্টার কলিন ও তার দেহরক্ষীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে সারা এলাকায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে। রাস্তায়-রাস্তায়, মোড়ে-মোড়ে, হাটে-বাজারে, ক্ষুধার্ত কুকুরের ন্যায় বলসেভিকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন অপরিচিত লোক পেলেই তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আবার কখনো কখনো হত্যা করে লাশগুলো রাস্তার পার্শ্বে ফেলে রাখে। টু-শব্দটি করার মত সাধ্য কারো নেই।

হারেছ মিকাইলীর গৃহে আমার দু'দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। মাহমুদা প্রায় সময়ই আমার প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত। প্রথম প্রথম ওড়নাঞ্চলে মুখমন্ডল আবৃত করে লজ্জায় নতশীরে আমার নিকট আসত। ঘন্টা কয়েক আনাগোনার পর একটু একটু বুলি ফুটে উঠছে তার মুখে। বেচারী খুবই বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির। চেহারা ছায়েমার মত না হলেও বেশ সুন্দরী। বয়সে ছায়েমার চেয়ে অনেক কম, সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে। প্রেমিকের মন সহজেই কেড়ে নেয়ার কৌশল তার মাঝে বিদ্যমান। কোন প্রেমিক অত সহজে ছুটে আসতে পারবে না মাহমুদার নিকট থেকে। কোকড়ানো কৃষ্ণ কেশদাম কটিদেশ পেরিয়ে নীচে দোল খায়। গ্রীবা নেড়ে নেড়ে মুচকি হাসি ফুটিয়ে খুবই মিষ্টি করে কথা বলতে পারে। সে খুবই অভিমানী। কিছু হতে না হতেই তার অভিমান চলতে থাকে অবিরাম। আর এটা যেন আরো মনোমুগ্ধকর ও লোভনীয়। মাহমুদা প্রায়ই আমার নিকটে এসে নানা ধরনের প্রশ্ন করে বিরক্ত করত। আমি যখন চিন্তার মহা-প্লাবনে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে বেড়াতাম, তখন মাহমুদা আমার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে নানা কথায় আমার মন-মানসিকতাকে ঘুরিয়ে দিত অন্য এক জগতে। ওর সামনে কিছুতেই চিন্তামগ্ন থাকা সম্ভব হত না।

হারেছ মিকাইলী অধিকাংশ সময়ই বাড়ীর বাইরে কাটান। জমি-জিরাত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনা ছাড়াও সামাজিক আচার-

অনুষ্ঠানে তাকে সময় দিতে হয়। তাই বেশীরভাগ সময় মাহমুদাই আমার দেখাশোনা করে। চিন্তা ও পেরেশানীর জগতে মাহমুদাকে কাছে না পেলে হয়ত দীর্ঘদিনের জন্য আমাকে কোন মানসিক হাসপাতালে থাকতে হত।

মাঝে-মধ্যে মাহমুদা এমন কিছু প্রশ্ন করে, যা ভাবতেও অবাক লাগে। সে আমাকে প্রশ্ন করল, "খোবায়েব ভাইয়া! বলসেভিকরা মুজাহিদদেরকে পাইকারি হারে হত্যা করে চলেছে। তাছাড়া বন্দি করে তাদের উপর অসহনীয় ও অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। তারপরও মুজাহিদরা আত্মসমর্পণ বা অস্ত্রসমর্পণ করছে না কেন?"

উত্তরে আমি বললাম, শোন মাহমুদা, আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদের পথ প্রদর্শন করেন না।' (সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ৫১)।

আল্লাহ পাকের এ বাণীতে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, ইহুদী-খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখা, বশ্যতা স্বীকার করা বা কাপুরুষের মত অস্ত্রসমর্পণ করা কোনটাই জায়েজ নয়। তাই মুজাহিদরা বাতিলের সম্মুখে কখনো মাথানত করতে জানে না। তাছাড়া জিহাদ পরিত্যাগ করার অর্থ হল, গোটা উম্মতকে আযাবের পারাবারে নিক্ষেপ করা।

এবার শোন, মহানবী (সাঃ)-এর হুশিয়ার বাণী, 'যে জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপক আযাব প্রেরণ করবেন।' (তাবরানী)।

যে ব্যক্তি নিজ হাতে জিহাদ করবে না বা (অন্তত না যেতে পারলে) অন্য একজন মুজাহিদকে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করে জিহাদে পাঠানো বা অন্তত একজন মুজাহিদের পরিবারবর্গের দেখাশোনা বা তার প্রয়োজন আমানতদারীর সাথে আদায় করবে না, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বেই এক প্রকার ভীষণ আযাবের মধ্যে জড়িয়ে দিবেন।' (আবু দাউদ)।

উক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যেভাবেই হোক জিহাদের কাজ করতেই হবে। চাই জান দ্বারা হোক, চাই মাল দ্বারা

হোক বা জিহাদের যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, জিহাদ করতেই হবে।"

মাহমুদা আবার আমাকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা ভাইজান! বুঝা যাচ্ছে, জিহাদ খুবই জরুরী বিষয়। কিন্তু অনেকেই তো জিহাদ করে না! তাদের কী হবে?"

উত্তরে আমি বললাম, জিহাদ নামায-রোযার মতই একটি ফরয এবাদত। তা আদায় না করলে অবশ্যই গুনাহগার হবে। তাছাড়া অনেকেই জিহাদের গুরুত্ব বা ফযীলত জানে না। যদি জানত, তবে কেউ ঘরে বসে বসে নির্যাতন ভোগ করত না। শোন মাহমুদা, মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী, 'আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল সেই ব্যক্তি, যে অশ্বের পৃষ্ঠদেশে সওয়ার থাকে এবং অনেক ভয় দেখানো সত্ত্বেও ইসলামের শত্রুদেরকে সদা-সর্বদা সর্বত্র ভীত-বিহ্বল ও বিব্রত করে রাখে।' (বায়হাকী)।

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন, 'আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের ময়দানে) এক সকাল বা এক বিকাল ব্যয় করা সারা দুনিয়া বা দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।' (বুখারী)।

অপর এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, 'বিকেলে যদি কেউ ঘর থেকে জিহাদের নিয়তে বের হয়, তবে সূর্যাস্তের সাথে সাথে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।' (তিবরানী)।"

আমার মুখ থেকে মহনবী (সঃ)-এর পবিত্র হাদীস শ্রবণ করে মাহমুদা উচ্চ আওয়াজে বলে উঠল, "সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্! জিহাদের এত ফযীলত থাকতে কেন মানুষ কাপুরুষতার পরিচ্ছদ পরিধান করে কুনো ব্যাঙের মত বা বধূবেশে গৃহাভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে? কেন তারা বের হচ্ছে না আল্লাহর রাস্তায়!"

অতঃপর কিছু সময় নতশীরে ভাবতে থাকে মাহমুদা। তার পর মস্তক উত্তোলন করে ওড়নাঞ্চলে আঁখি যুগলের অশ্রু মুছতে মুছতে বলল, "খোবায়েব ভাইয়া! আমার একমাত্র বড় ভাই মাহমুদ মিকাইলী ১৪ বৎসর বয়সে আনোয়ার পাশার দলে যোগদান করে যুদ্ধ করে করে শাহাদাতবরণ করেছে। তার মর্যাদা আল্লাহর কাছে কতটুকু তা বলবেন কি?"

আমি তার কচি হৃদয়ে খানিকটা সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললাম,

"হ্যাঁ, অবশ্যই বলব। তোমাকে শোনাব মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী ও তার পিয়ারা হাবীবের হাদীস। আল্লাহপাক তার কালামে এরশাদ করেন, 'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।' (সূরা বাকারা ঃ আয়াত-১৫৪)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেন, 'শহীদ ব্যক্তি তার এতটুকু কষ্ট অনুভব করে, যতটুকু তোমরা কেউ পিপঁড়ার কামড়ের ব্যথা অনুভব কর।' (তিরমিযী, নাসায়ী)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেন, 'যে মুসলমান জিহাদের কোন চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, সে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তার মধ্যে এক প্রকার অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হবে।' (তিরমিযী, ইবনে মাযা)।

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন, 'দুটি ফোঁটা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়; আল্লাহর ভয়ে নির্গত এক ফোঁটা অশ্রু এবং এক ফোঁটা রক্ত, যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে নির্গত হয়। আর একটি দাগ যা ফরয নামায আদায় করতে গিয়ে কপালে সৃষ্টি হয়।' (তিরমিযী)।

অপর এক হাদীসে নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেন, 'সমস্ত দুনিয়ার রাজত্ব অপেক্ষা জিহাদ করে শহীদ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।' (আহমদ)।"

মাহমুদা হাদীসগুলো শ্রবণ করে হৃদয়ের গভীর থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস নির্গত করে বলল, "আহ! এমনটি যদি হত আমার ভাগ্যে! অমন করে শহীদ হয়ে যদি আমি চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে যেতে পারতাম। আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে শহীদ হওয়ার তাওফীক দান কর। তোমার পথে আমাকে টুকরো টুকরো হওয়ার তাওফীক দাও।"

মাহমুদার প্রার্থনা শুনে আমি বললাম, "ওহে পাগলিনী! তোমার মতই তো আল্লাহর প্রিয় হাবীব দোয়া করেছিলেন, 'সেই মহাসত্ত্বার কসম, যার কুদরতী হাতে আমার জীবন। আমি কামনা করি যে, আমি জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই আবার আমাকে জিন্দা করা হোক। আবার আমি শহীদ হয়ে যাই, আবার আমাকে জিন্দা করা হোক।'

এমনিভাবে দশবার প্রার্থনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ! নবী হওয়া সত্ত্বেও মহনবী (সাঃ) শহীদ হওয়ার মর্যাদা পাওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে দোয়া করেছেন।"

তারপর আরো দু'টা হাদীস তাকে শোনালাম। 'যে ব্যক্তি খাঁটি নিয়তে শাহাদাতের দোয়া করবে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন, যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের আঘাতে মারা না যায়।'

মহানবী আরো বলেন, 'শহীদের বংশের সত্তুরজন জাহান্নামীকে অর্থাৎ যারা হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়ে যাবে; এমন ৭০ জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবে।' (আবু দাউদ)

এসব হাদীস শুনে মাহমুদা মিকাইলী জিহাদ করে শহীদ হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অতঃপর আমাকে বলল, "ভাইজান! আপনি কি আমাকে নেবেন জিহাদের ময়দানে? আপনি কি আমায় ফেলে রেখে চলে যাবেন সমরাঙ্গনে? আপনার কি একটুও দয়া লাগবে না এ বোনটির জন্য? আপনি কি আমাকে শহীদ হওয়ার জন্য একটুও সাহায্য করবেন না? তাই যদি হয়, তবে আমি কাঁদব, কেঁদে কেঁদে জীবন শেষ করে দেব।"

এই বলে মাহমুদা মিকাইলী অনিমেষ নয়নে, বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি একটু আড় চোখে তার দিকে তাকালে মনে হল, যেন তার ধমনীর চঞ্চল রুধির ধারা আরো চঞ্চল উদ্দমে হৃদপিন্ড শতধা বিদীর্ণ করে চলেছে। অস্থিরতার ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত হয়ে যেন সুন্দরীকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে গহীন অরণ্যে। হরিণী যেমন প্রসব বেদনায় অস্থিরতার মহাপ্লাবনে প্লাবিত হয়ে ছটফট করতে থাকে, তার অবস্থাও এমনই মনে হচ্ছে।

রাতের প্রথম প্রহর বিদায় নেয়ার পালা। ব্যবসার ঝামেলা শেষ করে বাড়ী ফিরেন হারেছ মিকাইলী। মাহমুদা দ্রুতপদে এক বদনা পানি এনে পিতার সামনে হাজির করে। হারেছ মিকাইলী অজু শেষ করে সোজা চলে এলেন আমার রুমে। বড় কেদারায় বসে মাথা চুলকাতে চুলকাতে মাহমুদাকে ডেকে বললেন, "আমাদের জন্য দু'-কাপ চা এনে দেরে মা।"

মাহমুদা সাথে সাথে দৌড়ে রান্নাঘর থেকে দু'-কাপ চা এনে দিল। হারেছ মিকাইলী চা পান করতে করতে বললেন, "মুসাফির! আমি অনেক মুজাহিদকে সরঞ্জাম ক্রয় করে দিয়েছি। আবার ছোট একটা অস্ত্রের চালান চীন থেকে এনেছিলাম। দুঃখের বিষয়, সেসব অস্ত্র হস্তান্তরের পূবেই এলাকার সব মুজাহিদ ধরা পড়ে যায়। আবার কেউ কেউ জীবন নিয়ে পালিয়েছে। অস্ত্রগুলো কোন গ্রুপের নিকট পৌঁছে দিতে পারিনি। তাই অস্ত্রগুলো খুব সন্তর্পণে নিরাপদ স্থানে রেখে দিয়েছি।"

আমি হারেছে মিকাইলীকে বললাম, "চাচা মিয়া! আজ রাতেই অস্ত্রগুলো নিয়ে আসবেন। এলাকার দু'-চারজন যুবককে যদি প্রশিক্ষণ দিতে পারি, তাহলে সময় সুযোগে ওরা জিহাদ করতে পারবে।

[বার]

বুকাইলীর দিগন্তে যেন শুক্লা দ্বাদশী দ্বিজরাজ্ উকি মেরে উদিত হল। বসুন্ধরায় তিমির চাঁদোয়া চিরে যেন সবিতা রশ্মির উন্মেষ ঘটেছে। কাননে কাননে যেন প্রস্ফুটিত কুসুমের মাতামাতি। শাখে শাখে যেন বিহঙ্গের কুঁজনে পাগল করা রাগিনী। ঘরে ঘরে চলছে ছায়েমার প্রশংসা। বুকাইলীর আকাশে-বাতাসে, জ্বলে-স্থলে, লতায়-পাতায়, অলিতে-গলিতে পথে-প্রান্তে ওঠেছে মুক্তির শ্লোগান। 'সাবীলুনা-সাবীলুনা, আল্-জিহাদ আল-জিহাদ', 'তরীকুনা-তরীকুনা, আল্-জিহাদ আল্-জিহাদ'।

ছায়েমার সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আবাল-বৃদ্ধা-বণিতাদের শিরায় শিরায় প্রতিশোধের অনল প্রবাহ দাউ দাউ করে জ্বলছে। ছায়েমার অশ্বারোহন ও ঘোড়দৌড় দেখে যুবকদের মাঝে প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। একজন ফিল্ড মার্শালের মত দ্রুতগতিতে অশ্ব ছুটিয়ে হারিয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণ পর ধুলা-বালি উড়িয়ে ফিরে আসে তৃষ্ণার আঙ্গিনায়। যেমন মেঘের আড়াল থেকে সবিতার স্নিগ্ধ হাসি।

এবার যুবকরাও ঘোড়া নিয়ে এল ছায়েমার কাছে। বেশ ক'টি ঘোড়া দেখতেও খুব সুন্দর। তাজাও বেশ। ছায়েমার মনে আনন্দ আর ধরে না। এবার যুবকদেরকে আরো উৎসাহ দেয়ার জন্য অনর্গল

শুনিয়ে চলছে নবীর হাদীস। ছায়েমা বলল, ঘোড়া যুদ্ধের জন্য বহু উপকারী। ঘোড়াকে কেন্দ্র করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) অনেক কিছুই বলেছেন– "তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর, শক্তি-সামর্থের মধ্য থেকে ও পালিত ঘোড়া থেকে।" (সূরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬০)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, কাফেরদের সাথে সাধ্যানুযায়ী লড়াইয়ের শক্তি অর্জন করা ফরজ। আবার ময়দানে ঘোড়া খুবই উপকারী। হযরত ছাহাবা কিরাম মহানবী (সাঃ)কে প্রশ্ন করেছেন, শক্তি বলতে কোন শক্তি বোঝায়? জনশক্তি, ব্যালটের শক্তি, শ্লোগানে শক্তি, না অন্য কোন শক্তি? হুজুর (সাঃ) উত্তর দেন, "আলা ইন্নাল কুওয়াতা আর রামী, আলা ইন্নাল কুওয়াতা আর-রামী, আলা ইন্নাল কুওয়াতা আর-রামী।"

হুজুর (সাঃ) নিক্ষেপ করাকে শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। যেমন– তীর, গুলী, গ্রেনেড, রকেট, স্কাট ইত্যাদি নিক্ষেপ করা। আল্লাহর নবী এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হবে না।

সমবেত জনতা অধির আগ্রহে ছায়েমার কথাগুলো শুনছিল। তারপর এক এক করে ঘোড়ার মর্যাদা সংক্রান্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করতে আরম্ভ করল। ছায়েমা বলল–

মহানবী (সাঃ) ঘোড়াকে যতো ভালবাসতেন, অন্য কোন প্রাণীকে ততোটা ভাল বাসতেন না। (তিবরানী)।

(ক) ঘোড়ার কপালের পশমের সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল নিহিত রাখা আছে।

(খ) ঘোড়া তিন প্রকার– সওয়াবের ঘোড়া, আযাবের ঘোড়া, মর্যাদার ঘোড়া।

(গ) রহমতের ঘোড়া, মানুষের ঘোড়া এবং শয়তানের ঘোড়া!

অর্থাৎ, জিহাদের জন্য যে ঘোড়া পালন করা হয়, তা আল্লাহর ঘোড়া। ইজ্জত-আবরু রক্ষার জন্য যে ঘোড়া পালন করা হয়, তা মানুষের ঘোড়া। অহংকার ও প্রতিযোগিতার জন্য যে ঘোড়া পালন করা হয়, তা শয়তানের ঘোড়া।

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন, "জিহাদের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি

ঘোড়া পুষবে, ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াবে, পানি পান করাবে, এমনকি ঘোড়ার মল-মূত্র সাফ করবে, দড়ি ছিঁড়ে কয়েক মাইল দূরে চলে গেলে যে কষ্ট করে ধরে আনবে এবং তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোড়া যে ঘাস-পানি খাবে; সবই তার নেকীর আমলনামায় লেখা হবে এবং মীজানে ওজন করা হবে।"

ছায়েমার জবান থেকে হাদীসগুলো শুনে সকলেই সমস্বরে বলে ওঠল, 'সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ!' সকলের মধ্যেই জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন ও ঘোড়া দৌড়ানো শিক্ষা করার প্রবল আগ্রহ জন্মেছে। সকলেই বলতে লাগল, 'মুসাফির ভাইয়া! এবার আমাদেরকে অশ্ব ছুটানো অবশ্যই শিখাবেন, শিখালে পুরস্কার পাবেন।'

ঃ কী পুরস্কার দেবে তোমরা?

ঃ তা এখন বলব না।

ততক্ষণে প্রচন্ড উত্তাপ বিচ্ছুরিত করে সূর্যটা মাথার উপর দণ্ডায়মান। ঘর্ম প্রবাহিত হয়ে উষ্ণ দেহ প্লাবিত হয়েছে অনেকেরই। দেখলেই মনে হয়, সবাই যেন সরোবরে সন্তরণের কারণে সিক্ত হয়েছে। অনেকেই এসেছে সেই কাক-ডাকা ভোরে। নাস্তা-পানি খাওয়া হয়নি অন্যদিনের মত। ছায়েমার যাদুমাখা বক্তৃতায় কেউ ঘাড় ফেরানোর সময় পায়নি। তাছাড়া যারা ছায়েমার নিকট আসত, তারা অত সহজেই তাকে ত্যাগ করে যেতে পারত না। ছায়েমার সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন ও কথার ফুলঝুড়িতে তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে যায়। ছায়েমার অমীয় বাণী শ্রবণে ক্ষুধার জ্বালা প্রশমিত হয়। সকলের ক্ষুধার্ত চেহারা ও শুস্ক আনন অবলোকন করে ছায়েমা এখনকার মতো বক্তৃতার ইতি টেনে সবাইকে বিদায় জানাল।

ছায়েমা বিশ্রাম নিচ্ছে। ফাহিমা আক্তার তৃষ্ণা তার পার্শ্বে উপবিষ্ট। ছায়েমা ভেবেছিল, সে একটু ঘুমাবে। কিন্তু এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি করছে, ঘুম আসছে না। আজ প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত হতে চলেছে, তোরাব হারুনী এখনো ফিরে আসেননি। ফিরে আসেনি খুবায়েব। হারুনী খুবায়েবের সন্ধান পেয়েছেন কিনা, খোবায়েব আনোয়ার পাশার সন্ধান পেয়েছে কিনা— নানা প্রশ্ন এসে তার মাথায় ভিড় করছে। এতদিন হয়ে গেল এখনও কেউ ফিরে

আসল না। কোন বার্তাও প্রেরণ করছে না। এসব চিন্তায় ছায়েমা অস্থির বেকারার। বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে চোখের তপ্ত অশ্রু ঝরানোর মাধ্যমে। নির্ঝরিনীর মতই বইছে অশ্রুধারা। ছায়েমা অন্তরের মর্মবেদনা ও বিরহ যাতনায় কণ্ঠচিড়ে সুমধুর সুরে গাইছে–

"আয় পিয়ারে দেখতাহু মাই তুনে মুঝকু ভুল গায়া,
তেরি জিকির মেরি দেলমে হরদম জারী রাহ গিয়া॥"

অর্থাৎ- হে প্রিয়! আমি তো দেখছি, তুমি আমাকে ভুলে গেছ। তোমার স্মরণ হরহামেশা আমার হৃদয়ে জাগ্রত রয়েছে।

"আয় পিয়ারে কব দেখেংগে ফের তেরে দিদারকো,
তেরে লিয়ে ভুল গায়া মায় ইয়ে তামাম জাহাঁনকো॥"

অর্থাৎ– হে প্রিয়! তোমার নূরানী চেহারার দর্শন দিয়ে কখন ক্ষুধার্ত চোখের ক্ষুধা নিবারণ করব? তোমার চিন্তায় আমি দুনিয়ার সবকিছুই ভুলে গিয়েছি।

"হাফতে দরিয়া গার বনুসাম তরনা সাওয়াদ জানে মান,
শরবতে দীদারে বায়াদ আজ লব্বে মাহবুবে মান॥"

অর্থাৎ– তোমার বিরহ যাতনায়, তোমার মুখশ্রী দর্শনের তৃষ্ণায় আমার কলিজা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সাত সমুদ্রের সমুদয় পানি পান করলেও আমার তৃষ্ণা নিবারণ হবে না।

"আগার দামান তোরা আজ মান জুদায়ী,
নমি কারদাম খেয়ালে আঁ সেনায়ী॥"

অর্থাৎ– প্রিয়তম আমি যদি জানতাম তুমি আমাকে এমন করে ভুলে যাবে, তবে কোন দিন তোমায় আমি ভালবাসতাম না।

"কুজায়ী আয় আখের মাহবুব কুজায়ী,
যে হালে মান চুনি গাফেল চেরায়ী॥"

অথাৎ– ওগো আমার প্রেমাষ্পদ! আমাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তুমি কোথায় গিয়ে লুকালে? আমাকে এ করুণ অবস্থায় ফেলে রেখে কি করে তুমি এত গাফেল হয়ে রইলে?

"হার তামান্না দিলছে রুখছাত হোগাই,
আবতু আঁজা আবতু খালওয়াত হোগাই॥"

অর্থাৎ– আমার দিলের সমুদয় আশা-আকাংখা অন্তর উজার করে

চলে গিয়েছে! তোমার সাক্ষাতের অভিলাষ ছাড়া আর কোন আকাংখা আমার হৃদয়ে দিলের মধ্যে মজুদ নেই।

"হে আমার হৃদয়ের আলো! হে আমার প্রাণের বন্ধু! তুমি ফিরে এসো আমার হৃদয় মন্দিরে। আমি হৃদয়ের দুয়ার খুলে তোমার অপেক্ষায় দিন-রাত অপেক্ষা করছি। আমি তোমাকে নির্জনে অনেক গল্প কাহিনী শোনাব। আমার হৃদয় মন্দিরে তোমাকে ছাড়া অন্য কারো স্থান হবে না। ফিরে এসো, জলদি ফিরে এসো, হে আমার প্রিয়তম!"

ছায়েমার আবেগাপ্লুত কণ্ঠের করুণ সুর-লহরীতে তৃষ্ণার চোখেও বান ডাকল। অশ্রুধারায় সিক্ত হচ্ছে তার অঞ্জলি। একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়ার সবগুলো ভাষাই যেন হারিয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত চলছে অশ্রু ঝরানোর পর্ব।

বিকাল তিনটা। সূর্যের প্রখরতা ক্রমশই হ্রাস পেতে লাগল। অন্য দিনগুলোর মত আজও এলাকার লোকজন ধেয়ে আসছে। একটু আগে বেশ, কয়েকজন দহলিজে এসে গেছে। ছায়েমা রুমালে চোখ দু'টি মুছে বেরিয়ে এল দহলিজে। সকলেই উচ্চ আওয়াজে সালাম জানাল। ছায়েমা উত্তর দিয়ে কেদারায় বসল।

মাছুমা দাঁড়িয়ে বলল, "মাননীয় সেনাপতি! আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। আজ আপনি ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তাতে বুঝতে পেরেছি সকলের জন্যই ঘোড়দৌড় শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। তাই আমি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি যে, এখনই আমাদেরকে ঘোড়দৌড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। আমরা এই মাঠে পালাক্রমে ঘোড়দৌড় শিক্ষা করব।"

ছায়েমা মাছুমার আবেদন মঞ্জুর করে বলল, "ওহে মুজাহিদ ভাই-বন্ধুরা! তোমাদের মধ্যে যাদের ঘোড়া আছে, তারা যেন ঘোড়া নিয়ে এক্ষুণি এখানে চলে আসে।" কেউ কেউ আগেই ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। যারা আনেনি, তারা ছুটে গেল ঘোড়া আনতে। অল্প সময়ের মধ্যে তারাও ঘোড়া নিয়ে হাজির হল। ছায়েমা গণনা করে দেখল, দশটি ঘোড়া যোগাড় হয়েছে। অতঃপর দশ দশজনের গ্রুপ রচনা করা হল। এক এক গ্রুপকে ১১ চক্কর করে দৌড়াতে বলা হল। ঘোড়া ছুটছে খট্ খট্ খট্ খট্। কার আগে কে

যাবে, চলছে বিরাট প্রতিযোগিতা। কেউ হারতে রাজী নয়। দ্রুতবেগে চলছে যার যার ঘোটক। ১১ চক্কর দিয়ে প্রথম গ্রুপ অবতরণ করল ২য় গ্রুপের পালা শুরু হল। এভাবে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত চলল অনুশীলন। মাছুমাও এতে পিছিয়ে নেই। মাছুমার ঘোড়দৌঁড় দেখে ছায়েমা খুবই খুশি হল।

সকাল-বিকাল চলছে অশ্বারোহীদের প্রশিক্ষণ প্রতিযোগিতা। কয়েক দিনেই যুবক-যুবতীরা ঘোড়দৌঁড়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হল। তবে কেউ ছায়েমার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। কেননা, ছায়েমা ঘোড়াকে নতুন করে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যেমন– লামপী, কদম, সাধারণ দৌঁড়, ডানে-বামে-পাশ্চাতে হঠাৎ কিভাবে ঘুরাতে হয়, যুদ্ধবিমান আক্রমণে আসলে চার পা উপরে উঠিয়ে নির্জীব বা জড় পদার্থের মত কিভাবে থাকতে হয়, দুশমনের এলাকায় প্রবেশ করলে অশ্বের খুরধ্বনিতে দুশমন সর্তক হয়ে যায়, তাই কিভাবে দুশমনের এলাকায় পদশব্দবিহীন প্রবেশ করতে হয়– এসব প্রশিক্ষণ খুব ভালভাবে রপ্ত করেছে।

ঘোড়া আল্লাহপাকের এমন একটি সৃষ্টি, যার প্রশংসা করে শেষ করা সম্ভব নয়। এত বুঝ, এত বুদ্ধি, এত প্রভূভক্তি অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। মনে হয় আল্লাহপাক ঘোড়াকে শুধু যুদ্ধের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। লড়াইয়ের ময়দানে ঘোড়ার চেয়ে আপন অন্য কেউ হয় না। নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রভূকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। এত অনুগত প্রাণী দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না।

বুকাইলীর জনগণের মুখে মুখে অনুরণিত হতে লাগল অশ্বারোহীদের প্রশিক্ষণের কথা। এমনকি দু'-একজন মুনাফিকও এতে অংশ নিয়েছে। তাদের কিছু কার্যকলাপে বিষয়টা ধরতে পেরেছে ছায়েমা। ছায়েমা মুনাফিক ধরার জন্য দু'জন বিচক্ষণ যুবককে দায়িত্ব দিয়েছিল। তারা নিয়মিত ওদের গতিবিধি নজরে রাখতে লাগল। মাত্র দু'-এক দিনের মধ্যেই সন্দেহভাজন দু'জন মুনাফিক ধরা পড়ে গেল।

ছায়েমার গুপ্তচর আরিফ পিতার জন্য ঔষধ আনতে বাজারে গেল। গভীর রাত। দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

হাসপাতাল সংলগ্ন কয়েকটি ঔষধের দোকান এখনো খোলা। হয়ত একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। আরিফ ঔষধ খুঁজতে খুঁজতে একটি ফার্মেসীতে ঢুকল। ফার্মেসীর সাথেই ছিল বলসেভিকদের আঞ্চলিক অফিস। এখানে বসেই ওরা বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। আরিফ যখন ফার্মেসীতে ঢুকতে গেল, তখন দুই মুনাফিককে উক্ত অফিস থেকে বের হতে দেখে সন্দেহ করেছে যে, ওরা নিশ্চয়ই কোন কুমতলব নিয়ে এসেছে। এর একটা তথ্য উদ্ধার করা খুবই জরুরী। আরিফ ঔষধ ক্রয় করে আস্তে আস্তে বলসেভিক ও সোর্সদের অফিসে ঢুকল। তখন অফিসারগণ মদ্যপানে লিপ্ত। আরিফ অভিবাদনপূর্বক বলতে লাগল–

"স্যার! আমি বুকাইলী থেকে এসেছি। কিছু সংবাদ জানতে আর কিছু সংবাদ দিতে। যদি অনুমতি হয়, তবে বলতে পারি।"

বলসেভিক সোর্সের প্রধান মাথা উত্তোলন করে জিজ্ঞেসা করলেন, "কি বলতে চাও বল।"

আরিফ বলল, "স্যার! আমাদের গ্রামে মুজাহিদদের দু'জন গুপ্তচর রয়েছে। এরা আনোয়ার পাশার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। ওরা বেশভূষায় দেখায় কমিউনিষ্ট। আর মুজাহিদদের সাথে রয়েছে গোপন আঁতাত। আপনাদের সাথে মিশে খবর নিয়ে মুজাহিদদের নিকট পৌছায়।"

এতটুকু বলতে না বলতে অফিসার বলল, "হ্যাঁ দুইজন লোক তো প্রায়ই আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করে। আমি তো জানতাম ওরা আমাদের হয়ে কাজ করছে। একটু আগেও তো ওরা বলে গেল, বুকাইলীতে ঘোড়ার প্রশিক্ষণ হচ্ছে। এ ব্যাপারে তুমি কি জান বল।"

আরিফ উত্তরে বলল, "স্যার! মাত্র ক'দিন আগে আমাদের গ্রামে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা হয়ত আপনারা জেনে থাকবেন। ওরাই ভুয়া এক খবর দিয়ে পুলিশ নিয়েছিল। তারপর যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ওরাই সুকৌশলে বোমা ফাটিয়ে ২৮ জন পুলিশসহ দশ-বারজন সাধারণের মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। জানি না আবার কোন্ কাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছে।

স্যার! জীবনের ভয়ে কিছুই বলতে পারি না, আবার সইতেও পারি না। আমাদের গ্রামের কয়েকজন যুবক প্রায়ই ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছে। ওরা ঘোড়দৌড়ে খুবই পারদর্শী। ঘৌড়দৌড়ে কয়েকবার পুরস্কারও এনেছে। এটা নতুন কিছু নয়, আগে থেকেই ওরা ঘোড়া দৌঁড়ায়। যে কোন দিন সকাল অথবা বিকালে গেলেই তা নিজ চোখে দেখতে পারবেন। আমার কথা হল, আপনারা গুপ্তচর পাঠিয়ে আসল তথ্য সংগ্রহ করুন, তারপর যে কোন পদক্ষেপ নিন। এতে গ্রামবাসীরও যথেষ্ট সাড়া পাবেন।"

অফিসার আরিফের কথা শুনে বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, তাই করা হবে। গোয়েন্দা পাঠিয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে। শালাদের কারসাজি আর মুনাফিকির সাজা হাতে-নাতে দেয়া হবে। তুমি যাও, মাঝেমধ্যে এস।"

আরিফ বলল, "স্যার! আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার জানের ভয় আছে। আপনারা ঐ দু'জন থেকে সর্তক থাকবেন।"

এই বলে আরিফ বাড়ির পথ ধরল।

রাত প্রায় ১২টা। নিঝুম রাত। রাস্তায় জনমানবের চিহ্নটুকু নেই। আঁধারে ছেয়ে আছে চারদিক। আরিফ সমস্ত ভয়-ভীতি ত্যাগ করে, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে আস্তে আস্তে নিজ আলয়ের দিকে হাঁটতে লাগল।

[তের]

আরিফ বাজার থেকে ফেরার পথে তোরাব হারুনীর বাড়ী উঠল। তখন রাত প্রায় দু'টা। ছায়েমার চোখে এখনো ঘুম আসেনি। জবাই করা কবুতরের ন্যায় বিরহ যাতনায় ছটফট করছে মেয়েটা। খোবায়েবের বিরহে সে অস্থির। শুয়ে শুয়ে ভাবছে, হায় হতভাগা খোবায়েব! এখনো তো ফিরে এলে না। বেচারা এখনো কি বেঁচে আছে, না দুশমনের হাতে ধরা পড়ে গেছে। না তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে জিন্দাখানায়। তাহলে কি আর দেখা পাব না তার?

আরো কত রাজ্যের চিন্তা ছায়েমার মাথায়। বিরহিনীর চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ কোনকিছুর শব্দ পেলেই খোবায়েব খোবায়েব বলে

ডেকে উঠে। ভাবে, এই বুঝি খোবায়েব আসছে। বাতায়ন খুলে এদিক-ওদিক দৃষ্টি বুলিয়ে আবার নীরব হয়ে যায় ছায়েমা।

আরিফ আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতরে ঢুকেছে। কিন্তু ছায়েমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ছায়েমার শুধু চোখ দু'টিই জাগ্রত নয়, কর্ণ দু'টিও জাগ্রত। পায়ের সামান্যতম শব্দ পেলেই খোবায়েব খোবায়েব বলে ডেকে উঠল। আরিফ আস্তে করে বলল, "না ভাইয়া! আমি আরিফ। আপনার কাছে খুব জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছি। খুবই জরুরী কথা।"

আরিফের কণ্ঠ ছায়েমার কাছে খুবই পরিচিত, তাই চিনতে কষ্ট হয়নি। ছায়েমা প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিলে আরিফ ঘরে প্রবেশ করে এক এক করে সব কথা খুলে বলল। ছায়েমা বলল, "সাবধান! একথা যেন আর কেউ না জানে! এখন থেকে বিলকুল খামুশ হয়ে যাও।"

সে আরো বলল, "আগামীকাল খুব ভোরে জুবায়েরকে নিয়ে সব সাথীর কানে কানে বলে দেবে, ওরা যেন বিভ্রান্ত না হয়। আমি আগামী কাল জিহাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখব। এটাও একটা কৌশল।"

এতটুকু বলে আরিফকে বিদায় দিয়ে ছায়েমা শয্যা গ্রহণ করল।

আরিফ রাতেই ছায়েমার নির্বাচিত অপর গোয়েন্দা জুবায়েরকে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে গেল। পরদিন ভোরে সবাই সংবাদ পেয়ে গেল। সাথীরা অন্যদিনের মত সকাল সকাল হারুনীর বাড়ীতে এসে হাজির হল। ছায়েমা সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, "হে আমার যুবক ভাইয়েরা! মৌলবাদী বা রুহানীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সারাদেশ জর্জরিত। সারাদেশে চলছে হত্যা আর লুণ্ঠন। বারুদের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই আপনারা এগিয়ে আসুন, আমরা রুহানী ও মুজাহিদদের ধরিয়ে দেই। প্রয়োজনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। এখনো ওরা ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায়। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে আপনারা কে কে জীবন দিতে প্রস্তুত আছেন। আমি তাদের হাত দেখতে চাই।"

সাথে সাথে শত শত লোক হাত উঁচিয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করল। এ অনুষ্ঠানে সরকারী ৩ জন গোয়েন্দাও উপস্থিত ছিল।

ছায়েমা একটি সংকেত আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, আমি যখন কপাল চুলকানীর অভিনয় করব, তখন তোমরা ১০টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একশ' মিটার দূরত্ব নিয়ে গোলাকৃতিতে বসে যাবে। ছায়েমা উক্ত সংকেত করার সাথে সাথে তারা দশটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেল। বাকি ৫জন কিছুই বুঝতে না পেরে নিজ নিজ স্থানে দণ্ডায়মান রইল। এবার সহজেই ধরা পড়েছে এরাই মুনাফিক ও গুপ্তচর। ৫ জনের মধ্যে সরকারী গোয়েন্দা ৩ জন আর স্থানীয় সোর্স ২ জন।

ছায়েমা তাদেরকে ডেকে কাছে এনে মধুর ভাষায় নানা প্রশ্ন করে কিছু জানতে চাইল। ছায়েমার অমায়িক ব্যবহারে ওরা তার ভক্ত হয়ে গেল। ছায়েমা তাদেরকে খুব আপ্যায়ন করল। অতঃপর সবাইকে ঘোড়া দৌঁড়ানোর অনুমতি দিলে সবাই ঘোড়া নিয়ে দৌঁড়াতে লাগল।

গোয়েন্দারাও ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে বিষয়টা দেখছিল। আহ্ কি চমৎকার! তারা ঘোড়া নিয়ে হারিয়ে যায় নিরুদ্দেশে, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুলাবালু মাড়িয়ে ছুটে আসে পাগলা ঘোড়া দাবড়িয়ে। কেউ আসছে, কেউ ছুটছে।

এভাবেই কেটে গেল অর্ধদিবস। তারপর সবাই জমায়েত হল বিশালাকৃতির এক বৃক্ষের তলে। একটু বিশ্রাম না নিয়ে উপায় নেই। কারণ, অজুর ধারায় ঘর্ম নির্গত হচ্ছিল। পরিশ্রান্ত দেহে ক্লান্তিজনিত স্থবিরতা বিরাজ করছে। অপরদিকে সূর্য ধরণী বক্ষে যেন নরক উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। কেউবা ভূষণ খুলে কেউবা ঘর্মসিক্ত অবয়ব মুছে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ছায়েমা অমায়িক ব্যবহার, মিষ্টি কথা ও নানা প্রলোভন দেখিয়েও গুপ্তচরদের থেকে তেমন কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারল না। গোয়েন্দারা একটা জিনিস খুব বেশী লক্ষ্য করেছে। তাহল, যুবকদের ঐক্য ও অশ্বারোহীদের কলাকৌশল। ওরা ভাবছিল, গোটা কাজাকিস্তানে তো এ ধরনের খেলা বা ব্যায়ামের প্রচলন আগে কখনো দেখিনি। এখানে যা কিছু হচ্ছে, তা দেখে মনে হয়, এগুলো

সামরিক প্রশিক্ষণেরই অংশবিশেষ। কোন্ চালিকা শক্তির দ্বারা এ ধরনের হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে হবে।

ছায়েমা চরদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর তাদের মনের ভাব পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে। ছায়েমার চাহনিতে রয়েছে হাজার প্রশ্নের সমাধান। দিবালোকে চরকে হত্যা করলে গোটা এলাকায় বিপদ নেমে আসবে। হিতে হবে বিপরীত। তাই অন্য কৌশল খুঁজতে লাগল ছায়েমা।

ছায়েমার অমায়িক ব্যবহারে গোয়েন্দাদের হৃদয়পটে ভালবাসার বীজ অংকুরিত হল। সকলেই আটকে গেল ভালবাসার ফাঁদে। ছায়েমা ওদেরকে বলল, "আপনারা আরো দু'এক দিন থাকুন, আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

গোয়েন্দারা ছায়েমার প্রতি দুর্বল হয়ে বলল, "আমরা গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি এখানে মুজাহিদ প্রশিক্ষণ হয়। তাই গোয়েন্দা অফিস থেকে তদন্তের জন্য এসেছিলাম। আজ অফিসে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিতে হবে।"

এ কথা শুনে ছায়েমা আরো জোর দিয়ে থাকার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। গোয়েন্দারা তাদের অফিসের ঠিকানা দিয়ে বলল, "যে কোন সময় আপনি আমাদের অফিসে আসবেন।"

এই বলে সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ছায়েমার মনোমুগ্ধকর ব্যবহারে গোয়েন্দারা বলাবলি করতে লাগল যে, "সত্যি যেমন সুদর্শন যুবক, তেমনি অমায়িক ব্যবহার—এমন লোক জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। তবে এদের প্রতি আরো কড়া নজর রাখতে হবে। এদের কর্মকাণ্ড খুবই সন্দেহজনক।

বিকাল দু'টা। সবিতার প্রচণ্ড উত্তাপে বিদগ্ধ ধরণী। পেটে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছে। সবাইকে বিদায় দিয়ে ছায়েমা গোসল করে নামায আদায় করে কায়লুলার নিয়তে শয্যাগ্রহণ করল।

কখন যে তন্দ্রাক্রান্ত হয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে ছায়েমা, তা টেরই পায়নি। বিকাল ৪টা বেজে গেছে। হঠাৎ গগনফাটা চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে বসল ছায়েমা। তৃষ্ণা ওঘর থেকে দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে বোন! অমন করে চিৎকার দিয়ে উঠলে যে?"

ছায়েমা কাতর সুরে বলল, "এক দুঃস্বপ্ন দেখেছি! জানিনা খোবায়েব ভাইয়ার কি অবস্থা? সে বেঁচে আছে কিনা, কে জানে? তাছাড়া দেশের অবস্থা মনে হয় খুব সংকটাপন্ন।"

তৃষ্ণা সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল, "আরে স্বপ্ন তো স্বপ্নই, এতে ভয়ের কি আছে।"

আজেবাজে স্বপ্ন দেখার চোখ ছায়েমার নয়। ছায়েমা যা দেখে অনেক ক্ষেত্রেই তা সঠিক হয়। এ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে নয়, এ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক বাণী।

তৃষ্ণা পুনরায় প্রশ্ন করে, "কি স্বপ্ন দেখেছ বোন বলবে কি?"

"হাঁ বলব। দেখলাম, বাস কাউন্টের দিক থেকে প্রলয় নিনাদে মসিকৃতির ঝঞ্ঝা বায়ু এদিকে ধেঁয়ে আসছে। ঘনঘটায় ছেয়ে যাচ্ছে সারাটি গগন।"

এতটুকু বলতে না বলতেই ছায়েমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে।

বেচারী অনেক কষ্টে কান্না সংবরণ করে বলল, "আমার মনে হয় বড় ধরনের কোন বিপদ আসার রাস্তা খুঁজছে। এ স্বপ্ন তারই সংকেত মাত্র। ইয়া আল্লাহ! বহুবার তুমি আমাদেরকে তোমার খাছ রহমত দ্বারা রক্ষা করেছ। ঠাঁই দিয়েছ তোমার রহমতের কোলে। আশা করি, এবারও তুমি রক্ষা করবে। হে আমার মাওলা! তোমার আশ্রয় ছাড়া তো আর কোন আশ্রয় নেই। একমাত্র তুমিই আমাদের আশ্রয়দাতা। ইয়া আল্লাহ! তোরাব হারুনী ও খোবায়েবকে বিপদ থেকে রক্ষা করে আবার ফিরিয়ে দাও আমাদের মাঝে। ইয়া আল্লাহ! তোমার এই অবলা দাসীকে আর কাঁদিও না। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।"

তৃষ্ণা ছায়েমাকে কিছুই বলার সাহস পেল না। শুধু সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে পলকে পলকে দীর্ঘশ্বাস নির্গত করছে আর গণ্ডদ্বয় অশ্রুসিক্ত করছে। তৃষ্ণা মনে মনে সীমাহীন ভয় পাচ্ছে। কারণ, গোটা পরিবারে ৩ জন অবলা ও অসহায়া নারী ছাড়া আর কেউ নেই। প্রিয়তম স্বামীর বিরহ যাতনায় কলিজা চৌচির। ঘাত-প্রতিঘাতে, চিন্তা আর পেরেশানীতে বক্ষদেশ বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম। বিবাহের

পর থেকে কখনো এত দীর্ঘ সময় একা একা স্বামী ছাড়া কাটায়নি। স্বামীর বাহুবন্ধনে কাটিয়েছে রজনীগুলো। আজ কতদিন হতে চলেছে কেউই ফিরে আসছে না। রাজ্যের চিন্তা এসে তৃষ্ণাকে আহত করে ফিরছে। তাই তৃষ্ণা ওড়নাঞ্চলে মুখমণ্ডল ঢেকে নিজ গৃহে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করল। তারপর মধুর সুরে গাইতে লাগল–

"লাক্‌ড়ি জ্বলকার কয়লা বন্‌তা, কয়লা জ্বলকার রাগহে,

মায় বেচারা এয়ছা, জ্বলতা না কয়লা না রাগহে।"

অর্থাৎ– আগুন কাষ্ঠখন্ডকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে কয়লায় পরিণত করে, আবার কয়লাকে জ্বালিয়ে করে ভস্ম। কিন্তু আমি এমনভাবেই জ্বলছি যে, আমি কয়লাও নই ভস্মও নই।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল। ছায়েমা গাত্রোত্থান করে আছরের নামায আদায় করে অন্যদিনের মত বহির্বাটিতে বেরিয়ে আসল। ইতিমধ্যেই এলাকার লোকজন এসে ভিড় জমাচ্ছিল। ছায়েমা সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, "হে আমর প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাদের ভাগ্যাকাশে ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে। যে কোন সময় নরপিশাচ কমিউনিষ্ট হায়েনারা আমাদের উন্নত শীরে বজ্রাঘাত হানতে পারে। তাই সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে কোন মোকাবেলার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। সাবধান! ঐক্য বিনষ্ট করবেন না। অনৈক্যের কারণে অনেক জনপদ বিরাণ হয়ে গেছে।"

ছায়েমা আরো বলল, "আমি আপনাদেরকে দশটি দলে বিভক্ত করেছি এবং দশজনকে গ্রুপ কমান্ডার নিযুক্ত করেছি। আর একজনকে দিয়েছি পুরো জামাতের জিম্মাদারী। তিনিই আপনাদের আমীর। সবসময় আমীদের নির্দেশ মেনে কাজ করবেন। প্রিয় বন্ধুরা! আজ থেকে এ এলাকাই রণক্ষেত্র মনে করতে হবে। এটাকে নিরাপদ স্থান মনে করা নেহায়েত ভুল হবে।"

ছায়েমা সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তার নির্বাচিত দুই গোয়েন্দা আরিফ ও জুবায়েরকে রেখে অন্যদেরকে বিদায় দিল। মাগরিবের নামায আদায় করে ছায়েমা রেখে দেয়া দু'জনকে নিয়ে পরামর্শে বসল। "বলল প্রিয় বন্ধুরা! আমি তোমাদেরকে গোয়েন্দা রিপোর্ট তৈরী করার দায়িত্ব দিতে চাই। আশা করি সাহসিকতা ও

বিচক্ষণতার সাথে কাজ করবে। তোমাদেরকে কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো রিকশাচালক, কখনো মুচি আবার কখনো ভিক্ষুক সাজতে হবে, তা পারবে কি?"

উভয়ে একসুরে বলে উঠল, "অবশ্যই পারব। দ্বীনের জন্য যখন যা হুকুম দেবেন, তখনই আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্।"

ছায়েমা বেশ কিছুক্ষণ তাদেরকে তালিম দিল। তারপর আরিফকে লক্ষ্য করে বলল, "আরিফ! তুমি আগামীকাল ঐ ঠিকানা মত গোয়েন্দাদের অফিসে যাবে। দেখ ওদের কোন পরিকল্পনা সংগ্রহ করতে পার কিনা।"

আর জুবায়েরকে বলল, "তুমি পুরো শহর ঘুরে ঘুরে দেখবে, ঐসব মুনাফিকরা কোন্ ঘরে ঢুকে, কাদের সাথে আড্ডা দেয় এবং কাদের সাথে বেশী মাখামাখি করে। সব তথ্য সংগ্রহ করে আগামীকাল বিকেলেই আমাকে জানাবে।"

এই বলে ছায়েমা দু'জনকে বিদায় করে দিল।

সারা রাত ছায়েমার চোখে ঘুম নেই। কিভাবে সফল আক্রমণ করা যায় এ নিয়ে মাথা খাটাচ্ছে। অবশেষে স্থির করল, শক্তিশালী একটি পেট্রোল বোম যদি ওদের অফিসে বা আড্ডাখানায় ফাটানো যায়, তবে হয়ত কেউ বাঁচতে পারবে না। এতে খরচও হবে কম। অবশেষে তাই মনঃস্থির করল।

পরদিন খুব ভোরে আরিফ ও জুবায়ের এলো ছায়েমার কাছে। ছায়েমা আরিফকে বলল, "তোমরা কি আমাকে খাঁটি মধু সংগ্রহ করে দিতে পার; আট-দশ কেজি পরিমাণ?"

আরিফ বলল, "চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

তৃষ্ণা শুনে জিজ্ঞাসা করল, "এত মধু দিয়ে কি করবে বোন?"

ছায়েমা বলল, "দরকার আছে, খুব দরকার।"

তৃষ্ণা বলল, "আমার ঘরেই চাক কাটা খাঁটি মধু আছে প্রায় দশ-পনের কেজি।"

বলেই দু'-তিন কেজির একটি কৌটা এনে হাজির করল।

ছায়েমা আরিফকে মধুর কৌটাটি দিয়ে বলল, "এই মধু

গোয়েন্দাদের অফিসে নিয়ে খুব অল্প দামে বিক্রি করার চেষ্টা করবে এবং ওদের পরিকল্পনা জেনে আসবে। জুবায়েরকে পাঠিয়ে দিল পুরো শহর ঘুরে স্থানীয় সোর্সের গতিবিধি লক্ষ্য করতে। আর বলে দিল, মজবুত একটি কন্টেইনারে করে আট কেজি পেট্রোল ও অন্যান্য জিনিসপত্র এবং একই রঙের আরো একটি খালি কন্টেইনার আনতে।

আরিফ মধু নিয়ে গোয়েন্দা অফিসের পার্শ্বে চলে গেল। হাঁক দিল– "মধু রাখবেন... মধু...! এই খাঁটি মধু...।"

এভাবে ডাকতে ডাকতে গোয়েন্দা অফিসের করিডোরে এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে একজন ডাকল, "এই মধু এদিকে আস।"

আরিফ মধু নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, "স্যার চেক করে দেখুন।" বলেই কিছু মধু তার হাতে ঢেলে দিল। লোকটি মধু পান করে খাঁটি মধু বলে মন্তব্য করল। এভাবে ৮/১০ জনের সবাই একটু একটু করে মধু পান করল। দাম জিজ্ঞেস করলে এমন একটি দাম বলল যে, সবাই কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করল।

মধু ছিল মাত্র দুই কেজি। দু'-জনেই দুই কেজি নিয়ে নিল। এরপর অন্যেরা বলল, "বেটা এত অল্প মধু আনলে কেন? আগামী কাল ১৫-২০ কেজি নিয়ে এস।"

আরিফ 'ঠিক আছে আসব' বলে ফিরে আসল।

জুবায়ের শহর প্রদক্ষিণ করতে করতে গোয়েন্দাদের অফিসের সামনে গেল। দেখে এলাকার ৩/৪ জন যুবক অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে। সে পেট্রোল ও অন্যান্য মালামাল ক্রয় করে ফিরে আসল।

ছায়েমা বিভিন্ন প্রশ্ন করে শহর পরিভ্রমণের হালাত জেনে নিল। ছায়েমা জুবায়েরকে রাতে আসার জন্য নির্দেশ দিয়ে বিদায় দিল।

জুবায়ের ও আরিফ সন্ধ্যার সাথে সাথে চলে আসল হারুনীর বাড়িতে। ছায়েমা তাদেরকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে পেট্রোল বোমা বানানোর কলাকৌশল শিক্ষা দিল। ছায়েমা জাফর ভাইয়ের কাছ থেকে পেট্রোল বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। তাই আজ এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। কিভাবে টাইম সিস্টেম করা যায়, তাও শিখিয়ে দিল। তারপর সে আরিফকে বলল,

"তুমি আগামীকাল ১০টার দিকে মধু নিয়ে গোয়েন্দা অফিসে ঢুকে বিক্রি করতে থাকবে।" আর জুবায়েরকে বলল,"তুমি এই পেট্রোল বোমাটি নিয়ে অফিসের পার্শ্বে অপেক্ষা করবে। আরিফ মধু বিক্রি শেষ করে টাকা-পয়সা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তারপর বোমাটি নিয়ে প্রবেশ করে বলবে, স্যার আমার কন্টেইনারটি এক পার্শ্বে রেখে যাচ্ছি, একটু পরে এসে নিয়ে যাব।" এই বলে কন্টেইনারটি রেখে বেরিয়ে আসবে।

এসব তালিম দিয়ে ছায়েমা সবাইকে বিদায় দিল।

ছায়েমা এশার নামায আদার করে কামিয়াবীর জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। সকাল ৮টার দিকে উভয় গোয়েন্দা চলে আসল। ছায়েমা তৃষ্ণা থেকে আরো আট কেজি মধু নিয়ে আরিফকে পাঠিয়ে দিল আর ভিন্ন রাস্তায় বোমা দিয়ে পাঠিয়ে দিল জুবায়েরকে।

সেদিন ছিল গোয়েন্দাদের এক জরুরী বৈঠক। অনেক অফিসার উক্ত মিটিং-এ অংশ নিয়েছে। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরা কাজ করল। ছায়েমা যেভাবে বলেছিল, ঠিক সেভাবেই ওরা বোমা রেখে বেরিয়ে আসার প্রায় ৫ মিনিট পরে বিকট আওয়াজে বোমাটি বিস্ফোরিত হল। অফিস কক্ষটি আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হল। যাবতীয় আসবাবপত্র পুড়ে ভষ্ম হয়ে গেল। অফিসারসহ ২০/২৫ জন আগুনে পুড়ে নিহত হল। ফায়ার সার্ভিস খবর পেয়ে ছুটে আসল মুহূর্তের মধ্যে। তারা আগুন নেভাতে সক্ষম হল বটে; কিন্তু কারো জীবন রক্ষা করতে পারল না।

এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে অনেক সিভিল পুলিশ পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। বিকাল ৫টার দিকে বুকাইলীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম জোযনা থেকে ৫ জন সোর্স ঐ সমস্ত মুনাফিক যারা খবরাখবর পাচার করত, তাদেরকে গুপ্ত পুলিশেরা ধরে এনে বুকাইলীর চৌরাস্তার মধ্যে দিবালোকে শত শত জনতার সামনে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করল। আল্লাহর দয়া আর অনুগ্রহ দেখে ছায়েমা আল্লাহর শোকর আদায় করল।

[চৌদ্দ]

খানেডেরার অলিতে-গলিতে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, দশ-বারজন মুজাহিদকে থানায় আটক করে রাখা হয়েছে। বন্দিদের দেখার জন্য নেমে এল জনতার ঢল। আবাল-বৃদ্ধা-বণিতা কেউ বাদ রইল না। দর্শকদের দেখার সুবিধার্থে তাদেরকে বন্দিশালার অন্ধকার কক্ষ থেকে বের করে করিডোরে নিয়ে আসা হল। করিডোরের চারদিকে মোটা রডের গ্রীল। এ জায়গাটুকুও ময়লা ও উৎকট দুর্গন্ধে ভরা। বন্দিদেরকে দেখে জনতা হাত তালি দিয়ে আনন্দে ফেটে পড়ল। আবার কেউ প্রস্তর খণ্ড কুড়িয়ে গ্রীলের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে মারছে। আঘাতে কুঁকিয়ে উঠছে কয়েদীরা। জনতা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। কেউবা অকথ্য গালির বিষবাষ্প নিক্ষেপ করে আনন্দে খিল খিল করে হাসছে। এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বন্দিদের পাওনা আদায় করতে কৃপণতা করছে না।

প্রথমেই বন্দিদের গায়ের পোশাক খুলে দিগম্বর করে গারদে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারপর দয়াপরবশ হয়ে লেংগুট পরিয়েছিল। কোন কোন সময় করিডোর থেকে নিয়ে আসত উন্মুক্ত মাঠে। হাত-পা বেঁধে সূর্যতাপ দগ্ধ উত্তপ্ত বালির উপর ঘন্টার পর ঘন্টা শুইয়ে রাখত। জনতা আনন্দে কিল-ঘুষি, চড়-থাপ্পড়, লাথি ও চাবুকাঘাতে মনের জ্বালা মিটিয়ে তৃপ্তি পেত। বন্দিদের আর্তচিৎকারে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠত। তবু পাষণ্ড, নির্দয়, নির্মম, নিষ্ঠুর, হিংস্র হায়েনাদের অন্তরে সামান্যতম দয়ার উদ্বেগ হত না।

এভাবে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ভোগ করতে হল খানেডেরার অন্ধকার ঈমানী পরীক্ষাগারে। পুঞ্জিভূত বেদনায় ভারাক্রান্ত অন্তর নিয়ে বিগলিত ভাষায় বন্দিরা আল্লাহর দরবারে কাতর কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল, “হে আল্লাহ্! আমরা জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ ইবাদতকে তরক করে নফসের উপর জুলুম করেছি। তোমার হুকুম লংঘন করে আমরা তোমার অবাধ্য হয়েছি। হে আল্লাহ্! কৃত অপরাধের জন্য আমরা তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই। দয়া করে তুমি এ অসহায় বান্দাদের ক্ষমা কর। আমাদেরকে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার কর। আমরা আর তোমার হুকুম অমান্য

করব না। আমাদেরকে মুক্ত করার অনেক উপায় তোমার কাছে রয়েছে। হে আল্লাহ্! আমরা ঈমানী পরীক্ষার উপযুক্ত নই। বিনা পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ কর। তুমি ছাড়া আমাদেরকে মুক্ত করার আর কেউ নেই।"

দু'আ শেষে ফকীহুল উম্মাহ আল্লামা ইসমাঈল কারাভী সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আমার কয়েদী ভাইয়েরা! মহানবী (সাঃ)-এর অমীয় বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা তালীম-তাবলীগ ও তাযকিয়া করে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব কোন আমলই বাদ দেইনি। তারপরও কেন এ কঠিন আযাবে নিপতিত হলাম? একমাত্র জিহাদের মত ফরয আমলকে ছেড়ে দেয়ার কারণেই নেমে এসেছে এ শাস্তি। মহানবী (সাঃ) তো বলেছিলেন, "জিহাদ পরিত্যাগ করলে দুনিয়াতেই লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেয়া হবে।"

আজ আমরা তা-ই উপভোগ করছি।

বেশ ক'দিন খানেডেরা থানায় ঈমানী পরীক্ষা নেয়ার পর বন্দিদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে একটি মালবাহী ট্রেনের উন্মুক্ত বগিতে তোলা হল কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণের উদ্দেশ্যে। বন্দিরা ভেবেছিল, বগিটি যদি উন্মুক্ত হয়, তবে নড়াচড়াও চলাফেরায় কিছুটা সহজ হবে। এটা ছিল তাদের আনন্দ পাওয়ার একটা ব্যর্থ প্রয়াস। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! তাদের জন্য বরাদ্দ করা হল কাঁটাতারের নির্মিত একটি খাঁচা, যার উচ্চতা মাত্র তিন ফুট। আয়তন খুব কম। গাদাগাদি করেও বসা যায় না, সোজা হয়েও বসা যায় না। একটু নড়াচড়া করলেই মাথা ফুটো করে দেয়। আহ্ কি যে কষ্ট...।

কয়েদীদের নিয়ে ট্রেনটি মন্থরগতিতে আলমাআতার উদ্দেশ্যে ছুটে চলছে। চলতে চলতে যদি কোন একটি স্টেশনের সন্ধান পায়, তবে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে বিশ্রাম নেয়। কত গাড়ী আসে কত গাড়ী যায়; কিন্তু এটা স্পন্দনহীন অবস্থায় শুয়ে থাকে যেন। জ্বালানী সংগ্রহ করতে ও মাল খালাস করতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। কোন কোন সময় বন্দিদের বগীটি কেটে দিয়ে, ইঞ্জিনটি হারিয়ে যায় নিরুদ্দেশে। দু'এক দিন পর ফিরে এসে আবার চলতে শুরু করে।

বন্দিদের খাবারের জন্য দেয়া হয়েছে কয়েক কেজি গমের ছাতু ও দুই বোতল মাদকজাতীয় পানীয়। যখনই তারা ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করত, তখনই দু'-এক মুঠি যব চিবিয়ে পানি পান করে জীবন বাঁচাত। কয়েদীরা জানত না এগুলো মাদক দ্রব্য। জানলে তারা এটা পান করত না। সকলের শরীর ক্ষত-বিক্ষত। কাষ্ঠখণ্ডের মত শুকনো। শক্তিহীন, দুর্বল ও পিড়ীত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ রোদ-বৃষ্টি-কুয়াশা ও ঝঞ্ঝা-বায়ু তাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। অসুস্থতা আর ক্ষুৎপিপাসা তাদের জীবন সাথী।

খানেডেরা থেকে ট্রেনটি মন্থরগতিতে প্রায় ৩ সপ্তাহে একশ' ছাব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে রাজধানী আলমাআতা থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে গারদিয়াজ জংশনে এসে পৌঁছল। গারদিয়াজ তেমন প্রসিদ্ধ শহর না হলেও জংশন হিসাবে মানুষের যাতায়াত একেবারে কম নয়। তিন দিকের লোকজনই এখানে পাওয়া যায়। বন্দিদের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় লোকজন এসে ভীড় জমাল। রেলইঞ্জিন মাত্র কয়েকটি বগী নিয়ে নিরুদ্দেশে হারিয়ে গেছে অনেক আগেই। আবার কখন ফিরে আসবে কেউ বলতে পারে না। দু'-একজন হৃদয়বান ব্যক্তি বন্দিদের দুর্দশা লক্ষ্য করে কিছু রুটি এনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাঁচার উপর ফেলে। বন্দিরা তা টেনে টেনে ভক্ষণ করে। আবার কেউ তিরষ্কারের বিষবাণ নিক্ষেপ করে আনন্দ উপভোগ করে।

খাঁচার ভিতর তিনজন বন্দি প্রাণ হারিয়েছে দু'দিন পূর্বে। ওরা তিনজন যে পাপ-পংকিলময় দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছে, তা প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি। অনেক পরে টের পেয়েছে যে ওরা সর্বশান্ত হয়ে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে বহুদূরে, সফর করেছেন আলমে বরযখে। ওরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না আমাদের মাঝে।

ইসমাঈল কারাভী সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আমার বন্দি ভইয়েরা! আমাদের তিনজন সাথী কাফেরদের অমানুষিক ও অকথ্য নির্যাতনে শহীদ হয়েছে। ওরা যে সত্যিই শহীদ হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, আজ তিন-চার দিন এত গরম থাকার পরও লাশগুলো পঁচেনি, ফাটেনি, গলেনি এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়নি। এমন

তরতাজা লাশ জীবনে কখনো দেখিনি। তাছাড়া লাশ থেকে এত সুন্দর মেশ্ক-আম্বরের সুঘ্রাণ পাওয়ার কল্পনাও করিনি।”

দর্শকদের একজন তোরাব হারুনীর ঘনিষ্ট বন্ধু। সাম্ছ বুকাইলী। একই গ্রামের অধিবাসী। দর্শকদের ভীড় দেখে সাম্ছ এগিয়ে গেল দেখার জন্যে। হঠাৎ দু’-বন্ধুর চার চোখের মিলন ঘটে গেল। একে অপরের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। সাম্ছ বুকাইলী মনে মনে ভাবছিলেন, একে তো দেখতে বন্ধু হারুনীর মত মনে হচ্ছে। আবার ভাবছে, না হারুনী এখানে আসবে কেন। এ হয়ত চোখের ধাঁধাঁ। আবার এও মনে করল, সে তো আজ বেশ ক’দিন হয় বাড়ী থেকে বের হয়েছে। এখনো ফিরে আসেনি। তাহলে কি তাকে বন্দি করেছে কমিউনিস্টরা! কেন বন্দি করবে হারুনীকে? সে তো অনেক ভাল মানুষ। দশগ্রাম খুঁজেও এমন দয়ালু ও ভদ্র মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে না। তিনি যে কত দয়ালু, বিনয়ী ও মহৎ প্রাণের অধিকারী, তা কে না জানে।

সাম্ছ বুকাইলী তার চোখ দু’টি কচলিয়ে আবার ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকাল, তাই তো। এ তো তোরাব হারুনীই। শরীর ক্ষত-বিক্ষত, জীর্ণ-শীর্ণ। হারুনী যদিও সাম্ছকে দেখেছিল, কিন্তু চিনতে পারেনি। কারণ, তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

সাম্ছ বুকাইলী অনেক চিন্তা-ভাবনা করেও বন্দিদের মুক্তির কোন পথ বের করতে না পেরে বাড়ীতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, হারুনীর বন্দি হওয়ার খবর হয়ত তার বাড়ীর লোকেরা জানে না। তাই দ্রুত সংবাদটা পৌছান দরকার।

এসব চিন্তা করে সাম্ছ বুকাইলী দ্রুতগামী বাসে চড়ে দিনের মধ্যেই চলে আসলেন বুকাইলীতে।

তখন বিকাল ৪টা। ছায়েমা দশ-বারজন সাথীকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল। ঠিক এমন মুহূর্তে সাম্ছ বুকাইলী সালাম দিয়ে ছায়েমার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, “মুসাফির ভাই! আপনার আশ্রয়দাতা, অত্র এলাকার সম্মানিত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তোরাব হারুনী গারদিয়াজে বন্দি! তার উপর চালানো হয়েছে অকথ্য ও

অমানুষিক নির্যাতন। দশ-বারজন বন্দির মধ্যে ইতোমধ্যে তিনজন শহীদ হয়েছেন। দু'-একদিনের মধ্যে আরো দু'-চার জন ইহধাম ত্যাগ করতে পারেন। তাদেরকে বন্দি করে আনা হয়েছে খানেডেরা থেকে। পাঠানো হচ্ছে আলমাআতা কেন্দ্রীয় কারাগারে। আহ্ নরপশুরা কত কষ্টই না দিচ্ছে নিরিহ লোকগুলোকে।

সাম্ছের কথা শেষ না হতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ছায়েমা। উপস্থিত জনতার মধ্যেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। বিপদে ধৈর্যহারা হওয়া উচিত নয়; তাই ছায়েমা নিজেকে সংবরণ করে বলল, "আমি জানি এ সংবাদে আপনাদের অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। হঠাৎ বজ্রাঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম। তবু তা মেনে নিতে হবে। দিশেহারা হলে চলবে না। মনোবল দৃঢ় রাখতে হবে। ওদের মুক্তির পথ আমাদেরকেই আবিষ্কার করতে হবে। তাই আসুন, আমরা আবার মরিয়া হয়ে কোমড় বাঁধি, তাদেরকে উদ্ধার করি। আমি এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত জানতে চাই।"

এক বাক্যে সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারপর ছায়েমা সবাইকে সাবধান করে বলল যে, "এ সংবাদ তৃষ্ণার কানে প্রবেশ করার সাথে সাথে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তৃষ্ণার মত এত নরমদিল নারী আর আছে কিনা জানি না। এমন স্বামীপরায়ণ, কোমলমতী, পর্দানশীল নারীর অভাব সবসময় দুনিয়া উপলব্ধি করে আসছে।"

ছায়েমা সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, "ওহে মুজাহিদ বন্ধুরা! একজন মুসলমানের রক্তের দাম সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে অনেক বেশী। মহানবী (সাঃ) বহুবার তা প্রমাণ করেছেন। আপনারা জানেন, হুজুর (সাঃ)-এর দূত মুতা নামক স্থানে রোম সম্রাটের শাসনকর্তা কর্তৃক নিহত হলে তিনি সে রক্তের বদলা নেয়ার জন্য দুই লক্ষ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে তিন হাজার মুজাহিদ প্রেরণ করেন। উক্ত লড়াইয়ে মহানবী (সাঃ)-এর প্রাণপ্রিয় সাহাবী হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ), হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ)সহ বেশ ক'জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন মাত্র একজনের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য। আমরাও

নবীর পদাংক অনুসরণ করে চাই বন্দিদেরকে ছিনিয়ে আনতে। এতে আপনাদের অভিপ্রায় জানতে চাই।"

ছায়েমার কথার সাথে সাথে সবাই হাত উত্তোলন করে সম্মতি জ্ঞাপন করল। যুবকদের সিংহতেজা হিম্মত দেখে ছায়েমা বলল, "তাহলে আজ আমরা বাইয়াত গ্রহণ করে হুদাইবিয়ার মৃত সুন্নতকে আবার জীবিত করতে চাই।"

ছায়েমা সকলকে বর্ষিয়ান এক ব্যক্তির হাতে বাইয়াত নিতে বলল।

তারা বলল, "না, আমরা আপনার হাতেই বাইয়াত নেব।"

ছায়েমা আবার নির্দেশ দিলে সবাই একজন মুরুব্বীর হাতে হাত রেখে বাইয়াত পর্ব সমাধা করল। উক্ত বাইয়াত থেকে মাছুমাও বাদ পড়েনি। বাইয়াত গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দালামী, কবির, দোহা ও মাছুমাকে হারুনীর মুক্তির জন্য নির্বাচন করা হল। ওরা সবাই ছায়েমার সাথে যাবে। নির্বাচিত চারজনই অশ্বারোহী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাই উক্ত চারজনকে রেখে অন্যদেরকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মাগরিবের নামাযের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাই নামাযের বিরতি দিয়ে ছায়েমা বলল, "নামায আদায় করে সবাই আমার কক্ষে চলে আসবে।"

এই বলে ছায়েমা আসন ত্যাগ করে নামায আদায় করতে ভেতরে চলে গেল। অজু করে নামায আদায় করে মেহমানখানায় এসে অপেক্ষা করছে।

একটু পরে সবাই নামায শেষ করে মেহমানখানায় চলে আসল।

[পনের]

ছায়েমা ওদেরকে বদ্ধ ঘরে আরো ভালভাবে কয়েকটি অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে মজবুত করল। তারপর পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলল, "মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তার ধুলা যে ব্যক্তির পদযুগল ধুসরিত হবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।"

তিনি আরো বলেছেন, "জিহাদের ময়দানে যখন কোন মুসলমান

অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়পদ থেকে লড়াই করে, তার গোনাহ্সমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেমন পাকা খর্জুরের কাঁদি থেকে খর্জুর ঝরে পড়তে থাকে।" (তিবরানী)

তিনি আরো বলেন, "তোমরা আমাকে অনুসরণ করে চলবে। জীবন যায় যাক, তবু আমরা পিছপা হব না। যুদ্ধের ময়দানে পৃষ্ঠ প্রর্দশন করা মুমিনের কাজ নয়। একমাত্র মুনাফিকরাই ময়দান থেকে পালায়ন করতে পারে। তাই মহানবী মুনাফিকদের ব্যপারে বলেন, "তলোয়ার সমস্ত গুনাহকে মুছে দিতে পারে, কিন্ত মুনাফিকীর পাপকে মুছে দিতে পারে না।" (আহমদ)

ছায়েমা তোরাব হারুনীর বন্ধু সাম্ছ বুকাইলীর নিকট থেকে গারদিয়াজ স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা পূর্বেই জেনে নিয়েছিল। বুকাইলী থেকে গারদিয়াজের রাস্তা কাঁচা সড়কের প্রায় ৩০ কিলোমিটার। ছায়েমা বেছে নিল কাঁচা রাস্তাটি। কারণ, কাঁচা সড়কে গাড়ী-ঘোড়ার আনাগোনা কম থাকে। আবার অশ্ব চালানো পাকা রাস্তা থেকে কাঁচা রাস্তাই ভাল। তারপর সবাইকে লাল ফৌজের পোশাক পরিয়ে তিন জনকে দিল তিনটি ক্লাশিনকভ, আর দু'জনকে দুটি এসএলআর। নিজে নিল ১টি এসএমজি। অন্য সবাইকে দিল দু'টি করে গ্রেনেড ও প্লাস। তারপর পানীয় খাবার, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিছু ঔষধপত্র, গোলা-বারুদ নিয়ে ৫ জন ৫টি অশ্ব নিয়ে গারদিয়াজের দিকে রওনা হল। রওনা হওয়ার আগে ছায়েমা তৃষ্ণাকে বলল যে, "আজ রাতে আমরা ঘোড়া দৌঁড়াব। রাতে ঘোড়া দৌঁড়ানোর প্রশিক্ষণ পাকাপোক্ত করতে হবে। তাই ঘরে ফিরতে একটু বিলম্ব হবে।"

তৃষ্ণা বলল, "ঘরের অর্গল খোলা থাকবে।"

তৃষ্ণাকে ফাঁকি দিয়ে ছায়েমা তার কাফেলা নিয়ে বুকাইলী ত্যাগ করছে। ছায়েমা অশ্বারোহীদের নিয়ে আঁধারে হারিয়ে গেল। রাস্তার দূরত্ব অনুপাতে খুব দ্রুত চলা সম্ভব হয়নি। কারণ, ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাস্তাও আঁকাবাঁকা। তথাপি সাধ্যানুযায়ী ঘোটক হাঁকাচ্ছে। রাস্তাঘাট জনমানবহীন। জোনাকীর মিছিল ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। দূর আকাশে কিছু তারকা মিট মিট করে জ্বলছে। ঘোটক চলছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

রাত দু'টার দিকে তারা গারদিয়াজে এসে পৌঁছল। পরবর্তীতে কোন ট্রেন আসার সিডিউল না থাকায় রেলওয়ে কর্মচারীরা নিজ নিজ কক্ষে ঘুমাচ্ছে। বিজলী বাতিগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পুরো এলাকা দিবালোকের মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। প্রহরীরা দু'এক স্থানে টেবিলে বসে ঝিমুচ্ছে। ছায়েমা অন্যান্য সাথীদের একটু দূরে রেখে পদব্রজে চলে গেল হারুনীর সন্ধানে। বেশ কতগুলো ইঞ্জিনবিহীন মালবাহী ট্রেন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। ছায়েমা তল্লাশি করে হারুনীর বগীর সন্ধান পায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে সাথীদের নিকট চলে গিয়ে বলল্, "প্রিয় বন্ধুরা! তোমরা খুব সর্তকতার সাথে সামনে চলবে, যেন কোন শব্দ না হয়।"

তিনজনকে বলল, "তোমরা খানিক দূরে অশ্বের পৃষ্ঠদেশে বসেই পজিশন নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। যদি ফায়ারের নির্দেশ দেয়া হয়, তবে জীবন বাজী রেখে ফায়ার আরম্ভ করবে। আর আমরা দু'জনে প্লাসের সাহায্যে কাটাতারগুলো দ্রুত কেটে বন্দিদের বের করে আনব। তারপর ভাগাভাগি করে নিজ নিজ অশ্বে তুলে দ্রুতপদে বুকাইলীর দিকে অগ্রসর হব।"

সকলেই ছায়েমার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তার কেটে বন্দিদেরকে মুক্ত করে নিয়ে এল। বন্দিরা সবাই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। দাঁড়ানোও তাদের জন্য কষ্টকর। অন্ধকারে কাউকে চেনা যাচ্ছে না। ছায়েমা হুকুম দিল, সবাই দু'জন করে ঘোড়ার পিঠে তুলে নাও। বন্দিরা ছিল ১০ জন। দু'জন করে তুলে নিয়ে চলছে বুকাইলীর পথ ধরে। ঘোড়া তেমন বেগে দাবড়ানো যাচ্ছে না। কারণ, এরা এতই দুর্বল ছিল যে, অশ্বপৃষ্ঠে বসে থাকতে পারছেনা। তাই ধীরে ধীরে চালিয়ে বেশকিছু দূর এগিয়ে গেল। তারপর একটি উপযুক্ত স্থানে ঘোটক থামিয়ে অবতরণ করল। ক্ষুধার্ত বন্দিদের আহার করিয়ে অনেকটা বলবান করে তুলল।

বন্দিরা এখনো বুঝতে পারেনি তাদেরকে কারা অপহরণ করেছে এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে হারুনী বললেন, "ভাইয়েরা! তোমরা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমাদের কি মেরে ফেলবে? এত কষ্ট করছ কেন? এখানেই মেরে ফেল?"

ছায়েমা সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ওহে বন্দি সকল! আমরা সুদূর বুকাইলী থেকে তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি। আল্লাহর মেহেরবানীতে তোমাদেরকে অতি সহজে মুক্ত করতে পেরেছি। এখনো আমরা বিপদমুক্ত নই। যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারি। আপনাদের সাথে কথা পরে হবে। আপনারা একটু কষ্ট হলেও শক্ত করে বসে থাকুন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই বুকাইলীতে পৌছতে হবে।"

হারুনী বুকাইলীর কথা শুনে অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন এবং বললেন, "বুকাইলীতেই তো আমার বাড়ি।"

ছায়েমা বলল, "হাঁ আপনাকে আপনার বাড়ীতেই পৌঁছিয়ে দেব।"

এই বলে সবাইকে তুলে নিয়ে পাগলের মত ঘোটক হাঁকিয়ে ফজরের পূর্বেই হারুনীর বাড়ী এসে পৌঁছল। সবাই ছায়েমার মুখে বন্দি মুক্তির সব ঘটনা শুনে অবাক হয়ে গেল। তৃষ্ণার নিকট এটা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। সবাই আল্লাহর শোকর আদায় করতে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল।

[ষোল]

মাহমুদা মিকাইলী আমাকে পেয়ে আনন্দের সীমানা পেরিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে। সে প্রায়ই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিহাদের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চায়। একবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, "মুসাফির ভাই! জিহাদে না গিয়ে কি জিহাদের সওয়ার পাওয়ার অন্য কোন উপায় আছে?"

উত্তরে আমি বললাম, "হ্যাঁ আছে। যেমন মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেন, "যে ব্যাক্তি কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধের ছামানা দান করে, সেও যোদ্ধা। যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার বাড়ীঘর আমানতদারীর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করবে, সেও যোদ্ধার পর্যায়ভুক্ত হবে।" (বুখারী)।

অপর এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি বাড়ীতে বসে জিহাদের জন্য অর্থ জোগান দেয়, সে সাতশত গুণ সওয়াব পাবে এবং যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল উভয়টি দিবে, সে সাত লক্ষ গুণ সওয়াব পাবে।" (ইবনে মাজা)

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নিজে জিহাদে না গিয়ে

মুজাহিদদের যুদ্ধের সরঞ্জাম ও আর্থিক সংকট দূর করে দিলেও জিহাদের সওয়ার পাওয়া যায়। এটা শুধু ফরজে কেফায়ার জিহাদের জন্য। আর যদি জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, তবে জান-মাল উভয়টি খরচ করতে হবে। অন্যথায় ফরজ আদায় হবে না।

মাহমুদা মিকাইলী আমাকে আবার প্রশ্ন করল, "মুসাফিস ভাইয়া! আমার ভাই তো মনে হয় জিহাদের পূর্ণ মর্যাদা পাবেন না। কারণ, তিনি আমীর সাহেবের নির্দেশে পাহাড়ের পাদদেশে পাহারা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় দুশমনের পক্ষ থেকে এক ঝাঁক গুলী এসে তার জান কেড়ে নিয়েছে। সামনা-সামনি তো লড়াই করতে পারেননি। এমতাবস্থায় কি তিনি শহীদদের মর্যাদা পাবেন?"

আমি বললাম, মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস থেকেই তোমার উত্তর খুঁজে পাবে। তিনি বলেছেন, "একটি মাত্র রাত আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারী করা ঘরে বসে এক হাজার বৎসর অনবরত সারাদিন রোজা এবং সারারাত নফল নামাজ হতে অধিক উত্তম।" (ইবনে মাজা)

আল্লাহর রাস্তায় এক দিনের রেবাত (ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা) সারা দুনিয়া এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত ধন-দৌলত, মান-ইজ্জত ও প্রতিপত্তি অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ।" (বুখারী)।

তিনি অপর এক হাদীসে বলেন, "এক দিবস এবং এক রাত মোরাবাতা তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার জন্য পাহারাদারী করা পূর্ণ একমাস অনবরত রোযা রাখা এবং পূর্ণ একমাস অনবরত নামাযে দণ্ডায়মান থাকা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ।" (মুসলিম)

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন, "ইসলামী রাষ্ট্রে সীমান্ত পাহারায় একদিন অবস্থান করা, ইসলামী কাজের অন্যান্য স্থানে এক সহস্র দিন অবস্থান করা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ।" (ইবনে হিব্বান)।

অতএব, তোমার ভাই যে কত সওয়াব অর্জন করে শাহাদাতবরণ করেছেন; তা নির্ণয় করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর তিনি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাহাদাতের পুরস্কার লাভ করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার বক্তব্য শুনে মাহমুদা তার পিতাকে ডেকে বলল, "আব্বু! তুমি ভাইয়ার মুখ থেকে শুনেছ কি নবীর হাদীস? এসো না আব্বু,

মুসাফির ভাইয়ার ঘরে এসে হাদীস শোন।"

মেয়ের জোর আবেদনে হারেছ মিকাইলী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি বলছ মামণি?"

মাহমুদা বলল, "নবীর হাদীস শোনতে ডাকছি।"

এই বলে আমার বর্ণিত হাদীসগুলো এক এক করে পিতাকে শোনাল। পিতাও মনোযোগের সাথে সবগুলো হাদীস শ্রবণ করলেন।

আমি হারেছ মিকাইলীকে জিজ্ঞেস করলাম, "জনাব! আপনি যে চীন থেকে একটি অস্ত্রের চালান এনেছিলেন, তা দেখাবেন কি?"

হারেছ মিকাইলী উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই দেখাব। এগুলো আমার হেফাজতেই রয়েছে। মুজাহিদদের কোন গ্রুপ না পাওয়ায় এগুলো নিরাপদ স্থানে রেখে দিয়েছি। সুযোগ পেলে মুজাহিদদের হাতে হস্তান্তর করব। আর এখন তো দেখানো সম্ভব নয়। রাতে নিয়ে দেখাব ইনশাল্লাহ্।"

হারেছ সাহেবের কথা শুনে আমার অন্তর খুশীতে নেচে উঠল। কয়েক লক্ষ টাকার অস্ত্রশস্ত্র মুজাহিদদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাই আল্লাহর শোকর আদায় করলাম।

হারেছ মিকাইলী খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক। তিনি আমাকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেন না। কারণ, এলাকার অবস্থা ভাল নয়। যদি জানাজানি হয়ে যায় যে, এই বাড়ীতে একজন অপিরিচিত লোক থাকে, তাহলে তার বাড়ী কোথায়, কেনই বা এখানে থাকে, তার মতলব কি, এসব কল্পনা-জল্পনার দ্বারা আসল রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

আমি আমার দুঃখিনী মাকে রেখে এসেছি আজ কতদিন হল। তিনি হয়ত আমার জন্য কেঁদে অস্থির। তাছাড়া পাগলিনী ছায়েমা তো চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ওর তো খানাপিনা, আরাম-আয়েশ ও ঘুম হারাম হয়ে গেছে। হয়ত দিনমান পথপানে চেয়ে চেয়ে মরছে। সে তো এক মুহূর্ত আমাকে চোখের আড়ালে থাকতে দিত না। দিনমান আমাকে নিয়ে কত হামলার পরিকল্পনা করত তার কোন হিসাব নেই। ঘুম জেগে সারা রাত আমার সাথে আলাপ করে রাত কাটিয়ে দিত। এসব ছাড়াও অতীতের কত স্মৃতি

বিজড়িত কাহিনীই না হৃদয় সরোবরে ভেসে বেড়াচ্ছে। এসব ভাবনা আমাকে অস্থির করে তুলছে। খানাপিনা কিছুই ভাল লাগছিল না। জীবন বাঁচিয়ে রাখতে মাত্র কয়েক গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করতাম। আমার খাদ্যের পরিমাণ দেখে সবাই বুঝতে পারত, আমার অবস্থা কেমন। ছায়েমার বিরহ বেদনায় আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে গেল কতগুলো ছন্দের সুর লহরী–

"ছীনা খাহাম শারহা আয ফেরাক,
তার বগূয়াম শরহে দরদে ইশতিয়াক॥"

অর্থাৎ– বিরহ বেদনায় যাদের বক্ষদেশ বিদীর্ণ, আমার প্রেম বেদনা প্রকাশের জন্য এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ কক্ষেরই প্রয়োজন।

"হার কাছে কূ দূর মান্দাম আছলে খেশ,
বায্ জূইয়াদ রোযেগায়ে ওয়াছেলে খেশ॥"

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি আপন গোত্র থেকে দূর ছিটকে পড়েছে। সে পুনরায় তার হৃত মিলন যুগ অন্বেষণ করে ফিরে।

"তেরে ফরকত ছে দিলে গমজাদা এতনা চুড় হে
রোখনা রোখনা হে কে গুইয়া খানায়ে জামবুরহে॥"

অর্থাৎ– প্রেমাষ্পদের সবগুলো নিদর্শন তোমার মাঝে পেয়েছি, তাই তো আমি তোমার প্রেমের ফাঁদে আট্‌কা পড়ে গেছি।

আমি যখন গুণ গুণ রবে ছন্দগুলো আবৃত করে বিগলিত হৃদয়ে সান্ত্বনা নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম, তখন মাহমুদা পর্দার অন্তরাল থেকে আমার নিকট ছুটে এসে নির্জীব মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। আমার চোখের পানি তার উড়নাঞ্চলে মুছে দেয়ার চেষ্টা করল। আমি কিঞ্চিত মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে আমার রুমালে মুছে নিলাম। মাহমুদা বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মুসাফির ভাইয়া! কি হয়েছে তোমার। কাঁদছ দেখছি! এত অস্থির আর পেরেশান হচ্ছ কেন! কি হয়েছে ভাইয়া? আমাদের এখানে তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, তাই না...।"

ওর কথার উত্তর না দিয়ে থাকার সাধ্য নেই। তার সামনে মুখ ভার করে থাকা মহা-অন্যায়। অগত্যা ওষ্ঠযুগলে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে আমি বললাম, "কই আমার তো কিছুই হয়নি। মাঝে-মধ্যে

একটু-আধটু পেরেশানী তো আসতেই পারে। তাই বলে তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন?"

মাহমুদা আমার কথার উত্তরে গ্রীবা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, "আরে মিয়া! তুমি কিচ্ছুই বুঝ না, তোমাকে একদম ছোট্ট খোকা বলে মনে হয়। তোমার মলিন চেহারা দেখলে আমি মোটেই সইতে পারি না। তোমার সামান্যতম চিন্তা আমাকে মহাচিন্তার সাগরে ডুবিয়ে দেয়। আমি যা দেখতে পারি না, যা শুনতে পারিনা, তুমি তাই দেখাচ্ছ ও শোনাচ্ছ। আর যেন কোনদিন এগুলো আমাকে দেখতে না হয়, শুনতে না হয়। এখন তুমি কলিজা বিদীর্ণ করা কবিতাগুলো আবৃত করছ কেন, তা বলবে কি ভাই?"

আমি নিরুপায় হয়ে বললাম, "আমার ব্যথিত হৃদয়ের ব্যথাগুলো প্রকাশ করে তোমাকে কাঁদাতে চাইনে বোন। আমার দুঃখ-বেদনাগুলো অন্তরে লালন করেই আমি জীবনের যবনিকা টানতে চাই। এগুলো শুনে তোমার কোন লাভ নেই। আমি তোমার কচি ও নরম দিলে আঘাত হানতে চাইনা।"

আমার একথাগুলো তার কাছে হলাহলের মত মনে হল। তাই চোখ দু'টি কপালে তুলে মলিন বদনে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি কি তুমি বলবে না? না বললে কিন্তু...।"

মাহমুদার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে আমি আমার জীবনের শুরু থেকে মর্মান্তিক কাহিনীগুলো এক এক করে বর্ণনা করলাম। লেখাপড়ার জীবন, আব্বুর মর্মান্তিক শাহাদাত, বাড়ী-ঘর ও মাদ্রাসার ধ্বংসালীলা, সর্বহারা ছায়েমা, আমার ও ছায়েমার বন্দি জীবন, বিভিন্ন অপারেশনের ঘটনা, খোদায়ী নুসরত ইত্যাদি এক এক করে সব শোনালাম।

আমার কথা শুনে মাহমুদা অবুঝ বালিকার ন্যায় হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। অনেক বলেও কান্না থামাতে পারিনি। আমার হৃদয়বিদায়ক ইতিহাস শুনে তার কোমল দিল ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে বলল, "মুসাফিস ভাইয়া! এত দুঃখ-বেদনা, নির্যাতন-নিপীড়ন বরদাস্ত করে এখনো তুমি বেঁচে আছ! তুমি তো পাগল হয় যাওয়ার কথা! সত্যিই মুজাহিদরা ইস্পাত-কঠিন মানুষ। এরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পাগল। পাহাড় সমান

মছিবতেও তারা একবিন্দু টলে না। পর্বতের ন্যায় অটল-অবিচল। অন্তর তাদের কঠিন। তারা ইসলামের বিজয়ের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। আহ্, কি সুন্দর তাদের জীবন! কত পবিত্র তাদের অন্তর!"

এতক্ষণে সবিতা পশ্চিমাকাশে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। রক্তিম আভা ছড়িয়ে ক্রমশই ম্লান হয়ে যাচ্ছে সূর্যটা। পাখীরা সন্ধ্যার আগমনী বার্তা নিয়ে কিচির-মিচির গান গেয়ে আপন নিড়ে ফিরছে। আমি আমার কক্ষ থেকে বের হয়ে উঠানে পায়চারি করছিলাম। এমন সময় মাহমুদা অজুর পানি নিয়ে হাজির। আমি অজু সেরে নামায আদায় করে তিলওয়াতে বসে গেলাম।

এরই মধ্যে হারেছ মিকাইলী এসে বললেন, "বাবা! অস্ত্রগুলো এখন দেখবে কি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, দেখব।"

তিনি আমাকে নিয়ে কয়েকটি বাড়ী পার হয়ে নদীর কূলে এক গোরস্তানে নিয়ে গেলেন। বিরাট এলাকা নিয়ে গোরস্তানটি। চারদিকে ৩ ফুট উঁচু দেয়াল। ঝোঁপ-ঝাড় ও লতাগুল্মে ভরা। দিবালোকেও কেউ এখানে আসে না। আমাকে নিয়ে চললেন গভীরে, আরো গভীরে। সেখানে গিয়ে হাতের ইশারায় এক পুরাতন কবর দেখিয়ে বললেন, "এখানেই রয়েছে অস্ত্রগুলো।"

আমি অস্ত্রগুলো চেয়ে দেখলাম। ত্রিপলে ঢাকা। আল্লাহর নাম নিয়ে ত্রিপল সরিয়ে দেখলাম, চাঁদের আলোতে অস্ত্রগুলো ঝকমক করছে। আহ্ কত সুন্দর! কি চমৎকার! বেশ দামি ও শক্তিশালী অস্ত্র। মনের আনন্দে এক এক করে সবগুলো উঠালাম। গুণে দেখলাম, চাইনিজ রাইফেল ৩টি, ষ্টেনগান ৩টি, এসএলআর ২টি, এলএমজি ২টি, এসএমজি ১টি, নাইন এমএম ১টি, ক্লাশিনকভ ৩টি, শক্তিশালী রিমোর্ট বোমা ৩টি। গান ১৫টি বোমা ৩টি। আর গুলীর কার্টুন ৫টি। সবগুলো দেখে আবার সেখানেই রেখে বাড়ী ফিরে এলাম।

বাড়ী ফিরে হারেছ মিকাইলীকে বললাম, "জনাব! এই এলাকায় তো মুজাহিদদের কোন গ্রুপের সন্ধান পেলাম না। আনোয়ার পাশাও তো আমাদেরকে শোকসাগরে ভাসিয়ে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে

মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন, তবে অস্ত্রগুলো জিহাদের কাজে ব্যবহার করতে পারি। আমার অনেক সাথী শূন্য হাতে দুশমনের মোকাবেলা করছে।"

আমার কথায় হারেছ মিকাইলী খুবই খুশি হলেন এবং বললেন, "বাবা! অস্ত্রগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগুক এবং মুজাহিদদের হাতে পৌঁছে যাক, এটাই আমার কাম্য। এখন থেকে অস্ত্রগুলোর মালিক তুমি– তোমার যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাও।"

হারেছ সাহেব আনোয়ার পাশার শাহাদাতের খবর জানতেন না। আমার মুখ থেকে তাঁর নিহতের সংবাদ পেয়ে কেঁদে অস্থির হয়ে গেলেন। তিনি আনোয়ার পাশা ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অত্যাধিক ভাল বাসতেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, খাবার, ঔষধ ও কাপড়-চোপড় দান করেছেন। এ সংবাদে তিনি নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারলেন না। শুধু কাঁদছেন আর কাঁদছেন। এভাবে বেশকিছু সময় কেটে গেল। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম, "জনাব! আনোয়ার পাশা দ্বীনের জন্য, জাতির জন্য পরম কুরবানী পেশ করেছেন। এ অবহেলিত জাতিকে উদ্ধার করার জন্য বন-জঙ্গলে, লতা-পাতা খেয়ে দ্বীনের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। এর বিনিময় শাহাদাত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর উপর খুশী হয়ে সর্বোচ্চ পুরস্কার দান করেছেন। এতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।"

এবার হারেছ সাহেবের চেহারার মলিনতা অনেকটা কেটে গেল। তিনি চোখ দু'টি মুছে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আমি আবার বললাম, "জনাব! আমি তো অনেক দূরের মুসাফির। অস্ত্রগুলো বহন করা খুবই কঠিন। রাস্তায় রয়েছে শত শত চেকপোষ্ট, আর কড়া পাহারা। বর্তমান এ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কি করে এগুলো গন্তব্য পৌছানো যায়, এ ব্যাপারে পরামর্শ দিন।"

তিনি নীরবে কি যেন গভীরভাবে ভাবলেন। তারপর বললেন, "মাথায় একটি উপায় জাগ্রত হয়েছে। তাহল, অস্ত্রগুলো যদি পার্টে পার্টে খুলে তরকারীর বস্তায় ভরে ট্রাকে দেওয়া হয়, তবে হয়ত নেওয়া যাবে।"

আমি বললাম, "তা বটে, কিন্তু এখন এভাবে নেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, বর্তমানে মেশিনের সাহায্যে অস্ত্র চেক করা হচ্ছে। এমন কোন বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কার, বেবীট্যাক্সি, রিকশা নেই, যা চেক হচ্ছে না। কাজেই, এভাবে নেয়া সম্ভব হবে না। তবে আর একটি বুদ্ধি আছে। আপনি যদি সহায়তা করেন, তবে আশা করি ঐ উপায়ে নেয়া যেতে পারে।"

হারেছ মিকাইলী বললেন, "যত ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন, সবই আমি করব। বলুন কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

আমি বললাম, "জনাব! আমরা যদি অস্ত্রগুলো কার্বন পেপারে ভাল করে মুড়িয়ে পলিথিনে পেঁচিয়ে কফিনের ভেতর ভরে, আগরবাতি জ্বালিয়ে, কর্পুল ছিটিয়ে খুব ভালভাবে কফিনের মধ্যে ভরে এ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাই, তাহলে হয়ত চেকের হাত থেকে বাঁচতে পারি। তাছাড়া যদি আরো একটি কাজ করা যায়, তবে অনেক সহায়ক হবে।"

হারেছ মিকাইলী বললেন, "বলো, কি কাজ বাবা।"

আমি বললাম, "আমরা যদি কোন মেডিকেল অফিসার দ্বারা স্বাভাবিক মৃত্যুর একটি সার্টিফিকিট নিতে পারি আর হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স নিতে পারি, তবে খুবই ভাল হয়।"

আমার কথা শুনে হারেছ মিকাইলী বললেন, "আরে এত কোন ব্যাপারই নয়। মাহমুদার মামা মেডিকেলের বড় অফিসার। যে কোন প্রকারেই হোক সার্টিফিকেট অবশ্যই আদায় করব। আর যত টাকাই লাগুক না কেন, একটু বেশী ধরিয়ে দিলে এ্যাম্বুলেন্স দেয়ার জন্য পাগল হয়ে যাবে।"

এই বলে মিকাইলী আমাকে নিয়ে এক ফার্নিচারের দোকানে গিয়ে একটি কফিনের অর্ডার দিলেন। তারপর আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন মাহমুদার মামার বাড়ী সার্টিফিকেট ও এ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপারে আলাপ করার জন্য।

বিকালে হারেছ মিকাইলী বাড়ী ফিরলেন কফিন, চা-পাতি, কর্পুর, আগরবাতি ও লাশ ঢাকার এক বিশেষ চাদর নিয়ে। এগুলো দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা। হারেছ মিকাইলী পকেট থেকে একটি

কাগজ বের করে আমার সামনে ধরলেন। দেখলাম, স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেই একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। তবে সরকারী প্যাডে না লিখে ব্যক্তিগত প্যাডে লিখেছেন। তিনি বললেন, "আগামী কাল ফজরের পরপরই এ্যাম্বুলেন্স এসে যাবে।"

আমি মাগরিবের নামায আদায় করে তাছবিহাত পড়ছিলাম। এমন সময় হারেছ মিকাইলী এসে বললেন, "চলো বাবা, অস্ত্রগুলো এখনই কফিনে সাজিয়ে ভরে রাখি। তাহলে সকালে পেরেশান হতে হবে না।"

আমরা আস্তে আস্তে গোরস্তান থেকে অস্ত্রগুলো এনে সুন্দর করে ভাঁজ করে কফিনের ভেতর সাজিয়ে রাখলাম। তারপর চারপাশে চা-পাতি ও কর্পুর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে সাদা কাপড়ে আবৃত করলাম। এরপর তারকাটা পিটিয়ে ঢাকনা লাগালাম।

আমাদের আয়োজন দেখে মাহমুদা বুঝতে পেরেছে যে, এই বাড়িতে আমার রিযিক শেষ হয়ে আসছে। হয়ত এখানে আর থাকব না। মাহমুদা বিগলিত ভাষায় আমাকে বলল, "ওগো মুসাফির ভাইয়া! তুমি যে এত নিষ্ঠুর, এত পাষাণ, তা আগে জানতাম না। যেদিন থেকে আব্বু তোমাকে বাঁশ বাগান থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, সেদিন থেকেই আমার নিহত ভাই মাহমুদের বেদনা ভুলে তোমাকেই ভাইয়ের মর্যাদা দিয়েছি। তোমাকে নিয়ে জীবনের অনেক স্বপ্ন দেখেছি। তোমাকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনেছি। আমার হৃদয় মন্দিরের দুয়ার খুলে একমাত্র তোমাকেই স্থান দিয়েছি। আজ আমাকে একাকী ফেলে তুমি কোন্ সুদূরে ডানা মেলছ মুসাফির। আমি যে তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তা কি বুঝতে পারছ না।"

মাহমুদার কথাগুলো আমার অন্তরে খুব আঘাত করল। আমি ভাবছিলাম, কেন একজন অপরজনকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসে। এ ভালবাসার পেছনে নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন অনুগ্রহ নিহিত থাকতে পারে।

আমি মাহমুদাকে বললাম, "মাহমুদা! আমাদের জন্য দোয়া করো। কর্তব্যের খাতিরে যেতে হচ্ছে। মাঝে-মধ্যে তোমাদের এখানে আসব ইনশাআল্লাহ।"

[সতের]

বন্দিদের শরীর পাষণ্ডদের নির্মম অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। হাঁটাচলা তো দূরের কথা, ভালভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। তাদের কষ্ট দেখে কোমলমতি ছায়েমা এলাকার এক যুবককে ডেকে পাঠাল ডাক্তার আনার জন্য। ডাক্তার আনা ও ওষুধ ক্রয়ের খরচ ছায়েমাই দিল এবং বলে দিল, যদি দ্বীনদার-পরহেজগার এম, বি, বিএস ডাক্তার তোমার জানা থাকে, তবে তাকেই আনার চেষ্টা করবে। যদি তা না পাও, তবে অন্য ডাক্তার নিয়ে আসবে।

যুবক ডাক্তার আনতে চলে গেল শহরে। যুবকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ডাক্তার একেএম আযাদ চিকিৎসা জগতে এক অনন্য ব্যক্তি। দ্বীনদারী ও পরহেজগারীতেও কম নয়। তাই প্রথমেই ডাঃ আযাদের নিকট গেল। ডাঃ রোগীদের যাবতীয় অবস্থা যুবকের নিকট থেকে শুনে কিছু ওষুধ সাথে নিয়ে চলে আসলেন তোরাব হারুনীর বাসভবনে।

ডাঃ রোগীদের অবস্থা নিজ চোখে দেখে এবং তাদের মর্মান্তিক কাহিনী শুনে কেঁদে ফেললেন। ক্ষণে-ক্ষণে ডাক্তারের হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। নিরপরাধ মানুষের উপর এ ধরনের অত্যাচার করতে পারে, তা তিনি কোন দিন ভাবতে পারেননি। কোন মতে কান্না সংবরণ করে নিজ হাতে রোগীদের শরীরের ক্ষতস্থানের জমাট বাঁধা রক্ত ও পুঁজ ধুয়ে-মুছে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। আবার যে যে স্থানে সেলাইয়ের প্রয়োজন ছিল, সেলাই করে দিলেন। ব্যথা নিবারণের জন্য এবং ক্ষতস্থান দ্রুত শোকানোর জন্য ওষুধ লিখে দিলেন। কখন কোন্ ওষুধ কি পরিমাণ খেতে হবে, কোন্ ঔষধ কিভাবে ব্যবহার করবে, সবকিছু এক এক করে কাগজে লিখে দিলেন এবং বললেন, "আমি এক সপ্তাহ পরে এসে সেলাই কেটে দেব।"

মজলুম রোগীদের চিকিৎসা করতে পেরে ডাক্তার নিজেকে ধন্য মনে করলেন। তিনি ফিস বা পারিশ্রমিক হিসাবে একটি পয়সাও গ্রহণ করলেন না। তারপর রোগীদেরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, "হে মজলুম ভাইয়েরা! আপনারা ধৈর্যধারণ করুন আর আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকুন, আল্লাহ্ যেন জালিমদেরকে তাদের জুলুমের শাস্তি দান করেন।"

এই বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

এদিকে ছায়েমার বৃদ্ধা জননী বার্ধক্যজনিত কারণে ও ছায়েমার চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকেও উত্তম চিকিৎসা করা হচ্ছে। কিন্তু দিন দিন তিনি দুর্বল থেকে দুর্বলের দিকেই ধাবিত হচ্ছেন।

ছায়েমা ও তৃষ্ণা দিনে-রাতে রোগীদের খেদমত করতে লাগল। কার কখন কি দরকার, কাকে কি ওষুধ খাওয়াতে হবে, খানাপিনা, অজু-গোসল ইত্যাদি ব্যাপারে খুবই সাবধানতার সাথে সেবা করতে লাগল।

আল্লামা ইসমাঈল কারাবী তাদের সেবা-যত্নের শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে বললেন, "সত্যি মহিলারা অত্যন্ত কোমলমতি, দয়ালু ও ভদ্র। মায়া-মমতায় তাদের অন্তর ভরপুর। কতই না পবিত্র তাদের অন্তর। পরের দুঃখে দুখী, পরের চিন্তার চিন্তিত, পরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়ার মহৎ গুণ নারীদের মাঝেই বেশী পাওয়া যায়। পুরুষের জন্য নারী জাতিকে আল্লাহ এক মহা-নেয়ামত হিসাবে দান করেছেন। তাই তো নারী আর পুরুষের মাঝে সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এক আকর্ষণ রয়েছে।"

তিনি তাদের জন্য দু'আ করলেন। শেষে বললেন, "নারী আর পুরুষের মধ্যে যে আকর্ষণ রয়েছে, তা যদি হালাল উপায়ে সুন্নত তরিকায় ব্যবহার হয়, তবে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি লাভ করবে আর পরকালে পাবে জান্নাতের সুখ। আর যদি এ আকর্ষণ নাজায়েজ বা হারাম পন্থায় ব্যবহৃত হয়, তবে দুনিয়াতেই জাহান্নামের আগুন পোহাতে হবে।"

তিনি ছায়েমা ও তৃষ্ণাকে ডেকে বললেন, "মা! তোমরা আমার মেয়েতুল্য হলেও শরীয়তের একটা নির্ধারিত সীমারেখা রয়েছে। আশা করি পর্দার মত ফরয বিধান তোমরা মেনে চলবে। এতে তোমরাও সেবা করার কারণে জান্নাত পাবে আর পাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর আমরাও গুনাহ থেকে বাঁচতে পারব।"

ছায়েমা ও তৃষ্ণা যদিও শরীয়তের ভিতর থেকেই সেবা করছিল, তবু আগামী দিনের জন্য সতর্ক করে দিলেন। ওরা শুনে খুশী হল।

তোরাব হারুনী এখনো মুক্তির পুরো ঘটনা জানেননি। এ মরণ ফাঁদ থেকে কিভাবে মুক্তি পেলেন, কে বা কারা তাঁকে মুক্ত করে এনেছে– ওসব কিছুই তিনি জানেন না। মাঝে-মধ্যে তিনি বিকারগ্রস্ত

লোকের মত আবোল-তাবোল বকেন– "আমি না খানেডেরা থানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শৃংখলাবদ্ধ ছিলাম! আমি না মালবাহী ট্রেনের উন্মুক্ত বগীর উপর কাঁটাতারের মরণ ফাঁদে আবদ্ধ ছিলাম! আমাকে না প্রেরণ করা হচ্ছিল কেন্দ্রীয় কারাগারে! আমার না সাথী ছিল রোদ-বৃষ্টি-তৃষ্ণা-অনাহার আর অনিদ্রা। কে আমাকে নিয়ে এল তৃষ্ণার কোলে? কে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে হিংস্র হায়েনার থাবা থেকে?"

বিষাদময় দিনগুলো এখনো তাঁর চোখে ভাসছে। মাঝে-মধ্যে তাকে রোমাঞ্চিত দেখা যাচ্ছে আবার ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে উঠছে।

তৃষ্ণা স্বস্নেহে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "আপনার মুক্তিদাতা তো আপনার পার্শ্বেই উপবিষ্ট। আর কেউ নয়, আমার বীরঙ্গনা বোন হাফেজা ছায়েমা মালাকানী। সে গোপন সূত্রে আপনার খবর পেয়ে আমাকে না জানিয়ে ছুটে গিয়েছিল আপনাকে উদ্ধার করতে।"

তৃষ্ণার কথা শুনে হারুনী নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। হৃদয় খুলে ছায়েমার জন্য দোয়া করলেন।

বন্দীদের মধ্যে একজন ছিলেন হাফেজ তাজুল ইসলাম। তিনি মাদ্রাসা খোদাদাদের হেফ্জ বিভাগের স্বনামধন্য উস্তাদ। যাঁর পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধানে অগণিত আদম সন্তান পবিত্র কুরআন মুখস্ত করে ধন্য হয়েছেন। তিনি তৃষ্ণার কথাগুলো শুনছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি আর চুপ থাকতে পারলেন না। কণ্ঠটা সামান্য পরিস্কার করে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্!! আমাদের মুক্তিদাতা ৫ জনের মধ্যে ২ জনই মহিলা। আর এ অভিযানটি একটি বালিকার নেতৃত্বেই হয়েছে। আহ! কী বীরত্ব, কী সাহস! নিজের জীবন বিপন্ন করে মৃত্যুর ভয় আর জেল-জুলুমের ভাবনাকে পায়ে মাড়িয়ে বন্দিদেরকে উদ্ধার করেছে। কতই না মহৎ তাদের এ কুরবানী! কি সূক্ষ্ণ তাদের পরিকল্পনা! কত নিখুঁত তাদের অভিযান! অন্যথায় আজ আমাদের ধুকে ধুকে মরতে হত। সীমাহীন অত্যাচারে হয়ত ঈমানহারা হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হত। হে আল্লাহ! যারা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, তাদেরকে তুমি জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান কর।"

হাফেজ তাজুল ইসলামের কথা শেষ হতে না হতেই ফকীহুল

উম্মাহ আল্লামা ইসমাঈল কারাভী বলতে লাগলেন, "ইসলামের সৈনিকদের ইতিহাস এমনটিই হয়ে থাকে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রাহঃ) একদিকে ছিলেন হাদীস বিশারদ ও বিশ্বখ্যাত মুবাল্লিগ। অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন জানবাজ মুজাহিদ। রক্তরাঙ্গা পিচ্ছিল পথের সুদক্ষ সেনানায়ক ও রণকৌশলী। তিনি কখনো হাদীসের দারস দিতেন আবার কখনো দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াতেন। আবার এই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ঢাল-তলোয়ার ও ঘোড়া নিয়ে ইসলামের শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তার ঘোড়া কখনো রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি। পরম উদ্যম ও উদ্দীপনায় বীর-বিক্রমে কাফির-মুশরিকদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েননি। এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গনে ছুটে বেড়াতেন। দুশমনের সাথে তাকে অনেকবার রণখেলায় লিপ্ত থাকতে হয়েছে। জীবন বাজী রেখে বিজয়ের মাল্য ছিনিয়ে এনে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।"

আল্লামা ইসমাঈল কারাভী আরো বললেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাহঃ) তুরছুছ রণাঙ্গন থেকে ফিরে সে যুগের সবচে' বড় বুজুর্গ, হারামাইন শরীফাইনের এবাদতকারী হযরত ফুজাইল ইবনে ইয়ায (রাহঃ)-এর নিকট এই পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন—

'হে পবিত্র মক্কা মদীনার উপাসনাকারী তাপস প্রবর! তোমরা যদি আমাদের এবাদত নিজ চোখে অবলোন করতে, তাহলে তোমাদের এবাদতকে নিছক খেলাধুলা মনে করতে। তোমাদের ইবাদতে যখন জোশ আসে, তখন গণ্ডদেশ অশ্রুতে প্লাবিত হয়। আর প্রেমাষ্পদের মিলন ভিক্ষা প্রার্থনা করে। আর আমাদের ইবাদতে যখন জোশ আসে, তখন আমাদের গ্রীবা রঞ্জিত হয় তাজা খুনে। তোমরা যখন ঘোড়া দৌঁড়াও, তখন ক্লান্ত হয়ে পড়লে নিরাপদে গৃহে ফিরে যাও। আর আমরা যখন অশ্বারোহন করি, তখন ঘোড়াটিকে নিয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরব তার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। যে কোন সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারি। তোমরা মেশক আম্বর ও মৃগনাভীর সুঘ্রাণকে খুবই পছন্দ কর, আর আমরা যুদ্ধের ময়দানে পরিশ্রমের পর নিজের ও ঘোড়ার থেকে যে ঘর্ম নির্গত হয় এবং ঘোড়ার

পদধূলিকে সুঘ্রাণ থেকে অধিক ভালবাসি। তবে মনে রেখ! তোমার সুঘ্রাণ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) কোন প্রশংসা করেননি, কিন্তু আমাদের ঘর্ম ও ধুলাবালির প্রশংসা করেছেন। জিহাদের ময়দানের ধুলা-বালি যার শরীরে লেগেছে, তাকে জাহান্নামের আগুনে স্পর্শ করবে না। তোমাদের ইবাদতের মত যদি কেউ ইবাদত করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাকে মৃত বলা হয় এবং সে জান্নাতী হবে না জাহান্নামী তা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না। আমাদের ইবাদত করতে করতে যদি কেউ নিহত হয়, তবে তাকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। আর শহীদ হওয়ার সাথে সাথে জান্নাত দেয়া হয়।'

সুবহানাল্লাহ! জিহাদের আমলের মত এত ফজিলত অন্য কোন এবাদতে নেই।"

তিনি আরো বললেন, "হযরত ইবনে ইয়াজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) একদিন এক লোকের জানাযা পড়তে দাঁড়ালে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী! এ লোকটি ফাসেক ছিল, তার জানাযা পড়াবেন না।'

দয়ার নবী রাহ্মাতুল্লিল আলামীন (সাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা লোকটিকে ইসলামের কোন খেদমত করতে দেখেছ?'

উত্তরে একজন সাহাবী বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)! আমি লোকটিকে এক রাত মুজাহিদদের পাহারা দিতে দেখেছি।' অতঃপর হুজুর (সাঃ) লোকটির জানাযা পড়িয়ে নিজ হাতে মাটি দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'হে ইসলামের খাদেম! তোমার সাথীরা মনে করেছে যে তুমি জাহান্নামী, কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি জান্নাতী।' অতপর তিনি ওমর (রাঃ) কে বললেন, 'হে ওমর! মানুষের বাইরের আমলই শুধু দেখ না, ভেতরের ঈমানী জযবা এবং ভালবাসাও দেখ।" (বায়হাকী, মেশকাত)।

"যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে জিহাদের জন্য বের হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামত পর্যন্ত গাজীর সমান নেকী তার আমল নামায় লেখা হবে।" (আবু ইয়ালা)

তিনি আরো বললেন, "জান্নাতে মুজাহিদদের জন্য একশত স্তর

তৈরী করে রাখা হয়েছে। এক স্তর হতে অন্য স্তরের দূরত্ব হবে পৃথিবী আর আকাশের দূরত্বের সমান।

অপর এক হাদীসে এরশাদ হচ্ছে, 'ইসলামের ভিত্তি এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। ইসলামের দেয়াল বা স্তম্ভ নামায এবং রোযা। আর ইসলামের শিখরচূড়া বা ছাদ হল জিহাদ।"

আল্লামা ইসলমাঈল কারাভী বলেন, "উক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর জিহাদকে তরক করে নিজেরাই ইসলমাকে লুণ্ঠিত করেছি। কাজেই আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে পুরস্কারের পরিবর্তে আমরা তিরস্কার পাওয়ারই হকদার। আমাদের যে বলসেভিক পুলিশরা নির্যাতন করেছে, আমরা তার প্রাপ্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদ তরক করার শাস্তি।"

কারাভীর কথা শুনে অন্যান্য বন্দিরা ও উপস্থিত লোকেরা খুবই আপসোস করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন যে, "আমরা এখনই আমাদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করে আপনার হাতে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করব। বাকি জীবন জিহাদের ময়দানে ব্যয় করব।"

বন্দি মুক্তির সংবাদটি মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাদেরকে দেখার জন্য চারদিক থেকে নেমে এল জনতার ঢল। অল্পক্ষণের মধ্যেই হারুনীর আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা কেউ আজ ঘরে বসে নেই। বন্দিরা অন্দর বাটির গৃহে অবস্থান করছেন। সেখানে ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায় না। তাই শৃংখলা রক্ষা করে ছায়েমা সকলকে বন্দিদের এক নজর দেখার ব্যবস্থা করে দিল।

বন্দিদের দেখে অনেকের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সবাই ভাবতে শুরু করে, হায়! এমন নিরপরাধ মানুষগুলোকে কেন ওরা একেবারে পঙ্গু করে দিল। সবাই যেন নর-কংকাল। মুসলমান হওয়াটাই কি তাদের অপরাধ? সবাই তো পাকা ঈমানদার ও দ্বীনদার মুসলমান। তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে কমিউনিজমের আসল চেহারা সকলের অন্তরেই ফুটে উঠল। সকলেই নির্বাক তাকিয়ে আছে।

আল্লামা ইসমাঈল কারাভী সকলের মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, "ওহে মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা আমাদের অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ো না। এতটুকু শাস্তি আমাদের জন্য যথেষ্ঠ নয়। আরো অধিক শাস্তি আমাদের পাপ্য। এ শাস্তি তো কাফিরদের পক্ষ থেকে, এতে এত বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শাস্তি আসবে, তা আরো মর্মান্তিক হবে। আনোয়ার পাশা উম্মতের এ দুর্দশা অবলোকন করে পাগলের মত আমাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন জিহাদের পক্ষে ফতোয়া নেয়ার জন্য। কিন্তু আমরা নিজেরা তো ফতোয়ায় দস্তখত করিইনি, বরং জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছি। নিজের ভীরুতা ও কাপুরুষতার দরুন খোড়া যুক্তি দেখিয়ে নিজেরাও জিহাদ থেকে বিরত রয়েছি এবং উম্মতের বিরাট এক জামাতকে জিহাদ থেকে বঞ্চিত করেছি। তাই মহানবী যথার্থই বলেছেন, যারা জিহাদ তরক করবে, তাদের উপর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান চাপিয়ে দেয়া হবে।"

ছায়েমা নিরপরাধ বন্দিদেরকে দুশমনের কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছে বলে আল্লাহর শোকর আদায় করছে। অন্তরে তার আনন্দের ফল্গুধারা। চরম দুর্দিনে আশ্রয়দাতা তোরাব হারুনীর সামান্যতম উপকার করতে পেরেছে বলে সে আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু যখনই পলাতক খোবায়েবের কথা মনে পড়ছে, তখনই তার অন্তর ভেঙ্গে চৌচির হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। দানা-পানি কিছুই যাচ্ছে না তার উদরে। খোবায়েবের আগমন পথপানে ডাগর দুটি আঁখি মেলে দিনমান চেয়ে থাকে। কত দিন কত রাত গড়িয়ে যাচ্ছে তার অপেক্ষায়, আজও ফিরে আসছে না খোবায়েব। কখনো কখনো একা একা বসে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে পাগলিনীর মত ভাবতে থাকে, হয়ত খোবায়েব আনোয়ার পাশার সাক্ষাত পেয়ে তার বাহিনীতে যোগ দিয়ে হামলার পর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই দুঃখিনী মায়ের কথা ভুলে গেছে। ভুলে গিয়েছে রেখে যাওয়া অবলা বোনটির কথা। মনের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে তার আশ্রয়দাতা তোরাব হারুনী ও তৃষ্ণার কথা। নিশ্চয়ই সে জিহাদের মজা পেয়ে গেছে। কাফির হত্যা করার সাধ উপভোগ করছে। আবার কখনো

কখনো মনের চাকা ঘুরিয়ে ভাবতে থাকে, না, সে হয়ত আনোয়ার পাশার সন্ধানে হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, বন-বাদারে, পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা বলসেভিকদের হাতে বন্দি হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। না হয় লাল ফৌজরা তাকে শহীদ করে দিয়েছে। নানা দুশ্চিন্তা ছায়েমার কচি মনে উদয় হয়ে আঘাতের পর আঘাত হানছে, তার কোন সীমারেখা নেই।

চিন্তার বিভোরে ছায়েমা অবশেষে স্থির করে, আর অপেক্ষা করা যায় না, খোবায়েবের সন্ধান সে করবেই। তার সঠিক সংবাদ জানতে হবে। তার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে ঘোড়া নিয়ে।

কিন্তু যদি তোরাব হারুনী ও তৃষ্ণা জানতে পারে, তবে কিছুতেই তাকে যেতে দেবে না। তাই এদেরকে না জানিয়ে খুব কৌশলেই বের হতে হবে। কথাটা শুধু মাছুমাকে বলে যাবে। ও বেচারী দ্বীনের খাতিরে তার পিতা ও ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করেছে। এ কত বড় কুরবানী। আমি চলে গেলে বেচারী একদম পাগল হয়ে যাবে। তাই মাছুমাকে ডেকে অতি গোপনে বলল, "আর হয়ত দেখা হবে না বোন। আমাকে ক্ষমা করো। তোমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। অনেক সময় অনেক রাগারাগি করেছি। ক্ষমা করে দিও বোন।"

মাছুমা ছায়েমার কথা শুনে স্থির থাকতে পারল না। চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবে তুমি? তোমার তো যাওয়ার মত কোন স্থান নেই, মাথা গোজার আশ্রয় নেই, যাবে কোথায়?"

ছায়েমা উত্তরে বলল, "আমার পলাতকটাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

মাছুমা বলল, "শুনেছি খোবায়েবের সাথে তোমার শাদী হওয়ার কথা।" তৃষ্ণা ইতোমধ্যে বিবাহের সব আয়োজন করে রেখেছে। আসার সাথে সাথেই বিবাহ পর্ব শেষ করবে।

ছায়েমা হাসির রেখা টেনে বলল, "আরে পাগলিনী! ওকে যদি নাই পাওয়া গেল, তবে বিয়ে দেবে কাকে? কাজেই তাকে খুঁজতে আমি কাল সকালেই বের হব।"

মাছুমা বলল, "না বোন! তোমাকে আর একা পাঠাব না। তোমার

সুখ-দুঃখের সাথী হিসাবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। না হয় এ কথা আমি গোপন রাখব না। সকলের কানে কানে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেব। তারপর দেখি তুমি কিভাবে যাও।"

ছায়েমা মাছুমাকে সঙ্গে নিতে রাজি হল।

[আঠার]

আমি এ্যাম্বুলেন্সে কফিনটি তুলে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ড্রাইভারের বামপার্শ্বে এসে বসলাম। ড্রাইভার ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ীটা একটু পিছিয়ে নিয়ে সামনে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। কিছু রাস্তা খুবই সরু ও আঁকাবাঁকা। তাই দ্রুত চালান সম্ভব হচ্ছে না। গাড়ী চলতে চলতে বেশকিছু দূর চলে এল। শেষবারের মত আবার হারেছ মিকাইলীর বাড়ীটি দেখে আলবিদা জানাব ভেবে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকালাম।

হঠাৎ দেখলাম, মাহমুদা চিবুক দুলিয়ে দুলিয়ে এদিকে ছুটে আসছে। অরণ্যের চঞ্চলা হরিণী যখন বন্য হায়েনাদের আক্রমণ থেকে দৌড়িয়ে পালায়, মাহমুদাও ঠিক তেমনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে দৌড়িয়ে আসছে এ্যাম্বুলেন্সের দিকে।

আমি ড্রাইভারকে বললাম, ভাই, গাড়ীটা একটু থামান। ড্রাইভার গাড়ী থামাল।

মাহমুদা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে আমার পার্শ্বে দাঁড়াল। চোখ দু'টি অশ্রুভেজা। সুন্দর মুখমন্ডলে যেন এক পোচ কালি মেখে দিয়েছে। কে যেন কেড়ে নিয়েছে তার মুখের হাসি। শরীর কাঁপছে। দৌড়ানোর ক্লান্তি এখনো কাটেনি। খুব ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে।

আমি হাত বের করে ওড়নাঞ্চলে দু'টি চোখ মুছে দিয়ে বললাম, "আরে পাগলিনী, হতভাগিনী! বিদায়ের সময় অমন করে কাঁদতে নেই। তোর কান্না যে আমি মোটেই সইতে পারছি না, তা কি জানিসনে? তোর কান্না যেন আমার কলিজায় শেলের আঘাত হানছে। আমি তো চেয়েছিলাম ফুটন্ত কুসুমের আড়ালে তোর শ্বেত দন্তপাটির হাসিটুকু দেখে বিদায় নেব। আমি চেয়েছিলাম হৃদয় উজাড় করে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবে। তা বুঝি আর ভাগ্যে হল না। তুমি

শুধু নিজে কাঁদতে আর অন্যকে কাঁদতেই শিখেছ বুঝি?"

মাহমুদা কান্নার উত্তাল তরঙ্গমালাকে খানিকটা সামলিয়ে নিয়ে বলল, "মাত্র কয়েক দিনে তুমি যে আমার হৃদয়রাজ্য জয় করে অন্তর নামক রাজধানী দখল করে সিংহাসনে আরোহন করে স্থায়ীভাবে শাসন ভার গ্রহণ করেছ, তাই... ।"

একটু নীরব থেকে আবার বলল, "চেহারা-সুরতে অতুলনীয়, আমল-আখলাকে অবর্ণনীয় বীরত্ব-বাহাদুরীতে অনন্য, দয়া-অনুগ্রহে এমন একটি মানুষকে কাছে পেয়ে ভেবেছিলাম সে ব্যক্তিটি হবে আমার শাসক। তার খেদমতেই আমার জীবন ওয়াকফ্ করব। সেই হবে আমার জীবনসঙ্গী।"

আমি একটু মুচকি হেসে বললাম, "পাগলিনীর মত তুমি কি বলছ? ওয়াক্‌ফকৃত জমির উপর কারো দখলদারিত্ব থাকে না। আমি না আগেই বলেছি যে, আমি আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে গেছি। এখানে আর কারো দখল নেই। হ্যাঁ, যদি এমনটিই হয়, তবে আমার কুড়িয়ে আনা বোন ছায়েমাকে... ।"

মাহমুদা আমার কথা শুনে বলল, "আমি জানতাম, তোমার হৃদয়জুড়ে ছায়েমার রাজ্য। সে-ই এই রাজ্যের একমাত্র অধিকারিনী রাণী। সবকিছু জেনেশুনেও আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। মুসাফির ভাইয়া! হতে পারি আমি অসুন্দর-অবলা, হতে পারি অশিক্ষতা-মূর্খ, হতে পারি পল্লী গাঁয়ের চাষীর কন্যা, হতে পারি অবহেলিত-বঞ্চিত ও অবাঞ্ছিত। তবু যে আমি তোমাকেই ভালবাসি। তুমি তো আমার অন্তর চুরি করে নিয়েছ। বশীকরণ বিদ্যা প্রয়োগ করে আমার জীবনের ভাবনা-চেতনা, হৃদয়ের লালিত স্বপ্ন সবই অপহরণ করেছ। ঠিক আছে, আবার ছায়েমাকে সাথে নিয়ে তোমার দুঃখিনী বোনটিকে দেখে যেও। আসবে কি মুসাফির ভাইয়া?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, অবশ্যই আসব ইনশাআল্লাহ!"

গাড়ী বুকাইলীর দিকে চলতে লাগল। ড্রাইভার গাড়ী চালাচ্ছে আর আমি বসে বসে শুধু ভাবছি আর ভাবছি। কেন মানুষ মানুষকে এত ভালবাসে? কেন মানুষের জন্য মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে? কেন মানুষ মানুষকে কাছে পেতে জীবন বিলিয়ে দেয়। কেন এত

ভাল বাসাবাসি? কেন এত আকর্ষণ? কেন এত হৃদয়ের টানাটানি? তাহলে কি এ নির্মল ও পবিত্র ভালবাসার কারণেই মানুষ বেঁচে আছে ? এ ভালবাসার মাঝেই কি এমন কিছু লুকিয়ে আছে, যে পর্দার অন্তরাল থেকে কাজ করছে? হ্যাঁ, তার পেছনে অবশ্যই একটি শক্তি কাজ করছে, সে মহাশক্তির নাম আল্লাহ। এসব ভাবতে ভাবতে যেন আমি চিন্তার মহাসাগরে হারিয়ে গেলাম।

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়ীটি নিয়ে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। গাড়ীটি তেলশূন্য হয়ে যে কোন সময় থেমে যেতে পারে। তাই ড্রাইভার একটি তেলের পাম্পে গাড়ীটি থামিয়ে তেল সংগ্রহ করল। এ অবসরে আমি এস্তেঞ্জার হাজত সেরে অজু করে গাড়ীতে পুনরায় বসলাম। ড্রাইভার পূর্বের ন্যায় গাড়ী চালাতে লাগল। রাস্তাটি পিচঢালা ও সমতল। দ্রুত চলতে সহায়ক। এমনভাবে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি বাজার পেলাম।

যোহর নামাজ এখনো পড়িনি। তাই ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বললাম। ড্রাইভার একটি মসজিদের পার্শ্বে গাড়ী থামাল। আমরা তাড়াতাড়ি দু'রাকাত নামাজ আদায় করে একটি হোটেলে ঢুকলাম। হোটেলের বয় আমাদের সামনে খানা হাজির করল।

খানা সেরে বেরুতেই দেখি লোকজন ধেঁয়ে আসছে গাড়ীর দিকে লাশ দেখার জন্যে। আমি আরো কয়েকটা আগর বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। আর একটু পরপর গোলাপ পানি ও কেওড়া ছিটিয়ে দিচ্ছি। উচ্চস্বরে পড়ছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! সবাই কফিনের উপর দিয়ে দেখে নিল। অতপর গাড়ী স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার বুকাইলীর দিকে আবার দ্রুত এগুতে লাগল।

গাড়ী এগিয়ে চলছে। আমি শুধু ডাগড় দু'টি আঁখি মেলে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে আল্লাহর সৃষ্টিরাজী অবলোকন করছি। এতো নিখুঁত তাঁর সৃষ্টি, এত সুন্দর তার সৃষ্টির কৌশল। এতেই বুঝা যায়, তিনি যে কত বড় বিজ্ঞানী ও কত বড় শক্তিধর। আমার অন্তর গেয়ে উঠল মহিমামণ্ডিত ছানা। এদিকে দুশমনের আক্রমণ থেকে হেফাজতের জন্য তাছবিহাত পাঠ করছি খুব বেশি বেশি।

এভাবে একরাত একদিন চলতে চলতে পরদিন দুপুরে গাড়ী

কাইল্যান্ড শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে বেনিন নামক চৌরাস্তায় এসে পৌঁছিল।

বেনিন একটি ক্ষুদ্র শহর। কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে কোন অংশে কম নয়। কারণ, তুর্কিস্তান বাই রোডে যেতে হলে বেনিন ছাড়া যাওয়ার অন্য পথ নেই। তাছাড়া আলমাআতা, কাইল্যান্ড, বুকাইলী এসব বড় বড় শহরে যেতে হলে বেনিন ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। এ গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিতে সবসময় গাড়ী-ঘোড়া চেক করে অবৈধ মালামাল উদ্ধার করা হয়। তাই ড্রাইভার আমাকে পূর্বেই বলে দিয়েছে যে, বেনিন মোড়ে খুব শক্ত চেকপোষ্ট রয়েছে, যা অতিক্রম করা খুব মুশকিল হবে। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে বলেছিলাম, আরো সামনে চলুন, যা হবার তাই হবে।

ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে বেনিন মোড়ে আসতেই দেখি সামনে শত শত গাড়ী থামানো রয়েছে। সামনে ট্রাফিক হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে না দেখতেই আমাদের পেছনেও শত শত গাড়ী এসে দাঁড়াল। অবস্থা এই হল, কোন দিকে নড়াচড়া করার মত কোন জায়গা নেই। দেড়-দু' ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ট্রাফিককে জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে এত যানজট কেন?"

ট্রাফিক হাত ইশারা দিয়ে বলল, "দেখ না কেন যানজট?"

তাকিয়ে দেখি, শত শত লাল ফৌজ গাড়ী তল্লাশি করছে।

আমি ভয়ে জড়োসড়ো! ট্রাফিককে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাই! এত তল্লাশি হচ্ছে কেন?"

তিনি বললেন, "কাইল্যান্ডে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারী করা হয়েছে।"

তার কারণ জানতে চাইলে সে বলল, "উক্ত শহরে আনোয়ার পাশার মুজাহিদরা রাতের আঁধারে আক্রমণ চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই কারফিউ জারী করে কাইল্যান্ডের অলিতে-গলিতে পাহারা চলছে। আর ভেতরে চলছে সেনা অভিযান। নিশ্চয় মুজাহিদরা শহরেই রয়েছে। তাই ওদেরকে যেভাবেই হোক ধরার চেষ্টা করছে।"

ট্রাফিকের কথা শুনে আমি আস্তে আস্তে এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি

করছি আর মনে মনে ভাবছি। এমন সময় একটু দূরে তাকিয়ে দেখি তল্লাশির দৃশ্য। গাড়ী ও লোক কোনটাই চেক করা থেকে বাদ পড়ছে না। লাগেজ-পত্র, শরীর ও গাড়ীর সিট উল্টিয়ে অবৈধ অস্ত্র তালাশ করছে। মানুষের দেহে চেকের সময় যন্ত্র ব্যবহার করছে। ঘন্টার পর ঘন্টা রোদে দাঁড়িয়ে আছে শত শত মানুষ। এমনকি শিশু এবং মহিলারাও নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। যাদের চেক হয়ে গেছে, তারাও যানজটের কারণে যেতে পারছে না। তাই পুরো এলাকা লোকে-লোকারণ্য। হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া বাজারে অন্যান্য খাবার বলতেও কিছুই নেই। এক হাহাকার অবস্থা বিরাজ করছে।

ড্রাইভার সবকিছু অবলোকন করে আমাকে বলল, "খোবায়েব ভাই! মনে হয় দু'-একদিনেও এখান থেকে ছুটি পাওয়া যাবে না। সবকিছু উলট-পালট করে যেভাবে চেক হচ্ছে, মনে হয় কফিনের ঢাকনা খুলে চেক করবে। তাছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র নির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে তালাশ করছে। এতে বাঁচার উপায় নেই। কাজেই গাড়ী যায় যাক, অস্ত্র যায় যাক, জীবন বাঁচাতে হবে। যদি এ অবস্থায় ধরা পড়ি, তবে আর রক্ষা নেই। দেখ দেখ ওরা চেক করতে করতে এদিকেই আসছে।"

আমি বললাম, "আরে এত ভয় পাওয়ার কি আছে, আল্লাহর নাম যপ কর। তিনিই একমাত্র ভরসা।"

আমি ড্রাইভারকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "চালক ভাই! আপনি আমার সাথে সাথে আসুন।"

চালকসহ আমরা ২শ" গজ দূরে একটি বিল্ডিং-এর দেয়ালের পার্শ্বে ছায়ার মধ্যে দাঁড়ালাম।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের তাণ্ডব দেখছি আর মনে মনে ভাবছি, এখান থেকে গাড়ী নিয়ে পালাবার কোন পথ নেই। কাজেই গাড়ী আর অস্ত্রের মায়া রেখে লাভ নেই। তাই দৃষ্টান্তমূলক একটি অপারেশন চালাতে হবে। আমরা যখন অস্ত্রশস্ত্র ও বোমাগুলো কফিনে তুলেছি, তখনই বোমাগুলো ভালভাবে চেক করে নিয়েছিলাম। রিমোটে চাপ দেয়ার সাথে সাথে বিস্ফোরণ ঘটবে।

আমাদের গাড়ী যেখানে দাঁড়ানো ছিল, সেখানে কোন লোকজন

ছিল না। কারণ, এতক্ষণে লোকগুলো কোন বিল্ডিংয়ের ছায়া বা গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে। ৫ জন পুলিশ কনষ্টেবল আগ্নেয়াস্ত্র নির্ণয় মেশিন নিয়ে আমাদের গাড়ীর নিকট আসতেই লাল বাতিগুলো জ্বলে উঠল আর একযোগে আর্তনাদ করে উঠল। বেজে উঠল বিপদ ধ্বনি। সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বসল। বাঁশির আওয়াজ কানে পৌঁছার সাথে সাথে ১৫/২০ জন পুলিশ দৌড়ে এল গাড়ীর পার্শ্বে। তাছাড়া সেনা বাহিনীর জোয়ানরাও ছিল ৪/৫ জন। পুলিশের বড় অফিসারও ছিল।

আমরাও এ সুযোগটা হেলায় নষ্ট করা সমীচীন মনে করলাম না। কয়েকজন কফিন থেকে অস্ত্রগুলো বের করার চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে 'অমা রামাইতা ইয রামাইতা অলাকিন্নাল্লাহা রামা' বলে রিমোর্টে চাপ দিলাম। সাথে সাথে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে গেল। আগুনের লেলিহান শিখা ও ধুম্রকুণ্ডলিতে এক প্রলয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হল। আশপাশের বেশ কয়েকটি গাড়ীতেও আগুন ধরে গেল। সেনাবাহিনীর সদস্যসহ বেশ ক'জন পুলিশ নিহত হল। আর অনেকেই হল আহত। হতাহতের সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। এটা আমার ধারণা মাত্র। কেননা, বিস্ফোরণের সাথে সাথে আমি চালককে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাই। আশপাশের লোকজনের মুখ যার যেদিকে ছিল, সেদিকেই জান বাঁচানোর জন্য দৌড়াতে লাগল।

আকস্মাৎ এ দুর্ঘটনা কিভাবে সংগঠিত হল তা কেউ বুঝতে পারেনি। বারুদের গন্ধে ও আহতদের চিৎকারে আসমান-জমিন ভারী হয়ে গেল। আমরা দৌড়িয়ে চলে এলাম বহুদূরে।

চালক এখনো বুঝতে পারেনি কি হতে কি হয়ে গেল। শরীর কাঁপছে। পানির পিপাসায় ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। সে আমাকে বলল, "ভাইজান! যত তাড়তাড়ি পারেন এ স্থান ত্যাগ করুন, না হয় কোন্ বিপদে পড়ি কে জানে। হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দিকে, একটি বেবীট্যাক্সি এদিকে আসছে। ড্রাইভারকে হাতের ইশারা দিলে বেবীটি আমাদের পার্শ্বে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

বেবীওয়ালা উত্তর দিল, "ওরগান।"

ওরগান একটি থানা শহর। এখান থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে।

আমরা বেবীতে চড়ে ওরগানের দিকে যাত্রা করলাম। বিকাল পাঁচটা দিকে শহরের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম। শহরের ভেতরে ঢোকার জন্য অনুরোধ জানালে বেবীওয়ালা বলল, "স্যার! শহরের ভেতর বেবী নিয়ে ঢোকা যাবে না। কারণ, অনেক সময় কারফিউ থাকে। অগত্যা বেবীওয়ালাকে তার পাওনা পরিশোধ করে হাঁটতে লাগলাম। সন্ধ্যার আর বেশী বাকি নেই। সূর্যের প্রখরতা ম্লান হয়ে আসছে। সামান্য পরেই অন্ধকারে হারিয়ে যাব।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যার সাথে সাথে ওরগান শহরে প্রবেশ করলাম। শহরটি খুবই ছোট। দোকানপাট তেমন পরিপাটি নয়। আমরা একটি মসজিদে ঢুকে নামায আদায় করলাম। কিন্তু অন্য কোন মুসল্লী দৃষ্টিগোচর হল না। নামায শেষ করে আবাসিক হোটেলের সন্ধান করতে করতে সারাটি বাজার চষে বেড়ালাম। কোন আবাসিক হোটেল পেলাম না।

আমার ড্রাইভার এখনো ভয়ে কাঁপছে। তাছাড়া তার আর একটি অতিরিক্ত চিন্তা হল, এম্বুলেন্স ধ্বংস হয়ে গেছে। হাসপাতাল কর্মকর্তার কাছে কি জবাব দেবে। এ নিয়ে সে খুবই পেরেশান। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "আরে এতো ভয় কিসের? আপনার আশপাশে বেশ ক'টি প্রাইভেট কার দাঁড়ানো ছিল, মাল বোঝাই ট্রাকও ছিল কয়েকটি। আশপাশের সব ক'টি গাড়ীই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কোন্ গাড়ী থেকে এ বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা কে জানে? আপনি থানায় একটি জিডি করে রাখুন। গাড়ী নষ্ট হলে সরকারের হয়েছে। এতে আপনার ক্ষতি কি?"

এবার ড্রাইভার চেতনা ফিরে পেল। সে বলল, "এখানে যখন থাকার কোন ব্যবস্থা নেই, তাহলে আমি জিআর ল্যান্ডে চলে যাই। সেখানে আমার চাচার বাসা। এখন যদি রওয়ানা দেই, তবে রাত আটটা-ন'টার দিকে পৌঁছতে পারব। রাস্তাঘাট সবই আমার চেনা। বেবীতে চড়েই যওয়া যাবে, হয়ত ভাড়া একটু বেশী লাগবে। আমার সাথে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হাসপাতালের পরিচয়পত্র আছে। এগুলো অনেক সহায়ক হবে।"

ড্রাইভারের কথা শুনে আমি তাকে বিদায় দিতে রাজী হলাম। তার পাওনার চেয়ে আরো ৩শ’ টাকা বেশী দিয়ে তাকে বিদায় দিলাম। ড্রাইভার খুশী হয়ে একটি বেবী নিয়ে জিআর ল্যান্ডের দিকে যাত্রা করল।

এখানে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। আমি চিন্তা করলাম, অন্য কোথাও যাওয়া যায় কিনা। তাই একটি দোকানের পার্শ্বে গিয়ে হ্যাজাকের আলোতে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে মানচিত্র বের করে দেখলাম।

বাসপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও নৌপথ। এখান থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে রেলপথ। সেখানে গিয়ে হয়ত যে কোন দিকে যাওয়া যাবে। তাই সময় নষ্ট না করে যানবাহনের সন্ধান করলাম। রাত হওয়ার কারণে কোন বেবীট্যাক্সি বা টাঙ্গা যেতে রাজি হল না। কারণ, ১৬ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তাই অরণ্যভূমি। সেখানে রয়েছে ডাকাতদল। তাছাড়া বন্য হিংস্র প্রাণী তো আছেই। একবার সেখানে গেলে নিরাপদে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। তাই কাউকে রাজি করাতে পারলাম না। অনেক টাকার বিনিময়েও যেতে রাজি হল না। অগত্যা আল্লাহর উপর ভরসা করে একাই পথ ধরলাম।

হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেই গভীর জঙ্গলের সন্ধান পেলাম। পা আর সামনে অগ্রসর হতে চায় না। চারদিকে অন্ধকার। সাথে নেই কোন সঙ্গী, নেই আলো। দূর আকাশে তারকাপুঞ্জ মিট মিট করে জ্বলছে। মাঝে-মধ্যে জোনাকিরা ঝাঁক বেঁধে ছুটাছুটি করছে। ভয়ে আমার প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার উপক্রম। বিপদাশংকায় ধমনির চঞ্চল রোধিরধারা আরো চঞ্চলোদ্দাম হয়ে হৃদপিণ্ড শতধাবিদীর্ণ করার উপক্রম। উক্ত অরণ্যে রয়েছে- বাঘ, সিংহ, ভল্লুক, হরিণ, শার্দুল, মাতঙ্গ, ভূজঙ্গ, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, শৃগাল, বানর, হনুমান। এ ছাড়াও রয়েছে নাম না জানা অনেক হিংস্র প্রাণী। কখন কে আমাকে উদরস্ত করে ফেলে, তা কে জানে। তাই বেশী বেশী আল্লাহর নাম যপ করতে লাগলাম। এমনিভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি লোকালয়ে এসে পৌঁছলাম।

রাত আনুমানিক বারটা। আরো ৩-৪ কিলোমিটার হাঁটার পর

স্টেশনের বিজলী বাতিগুলো জ্বলতে দেখে আনন্দে আল্লাহর শোকর আদায় করতে লাগলাম। স্টেশনে পৌছে জানতে পারলাম, রাত ২টায় একটি ট্রেন আলমাআতার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। তাই টিকিট নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় প্লাটফর্মের একটি বেঞ্চে বসলাম।

নির্ধারিত সময়ে ট্রেনটি এসে লাইনে দাঁড়াল। আমি বিলম্ব না করে ট্রেনে উঠে একটি আসন নিয়ে বসে পড়লাম। ট্রেনটি মাঠ-ঘাট, বন-বাদার পেরিয়ে লাগাতার তিনদিন তিনরাত বিরামহীন চলতে চলতে আলমাআতায় এসে পৌঁছল। আজ কয়েক মাস পর আলমাআতায় এসেছি। মন চায় শহরটি ঘুরে দেখতে।

আব্বুর জামেউল উলুম মাদ্রাসা এবং তার বন্ধুর (চাচার) খোঁজ নেই। চাচার বাসায় গিয়ে দেখি বাড়ী-ঘরের চিহ্নটুকু নেই। লোকমুখে জানতে পারলাম, লালফৌজরা সবাইকে হত্যা করে বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে।

শহর প্রদক্ষিণ করার সখ মন থেকে মুছে গেল। কারণ, আরো কত ধ্বংসলীলা জানি দেখতে হয়। তাই এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করার চিন্তা বাদ দিয়ে একটি টাংগা ভাড়া করে বেলা দু'টার দিকে বুকাইলী এসে হাজির হলাম। টাংগাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তোরাব হারুনীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করলাম।

মন অজানা এক আনন্দ-ফূর্তিতে উদ্বেলিত। বহুদিন পর বহু বাধার জিঞ্জির পেরিয়ে দুঃখিনী মায়ের কোলে ফিরে যাচ্ছি। ফিরে যাচ্ছি বোন ছায়েমার কাছে। আহ! কি মজা! কি আনন্দ! বাড়ীর আঙ্গিনায় গিয়ে যখন আম্মু আম্মু বলে ডাকব, তখন পাগলিনীর বেশে মা ছুটে আসবেন। ছুটে আসবে ছায়েমা ও তৃষ্ণা। আমার অনাকাঙ্খিত আগমনে সকলেই হয়ত খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে। আমার চারদিকে ঘিরে বসবে ওরা সফরের কারগুজারী শোনার জন্য। ছায়েমা আমার পাশ ঘেঁষে বসবে, অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে, মনদিয়ে আমার কথা শুনবে। কথার মাঝে প্রশ্ন করে কত কিছু জানতে চাইবে। আমি একটু অভিমান করে তার আগ্রহ আরো বড়িয়ে দেব। এসব চিন্তা করতে করতে বাড়ীর প্রায় নিকটে এসে হাজির হলাম।

এমন সময় দেখি অনেকগুলো লোক একটি জানাযা বহন করে গোরস্তানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কে মারা গেল? কার লাশ? লাশের পিছু পিছু চলছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। গোরস্তান সংলগ্ন মাঠে গিয়ে লাশটি রেখে সবাই কাতারবন্দি হল। আমিও গিয়ে শামিল হলাম। এমন সময় এক যুবক চিৎকার করে বলে উঠল, "খোবয়েব ভাই এসেছে, খোবায়েব ভাই এসেছে!"

তোরাব হারুনী ছুটে আসলেন আমার নিকট। কি বলবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না। শুধু আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি প্রথমে হারুনীকে চিনতে পারছিলাম না। জীর্ণ-শীর্ণ শরীর, চেহারা কালো হয়ে গেছে। যেন একটি নর-কংকাল। আমি সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাইয়া এটা কার জানাযা?"

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি আরো জোরে কাঁদতে শুরু করলেন। আমার পার্শ্বের এক বৃদ্ধ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ভাংগা স্বরে বললেন, "বাবা! এ তোমার মায়ের জানাযা। আজ সকালে তোমার বৃদ্ধা জননী পরপারে যাত্রা করেছেন।"

বৃদ্ধার কথা শুনে আমি ঠিক থাকতে পারলাম না। আম্মু আম্মু বলে চিৎকার দিয়ে খাটিয়ার দিকে ছুটে গেলাম। "আম্মু... আমার আম্মু...! তোমার খোবায়েব আবার তোমার কোলে ফিরে এসেছে। আম্মু! তোমার পাগল তোমার কাছে ফিরে এসেছে। একটিবার চোখ মেলে আমার দিকে তাকাও।"

আহ্, আম্মু আমার ডাকে তো আজ সারা দিল না। আম্মুর মত কেউ তো আজ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে না। খোবায়েব খোবায়েব বলে ডাকে না। দুঃখ-বেদনা আর অনুশোচনায় হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। অনেক কষ্টে মনকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম, কেউ তো দুনিয়াতে চিরদিন থাকবে না। সকলকেই একদিন শুভ্রবসন অঙ্গে পরিধান করে পরপারে চলে যেতে হবে। এটাই দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম। আর কেঁদে লাভ নেই। জনমের তরে হারিয়ে ফেলেছি মহামূল্যবান সম্পদ। আমার সুখে-দুঃখে আর কেউ কাঁদবে না। মনকে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে জানাযা পড়ে নিজ হাতে চিরদিনের জন্য মাকে দাফন করলাম।

[উনিশ]

আমি আম্মুর দাফন পর্ব সমাধা করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ীর পথ ধরেছি। হারুনী আমার সাথেই চলছেন। আমাদের সঙ্গে আরো ক'জন অপরিচিত ব্যক্তি এগিয়ে চলছেন। তাদেরকে আমি আগে দেখছি বলে মনে পড়ে না। সকলেই যেন যম রোগে আক্রান্ত। শরীর ক্ষত-বিক্ষত। আঘাতজনিত দাগগুলো থেকে এখনো পুঁজ বের হচ্ছে। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে হারুনী বললেন, "পরিচয় পরে পাবে, এরা আমাদেরই লোক।"

লোকগুলো আমার সাথেই চলছে।

আমি মনে মনে ধারণা করেছি যে, আম্মুর মৃত্যুতে ছায়েমা ভেঙ্গে পড়বে। আম্মুকেই তো সে মা বানিয়েছে। আম্মুর নিকট থেকেই সে পেত মায়ের ভালবাসা, আদর-সোহাগ। আম্মুকে পেয়ে সে তার মায়ের কথা ভুলে গিয়েছিল। আম্মুও তাকে নিজের মেয়ে হিসাবে বরণ করে নিয়েছিল। নিজ হাতে আম্মুকে গোসল করিয়েছে, খানা খাইয়েছে। আম্মুও তাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারতেন না। আম্মুকে হারিয়ে সে এখন কত কষ্ট পাচ্ছে কে জানে। তবে আমাকে কাছে পেয়ে হয়ত তার চিন্তা ও পেরেশানী অনেকটা লাঘব হবে। এসব চিন্তা করতে করতে আমি হারুনীর বাড়ী এসে পৌঁছলাম।

তৃষ্ণা খাটের উপর শুয়ে গুমরে কাঁদছে। আমি আম্মুর ঘরে ঢুকলাম। আহ্ আম্মুর পরিত্যক্ত কামিজ, সেলোয়ার, উড়না, শাড়ী ও জুতা যেন মালিকহারা বিরহ বেদনায় কাঁদছে।

আমার হৃদয় ফেটে গুমরিয়ে কান্না বেরিয়ে এল।

হারুনী এসে খালি কেদারাটি দখল করে বসলেন। আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে নিজেই কেঁদে ফেললেন। তিনি কেঁদে কেঁদে আম্মুর দু'চারটি কথা শুনালেন। তিনি বললেন, "খোবায়েব! তুমি যাওয়ার পর তোমার আম্মুর স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। খানাপিনা, ঘুম ও আরাম-আয়েশ ঠিক ঠিকই ছিল। কারণ, তৃষ্ণা ও ছায়েমা তার খেদমতে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখত। এখন থেকে প্রায় দশ-পনের দিন যাবত তার শরীর আস্তে আস্তে খারাপ হতে লাগল। উন্নত চিকিৎসার জন্য বড় ডাক্তার আনা হল। ভাল ভাল ওষুধ সেবন করান

হল। কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই, বরং দিন দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছে। মৃত্যুর ২/৩ দিন আগ থেকেই শুধু তোমাকে খুঁজতে শুরু করে, খোবায়েব খোবায়েব বলে ডেকে উঠতেন। মাঝে-মধ্যেই তার চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে গণ্ডদ্বয় ভিজে যেত। একদিকে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, অপরদিকে চিন্তা ও পেরেশানী। একদিকে স্বামী, ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীহারা, অপরদিকে ইসলামের দুর্দশা, মুসলমানদের উপর অকথ্য জুলুম-নির্যাতন। এসব চিন্তা একসাথে তোমার মাকে আক্রমণ করেছে। তাই এ বৃদ্ধ বয়সে সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।"

এতটুকু বলে তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন।

আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে অশ্রুবর্ষণ করছি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি কিন্তু ছায়েমাকে তো দেখছি না। তাহলে এ চরম মুহূর্তেও কি সে অভিমান করেছে! এখন কি অভিমানের সময়? না, এমন তো হওয়ার কথা নয়। এ সময়ে তো এমনটি করবে না। তাহলে সে কোথায়? আমার কাছে তো আসল না। আমি চারদিকে তাকাচ্ছি, কিন্তু ছায়েমার ছায়াটুকু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বারবার খোলা বাতায়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নেই। অগত্য হারুনীকে জিজ্ঞাসা করে ছায়েমার খবর জানতে চাইলাম। হারুনী দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। চেহারা তার মলিন। উত্তর দিতে বিলম্ব হচ্ছে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "ভাইজান! ছায়েমা কোথায়? তাকে দেখছি না যে?"

হারুনী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "আজ তিন দিন হলো ছায়েমা ঘর থেকে বের হয়েছে, আজো ফিরে আসেনি। তোমার বিরহ যাতনা সইতে না পেরে প্রায়ই কান্নাকাটি করত। তৃষ্ণা অনেক প্রলোভনের মাধ্যমে তার বেদনা লাঘব করার চেষ্টা করত। গভীর রাতেও তাকে অঘুম নয়নে করিডোরে বসা দেখতাম। গুণ গুণ করে গাইত বিলাপগাথা। সে একা বের হয়নি, তার সাথে ওপাড়ার মাছুমাও রয়েছে। যাবার আগে সে তৃষ্ণাকে বলে গেছে, আজ রাতে বেশ করে ঘোড়া দৌড়াব। ফিরতে বিলম্ব হবে। আমার জন্য অপেক্ষা করো না। এতটুকু বলে সে ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে। আজো হতভাগিনী ফিরে আসেনি।"

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে! সে আবার ঘোড়দৌড় শিখল কখন?"

হারুনী বললেন, "আরে কি বল! তার মত অশ্বারোহী দশ গ্রামেও খুঁজে পাবে না। আমার ঘোড়া নিয়ে রোজই অনুশীলন করেছে। এখন সে বাতাসের আগে ঘোড়া ছুটাতে পারে। ঘোড়ার উপর বসে, দাঁড়িয়ে ও শুয়ে দৌঁড়াতে পারে। চোখে না দেখে তুমি বুঝতে পারবে না। শুধু তাই নয়, ঘোড়াকেও যুদ্ধের অনেক কলা-কৌশল শিখিয়েছে। এলাকার অনেক যুবককেও সে তৈরী করেছে।"

তিনি আরো বললেন, "খোবায়েব! জীবনেও আমি ছায়েমার ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। তার বীরত্বগাঁথা চিরদিন ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে। তার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, সাহসিকতা ও রণকৌশলের তুলনা হয় না। সে-ই তো আমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। সে-ই আমাদেরকে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে জীবন বাজি রেখে। তার উছিলায়ই এখনো আমরা বেঁচে আছি।"

তারপর হারুনী নিজের বন্দি জীবনের নির্যাতনের ইতিহাস এক এক করে আমাকে শোনালেন। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম।

এমন সময় তৃষ্ণা ওঘর থেকে কিছু খাবার এনে টেবিলে রেখে বলল, "খোবায়েব ভাই! তোমার চেহারা বলে তুমি ক্ষুধার্ত। কিছু খেয়ে নাও।"

আমি বললাম, "ক্ষুধার অনল উদরে দাউ দাউ করে জ্বলছে বটে, কিন্তু রুচি যে নেই। এক লোকমাও খাওয়া সম্ভব হবে না।"

তৃষ্ণা বারবার জোর নিবেদন করতে লাগল কিছু খাওয়ার জন্য। তার দিলজয়ীর জন্য কিছু খেতে বসলাম। দু'এক লোকমা খেয়ে হাত ধুয়ে উঠে গেলাম। জোর করেও গিলতে পারছি না।

তৃষ্ণা পার্শ্বের চেয়ারে বসা ছিল। সে আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, "ভাইজান! আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে যখন যা ফায়সালা আসে, অম্লান বদনে তা মেনে নেয়ার মধ্যেই কামিয়াবী। কেউ দুনিয়ায় চিরদিন থাকবে না আর শত চেষ্টা-তদবীর করলেও থাকা বা রাখা যাবে না। আপনার আম্মীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা কত

চেষ্টাই না করেছি। তবু তো রাখতে পারিনি। এটাই ছিল আল্লাহর ফায়সালা। তবে দুঃখ একটাই যে, অন্তিম সময়ে তিনি আপনাকে কাছে কাছে পেলেন না। ভাইজান! আপনি দুনিয়ার কোন কাজে লিপ্ত থাকার কারণে যদি আম্মার পার্শ্বে থাকতে না পারতেন, তবে এটা ছিল দুঃখের কারণ। কিন্তু আপনি তো দ্বীনের বড় একটি কাজের (জিহাদের) আঞ্জাম দিতে গিয়ে মায়ের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে থাকতে পারেননি। এতে দুঃখ পাওয়ার কথা নয়। আপনার আম্মা আমার বাহুতে মাথা রেখে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে করতে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়া কতই না খোশনসিব। তাই অযথা মনে দুঃখ নিয়ে গুনাহগার হবেন না।"

আমি তৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করলাম, " কিন্তু তোমরা আমার অসহায়া বোন ছায়েমাকে কী করলে?"

আমার প্রশ্নের সাথে সাথে তৃষ্ণার গণ্ডবেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। সে বলল, "ভাইজান! আপনি তুর্কিস্তানের দিকে যাওয়ার পর থেকেই তার অন্তর কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। সব সময়ই তার চোখ ভেজা দেখতাম। আপনাকে যে সে কত ভালবাসে, তা হয়ত আপনি জানেন না। শয়নে-স্বপনে শুধু আপনাকে নিয়েই ভাবত। আমি অনেক চেষ্টা করে তাকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতাম। ছায়েমা যাওয়ার দু'-তিন দিন আগে আমাকে বলল, 'তৃষ্ণা! কালের গর্ভে অনেক দিন বিলীন হতে চলেছে খোবায়েব এখনো ফিরল না। তার বিরহ-বেদনা আমার হৃদয়কে আহত করছে। খুন করছে আমার অন্তঃকরণ। আমি আর সইতে পারছি না। আমাকে একটিবার বিদায় দাও বোন। আমি তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসি।'

আমি তাকে বললাম, সাবধান! আর যেন এ ধরনের কথা না শুনি। খোবায়েব পুরুষ মানুষ। তাছাড়া সে একজন লড়াকু মুজাহিদ। তিনি তোমাকে আমাদের আশ্রয়ে রেখে গেছেন। সাগরে ভাসিয়ে যাননি। তোমার রক্ষণাবেক্ষণে আমরা কোন ত্রুটি করিনি। খোবায়েব একসময় না একসময় ফিরে আসবেন। তাই বলে তোমাকে পাগলের মত তাঁর খোঁজে দেশে দেশে ঘুরতে হবে, তা হয় না। দেশের অবস্থা দিন দিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে। কখন কি ঘটে যায় বলা যায় না।

তোমার ভাইয়া (হারুনী) খোবায়েবের খোঁজে গিয়ে কি লাঞ্ছনায় না পড়েছিলেন, তা তো তুমি ভালভাবেই জান। তারপরও তুমি কোন্ সাহসে যেতে চাও। প্রয়োজনে একটু সুস্থ্য হলে আবার তোমার ভাইকেই পাঠাব। গত তিন দিন আগে হঠাৎ ঘোড়দৌড়ের বাহানা করে পালিয়েছে। সে নিশ্চয়ই আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। আপনিও ছায়েমার মত এত পাগল সাজবেন না। আল্লাহ যখন তাঁর খাছ রহমতে আপনাকে ফিরিয়ে এনেছেন, তখন কয়েকদিন ভালভাবে বিশ্রাম করুন। ছায়েমা যেখানেই যাক না কেন, সে ঠিকই ফিরে আসবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা একবার দেখুন তো। কেমন ছিলেন আর এখন কেমন হয়েছেন! সব চিন্তা বাদ দিয়ে বিশ্রাম করুন। জিহাদ করতে হলে সুস্থতার প্রয়োজন। শক্তি ছাড়া লড়বেন কি করে?"

তৃষ্ণার কথাগুলো আমার নিকট ভালই লাগল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কিছুদিন এখানেই বিশ্রাম নেব এবং ছায়েমার জন্য অপেক্ষা করব। সে হয়ত ঘুরেফিরে আমার সন্ধান না পেয়ে আবার এখানেই ফিরে আসবে। এবার ফিরে আসলেই হয়...। তার তো যাবার কোন স্থান নেই। আশ্রয়ের জায়গা নেই। আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই। নিশ্চয়ই এখানেই ফিরে আসবে।

আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করতে লাগলাম– "হে আল্লাহ্! আমার জীবনের পাপরাশিকে তুমি ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্! তোমার প্রত্যেকটি হুকুম তোমার মর্জিমত ও হুজুর (সাঃ)-এর তরিকামত আদায় করার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ্! তোমার অসহায়া-অবলা ছায়েমাকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখ। হে আল্লাহ্! ছায়েমা আমার চোখের আলো, হৃদয়ের ধন। তাকে ফিরিয়ে দিয়ে তুমি আমার বিগলিত হৃদয়কে ঠান্ডা কর!"

আমি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময় হারুনী এসে আমার পার্শ্বে বসে বললেন, "খোবায়েব! একটি কথা বলতে এসেছি, শুনবে কি?"

সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণাও ওঘর থেকে চলে আসল। হারুনীর পার্শ্বে বসল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কথা বলবেন, বলুন।"

হারুনী মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলতে লাগলেন, "খোবায়েব! আমি যে প্রস্তাবটি তোমার কাছে পেশ করব, আশা করি এতে অমত করবে না। আমরা অনেক ভেবে-চিন্তে, আগপাছ দেখে-শুনে এ সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছি যে, তোমার সাথে ছায়েমাকে বিয়ে দিতে চাই। ছায়েমার চিন্তা-চেতনা, মান-মানসিকতা, বুদ্ধি-বিচক্ষণতা খুবই উন্নত। তাছাড়া সে একজন বীরাঙ্গনা নারী। রূপ-সৌন্দর্য্যে তার তুলনা হয় না।"

হারুনীর কথার ফাঁকে তৃষ্ণাও একটু আঁঠা লাগিয়ে দিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দু'জনকে খুবই মানাবে। যেমন সুশ্রী বর, তেমন রূপসী কনে। দু'জনের জন্য বাসর ঘর রচনা করে দিতে পারলে আল্লাহও খুশী হবেন। খুশী হবে আরো দশজন।"

তৃষ্ণার কথা শেষ হতে না হতে হারুনী বললেন, "আমি তোমার আম্মার সাথেও এ পরামর্শ করেছিলাম। এমনকি ছায়েমাও তখন উপস্থিত ছিল। তোমার আম্মা তো তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, এই মেয়ে যদি আমার পুত্রবধূ হয়, তবে তো ভালই হয়। এত সুন্দর ও উন্নত চরিত্রের অধিকারিনী মেয়ে ক'জন আছে।"

তৃষ্ণা বলল, "আমরা যেদিন আপনার বিবাহের আলাপ-আলোচনা করছিলাম, সেদিন ছায়েমার অন্তর ভেঙ্গে খান খান হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সে বারবার কনের পরিচয় জানতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। যখন শুনল কনে অন্য কেউ নয় স্বয়ং সে নিজেই, তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌবনের ঢেউ খেলতে শুরু করে। বিবাহের কথাবার্তার সামান্য পরশে তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল, এমন আর কোনদিন দেখিনি।"

উভয়ের কথা শুনে আমি বললাম, "শুনুন হারুনী সাহেব! আমি ছায়েমাকে সবসময় বোনের মর্যাদা দিয়ে আসছি। কোনদিন তার দিকে খারাপ নজরে তাকাইনি।"

হারুনী বললেন, "তোমাকে ওয়াজ করতে বলিনি। তুমি এতটুকু বল, আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি করবে না? তুমি এতদিন যে এই সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে বন-জঙ্গলে দৌড়া-দৌড়ি করেছ, এতি কি পর্দার খেলাফ হয়নি?"

আমি বললাম, "শোন বন্ধু! ছায়েমাকে আমি লাশের স্তূপ থেকে উদ্ধার করে এনেছি। তারপর পরিচয় হল সে আমার সহপাঠী। পিতা-মাতা ও ঘর-সংসারহারা অসহায়-অনাথিনী। বল তাকে কার জিম্মায় রাখব, কে নেবে তার দায়িত্ব? আমি সব ভেবে-চিন্তেই তাকে আমার কাছে রেখেছি। আর একটা কথা হল, পুরুষের উপর যেমন জিহাদ ফরজ, ঠিক তেমনি নারীদের উপরও তো জিহাদ ফরজ। এসব কারণেই তাকে আমার কাছে রাখতে হয়েছে। যাক ঠিক আছে আপনারা যখন বলছেন, আমার কোন আপত্তি নেই।"

[বিশ]

অশ্বারোহী ছায়েমা ও মাছুমা ব্যাঘ্রতাড়িত হরিণীর ন্যায় প্রাণপণ ছুটে চলেছে। জীবন যুদ্ধে পরিশ্রান্ত সৈনিকদ্বয়ের ক্লান্তির আবেশ মাত্র নেই। অশ্বের ঘুরাঘাতে নুড়ি পাথরগুলো এদিক-ওদিক ছিটকে পড়তে লাগল। ধুলাবালি উড়িয়ে ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করছে। পরনে সামরিক পোশাক, কোমড়ে বেল্ট কষানো, মাথায় হেলমেট, কটিদেশে পয়ঃপাত্র, স্কন্ধদেশে শোভা পাচ্ছে ক্লাশিনকভ, পায়ে জঙ্গল পাদুকা। অকুতোভয় সিপাহসালারের বেশে চলছে গ্রাম্য পথ-ঘাট মাড়িয়ে। রাত কেটে ভোর হল। ভোর কেটে সকাল। সকাল কেটে দুপুর। বিরামহীনভাবে চলছে তারা।

ঘোড়ার পদধ্বনিতে পথিকেরা গ্রীবা ঘুরিয়ে পশ্চাতে না তাকিয়ে পারছে না। এই বীর সৈনিকরা কারা? কোথা থেকে আসছে? লালফৌজ ওরা। সকলেই আতঙ্কগ্রস্থ। তাই সৈনিকদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে, কার উপর কখন চড়াও হয়! কখন কাকে ধরে নিয়ে যায়! কখন কাকে গ্রেফতার করে চাবুকাঘাতে প্রাণ সংহার করে কে জানে!

লাল ফৌজদের যমের মত ভয় পায় এখানকার মানুষ। তাদের জুলুম-অত্যাচারের কাহিনী জানে না এমন কেউ নেই। তাই জীবন নিয়ে অনেকেই পালাতে লাগল। অনাকাঙ্খিত সৈন্যের আগমনে সবাই শংকিত। ওরা দোষী-নির্দোষ, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার উপর জুলুম করে। তাই গ্রামের লোকেরা জীবন নিয়ে বনজঙ্গলে ও ঝোঁপ-ঝাড়ে আশ্রয় নিতে লাগল।

দুপুর ১২টা। পাবকদগ্ধা অংশুমালী রাগান্বিত হয়ে যেন সমুদয় বসুন্ধরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়ার ভাবনায় ব্যস্ত। শ্রমক্লান্ত ঘোটকদ্বয় মুখগহ্বর ও নাসারন্দ্রে প্রচুর ফেনপুঞ্জ নিঃসরণ করতে করতে ছটফট করতে লাগল। কোমলমতি ও স্নেহপরায়ণা ছায়েমার শ্যেণদৃষ্টি অশ্বের মুখের উপর পড়তেই যেন তার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হল। কে যেন বিষবাণ নিক্ষেপ করে তার কলিজা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোটক থামিয়ে বিশালাকৃতির এক মহীরুহের পত্রছায়ায় অবতরণ করল। তারপর গদী ও যিনমুক্ত করে সবুজ-শ্যামল প্রান্তরে ছেড়ে দিল। ঘোটক মনের আনন্দে কাঁচা ঘাস-পাতা ভক্ষণ করে জঠর জ্বালা নিবারণ করতে লাগল। ছায়েমার কটিদেশ থেকে বস্ত্রাঞ্চলের খাদ্যদ্রব্যগুলো বের করে মাছুমাকে নিয়ে খেতে লাগল। উদোম ভান্ড থেকে পানীয় পান করে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করল। তারপর পাদক মূলে মস্তক স্থাপন করে বিশ্রামে চলে গেল। মাছুমা ছায়েমাকে লক্ষ্য করে বলল, "অতীত জীবনে এ ধরনের ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়েছি বলে মনে পড়ে না আপু। অনেক আগেই কিছু খাওয়ার ইচ্ছে জেগেছিল, কিন্তু তোমার ভয়ে কিছু বলার সাহস পাইনি।"

মাছুমার কথা শুনে ছায়েমা মৃদু হেসে বলল, "আরে বোন! জিহাদের কাজে এর চেয়ে শত সহস্র গুণ বেশী কষ্ট করতে হয়। আল্লাহর নিকট ঈমান নিয়ে যেতে হলে ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে। এমনিতেই ঈমান নিয়ে যাওয়া যায় না। আল্লাহ ঈমানের পরীক্ষা নেন এভাবে-

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।' (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৫)।

মাছুমা! তুমি যদি আল্লাহর একজন ফরমারদার দাসী হতে চাও, তবে ক্ষুধা-তৃষ্ণাবরণ করেও জান-মাল ফসলাদীর ক্ষতি স্বীকার করে ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে এবং ছব্‌রে জামীল এখতিয়ার করতে হবে। এছাড়া উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার আশা করা বৃথা।"

ছায়েমার কথা শুনে মাছুমা বলে উঠল, "এটাই যদি ঈমানের পরীক্ষা হয়, তবে এর চেয়েও কঠিন পরীক্ষা দিতে, এমনকি ফাইনাল

পরীক্ষার জন্যও আমি প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে শহীদ হতেও আমার আপত্তি নেই।"

মাছুমার কথা শুনে ছায়েমা আনন্দে নেচে উঠল এবং আল্লাহর দরবারে কাতর সুরে দোয়া করতে লাগল, "হে আমার মাওলা! আমাদের জীবনের পাপরাশিকে তুমি আমলনামা থেকে মিটিয়ে দাও। তোমার হুকুম মত চলার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! আমরা অনাথিনী, হতভাগিনী, অসহায়িনী, অবলা নারী। তোমার পথে পা দিয়েছি; তুমি আমাদের পাকে সুদৃঢ় রাখ। হে আল্লাহ! অতীতে তুমি আমাদের উপর অনেক অনেক রহম করেছ, যা কোনদিন কল্পনাও করিনি। ভবিষ্যতেও করবে বলে আশা রাখি। হে আমার মাওলা! তুমি আমার চোখের মণি, আমার পথপ্রদর্শক খোবায়েব জাম্বুলীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। তুমি আর কত আমাকে পথে পথে ঘুরাবে? তুমি তো ইচ্ছা করলে তার সন্ধান দিয়ে দিতে পার। অতএব খোবায়েবকে পাইয়ে দাও। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।"

ছায়েমা ও মাছুমাকে দেখে এলাকার লোকজন লাল ফৌজ ও বলসেভিক মনে করে ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছিল। এর মধ্যে দ্বীনদার ও পরহেজগার লোকদের সংখ্যাই বেশী ছিল। তাছাড়া মহিলারাও নিজ নিজ সন্তানদের কোলে-কাঁখে তুলে পালাচ্ছিল। কারণ, লাল ফৌজের জুলুম-অত্যাচার দ্বীনদার-পরহেজগারদের উপরই বেশী হত। মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত লুন্ঠন করে শহীদ করে দিত। মাছুম বাচ্চারাও তাদের হাত থেকে রেহাই পেত না।

এলাকার কমিউনিস্টপন্থী যুবকরা এসে নির্ভয়ে ছায়েমাদের পার্শ্বে ভীড় জমাতে লাগল। এক পর্যায়ে একজন যুবক বলে উঠল, "স্যার! এই দেখুন আপনাদের দেখে রুহানীরা কেমন করে পালাচ্ছে!"

একথা শুনে ছায়েমার কোমল অন্তরে দয়ার উদ্রেক হল। সে অশ্রুভেজা নয়নে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, ভাঙ্গা সুরে বলল, "তোমরা গিয়ে ওদেরকে ফিরিয়ে আন। অন্যথায় ব্রাশফায়ারে তোমাদের বক্ষদেশ ঝাঁঝরা করে দেব। জীবনের যবনিকা এখানেই ঘটাব।"

ছায়েমার হুকুম পেয়ে মহোল্লাসে এলাকার যুবকরা দলে দলে ঐ সমস্ত পালায়নপর লোকদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য ছুটাছুটি,

ডাকডাকি, হাঁকাহাঁকি করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পলায়নপরলোকদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে এল ছায়েমার নিকট।

ছায়েমা সবাইকে লক্ষ্য করে সুললিত কণ্ঠে, মধুর বচনে, মার্জিত ভাষায় বলতে লাগল–

"প্রিয় এলাকাবাসী! তোমরা আমাদেরকে ভয় পেয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। এটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। আমরা তো দেশে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য কাজ করি। আমরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্রপ্রহরী। আমরা নিরীহ মানুষের হত্যার জন্য আসিনি। আমরা জনগণের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধান করতে এসেছি। আমাদের শান্তির দূত মহানুভব লেনিন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই এসেছেন। সমস্ত ধর্ম ও মতাদর্শের উর্ধ্বে আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির নীতিমালা। কাজেই আপনারা আমাদেরকে ভয় পাবেন না। আমরা আপনাদেরই খাদেম। আপনারা নিজ নিজ বাড়ীতে পরম সুখে বসবাস করতে থাকুন। আমরা এসেছি শুধু পরিদর্শনের জন্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে যাব।"

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে আসছে। এখনো যোহর নামায পড়া হয়নি। আর ওদের সামনে নামায পড়া সমীচীনও নয়। কারণ, ওরা তো তাদেরকে লালফৌজ মনে করছে। নামায পড়তে দেখলে সন্দেহ করবে। তাই ঘোড়াগুলোকে সবুজ-শ্যামল প্রান্তর থেকে তাড়িয়ে এনে পানি পান করিয়ে যিন কষে নিল। ঘোটকের বুঝতে বাকি নেই যে, আবার তাদেরকে হারিয়ে যেতে হবে নিরুদ্দেশে।

ছায়েমা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

অশ্বারোহীনীদ্বয় ঘোড়া দাবড়িয়ে চলছে অজানার উদ্দেশ্যে। কিছুদূর অগ্রসর হতেই রাস্তার সরলতা হ্রাস পেতে লাগল। আঁকাবাঁকা পথ, পাহাড়ী অঞ্চল, উঁচু-নীচু রাস্তা। প্রায় তিন ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করলেই জাবালার বনভূমি দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে গহীন বন।

জাবালার বনভূমি নিয়ে কবিরা কত যে কবিতা রচনা করেছে আর সাহিত্যিকরা লিখেছেন প্রবন্ধ ও গল্প। জাবালার দামী কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে

গিয়ে কত কাঠুরিয়ার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে হিংস্র প্রাণীরা আর কত পথিকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বন দস্যুরা, তার কোন হিসাব নেই।

জাবালার বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে নির্ঝরণী। সকাল-সন্ধ্যা কল কল তানে বইতে থাকে নদীগুলো। সবগুলো নদীই খরস্রোতা। এর মধ্যে সাইবা নদীই প্রসিদ্ধ।

সাইবা নদীর অববাহিকায় স্বগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুকান্দুজের বিশাল কৃষ্ণ পর্বতমালা। কুকান্দুজের কৃষ্ণশিলা বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। প্রাচীনকালের মূর্তিকর ও শিল্পীরা এসব কৃষ্ণশিলা দ্বারা বিশালকৃতির মূর্তি ও বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার এবং পাত্র তৈরী করত। বহুদূর থেকে মসিকৃতির প্রস্তরগুলো দানবের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

ছায়েমা মাছুমাকে নিয়ে ঝর্ণায় অজু করে নামাজ আদায় করল। তারপর শুকনো রুটি পানিতে ভিজিয়ে আহার করে নিল।

পড়ন্ত বিকাল। ঘোড়া আগের মত ততটা দৌড়াতে পারছে না, কেবলই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। দিন-রাতের অক্লান্ত পরিশ্রমে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে আরো কিছু পথ চলা যাবে স্বাভাবিক গতিতে। এ অবেলায় গহীন বনে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। কারণ, সেখানে রয়েছে নানা প্রজাতির হিংস্র প্রাণী। যে কোন মুহূর্তে অশ্বসহ উদরস্ত করতে পারে এমন প্রাণী অনেকই রয়েছে। ঘন বন। লতাগুল্মে ভরা। দিনের বেলায়ও অন্ধকার। তাছাড়া সবচেয়ে বড় মুশকিল হল, দিক নির্ণয় নিয়ে। তাই রাত যাপনের জন্য কোন একটা আশ্রয়স্থল পাওয়া যায় কিনা আমরা তার সন্ধানে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগলাম।

ছায়েমা যে পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে, এটা কোন প্রসিদ্ধ রাস্তা নয়। দু'ধারে রয়েছে উঁচু-নীচু টিলা, ঝোঁপঝাড় ও কংকরময় মাটি। এখান থেকেই বন ক্রমশ ঘন হয়ে বিস্তৃত অরণ্যে গিয়ে মিশেছে। বাড়ীঘর নেই বললেই চলে। সামনে কুয়াশায় ঢাকা, মনে হয় এই বুঝি সন্ধ্যা নেমে এল। সূর্যাস্তের আর বেশী বাকি নেই। ছায়েমা সম্মুখের দিকে লক্ষ্য করে দেখল, এক বৃদ্ধ কতগুলো মেষ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল যে, হয়ত আশপাশে কোন বস্তি রয়েছে। না

হলে এ বৃদ্ধ এই পড়ন্ত বেলায় মেষপাল হাঁকিয়ে কোথায় যাচ্ছে। যাক, কোন বস্তির সন্ধান পেলে রাতে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই হবে।

মেষপালক বৃদ্ধ সোলাইমান অশ্বের পদধ্বনি শুনে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, দু'জন অশ্বারোহী তাঁর দিকেই ধাবিত হচ্ছে। ভেবেছিলেন হয়ত কোন বনদস্যু হবে। তাছাড়া এ জনমানবহীন পথে অসময়ে আর কে আসবে। মেষ পাল ফেলে রেখে পালানো সম্ভব নয়। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মেষ পাল এলোপাতাড়িভাবে দাবড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করে। দেখতে না দেখতে অশ্বারোহীরা একেবারে বৃদ্ধের পশ্চাতে এসে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে এরা তো লাল ফৌজ। দেখে আরো ভয় পেয়ে গেলেন সোলাইমান।

বৃদ্ধ লোকটির হাবভাব দেখে ছায়েমা বুঝতে পারল যে, লোকটি তাদেরকে দেখে ভয় পাচ্ছে। ছায়েমা আরো একধাপ এগিয়ে বৃদ্ধকে বলল, "বাবা! একটু থামুন।"

ডাক শুনে বৃদ্ধ থেমে গেলেন।

ছায়েমা অশ্ব থেকে অবতরণ করে জিজ্ঞেস করল, "বাবা! আপনি কি এই অরণ্যের আশপাশেই থাকেন?

লোকটি ঈঙ্গিতে বললেন, "হ্যাঁ, ঐ টিলার ওপারেই আমার বাড়ী। এখানে কোন বস্তি নেই। আমি একাই বসবাস করি।"

ছায়েমা আলাপ করতে করতে বৃদ্ধ লোকটির বাড়ীর দিকে চললো। ততক্ষণে সূর্য্য পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। অন্ধকারও আস্তে আস্তে নেমে আসছে। চারদিকে নীরব-নিস্তব্ধ।

ছায়েমা ও মাছুমা কূপ থেকে পানি তুলে অজু করে নামায আদায় করল। বৃদ্ধ সোলাইমান মেষগুলো খোয়াড়ে তুলে নামায পড়লেন। সৈনিকদের নামায আদায় করতে দেখে বৃদ্ধের মনে আশার আলো জাগে, এরা লাল ফৌজ নয়; এরা মুসলমান। হয়ত সেনাবাহিনীর পক্ষ ত্যাগ করে পালিয়েছে। মুজাহিদদের খোঁজে এদিকে ছুটে এসেছে।

বৃদ্ধের নামায শেষ হলে কুঁড়ে ঘরে বিছানা পেতে ছায়েমা ও মাছুমাকে বসতে দিলেন এবং সামান্য দুধ ও কয়েকটি রুটি এনে তাদের সামনে দিয়ে বললেন, "বাছারা! এ হাল্কা নাস্তাটুকু খেয়ে নাও। পরে খানার ব্যবস্থা কর।"

বৃদ্ধের মেহমানদারি দেখে ছায়েমা খুবই খুশী হল।

যে ঘরে তাদেরকে বসতে দেয়া হল, সে ঘরটি লতাপাতায় নির্মিত। তিনদিক লতাপাতার বেড়া আর একদিক দরজা। তাছাড়া আরো দু'টি ঘর রয়েছে। এক ঘরে বৃদ্ধ তার পত্নীকে নিয়ে থাকেন। আরেক ঘরে মেষ রাখেন আর সামান্য একটু জায়গায় রান্না-বান্না করেন।

এই বিপদ মুহূর্তে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে ছায়েমা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর শোকর আদায় করল।

রাতে ঈশার নামায ও আহারাদী সারল সবাই। বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, "বাবারা! তোমরা কোথা থেকে এলে এই অরণ্যে, আর যাবেই বা কোথায়? এ এলাকায় তো কোন লোকজন বসবাস করে না। তোমাদের সম্মুখে শুধু মাইলকে মাইল অরণ্য। এই পথে ভুল করে আসনি তো?"

ছায়েমা উত্তরে বলল, "চাচা! আপনার প্রশ্নের উত্তরে কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। তবে আপনি যদি আমাদের অভয় দান করেন, তবে কিছু বলার চেষ্টা করব। আমারও জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি এ বৃদ্ধ বয়সে কেন ডেরা ছেড়ে এ জনমানবহীন প্রান্তরে বসবাস করছেন?"

বৃদ্ধ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, "বাবা, আমি একজন অসহায়, দরিদ্র ও মজলুম মুসলমান। ঈমানের হেফাযত করতে গিয়ে এ জনমানবহীন স্থানে হিজরত করেছি। আমার দু'টি ছেলেকে বলসেভিকরা নির্মমভাবে শহীদ করে দিয়েছে। ওরা আনোয়ার পাশার গ্রুপের মুজাহিদ ছিল। উভয়ে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করত। দেশ-জাতি ও দ্বীনকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। বলসেভিকরা আমার বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। নিরুপায় হয়ে আমি আমার মেষপাল নিয়ে এখানে এসে কোন রকমে আশ্রয় নিয়েছি। তাছাড়া এপথ দিয়ে অনেক সময় মুজাহিদরা আসা-যাওয়া করত। অনেক মুজাহিদও ওইসব পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। আমি ওদের খাদ্য সরবরাহ করে থাকি। মেষ দোহন করে ওদের কাছে নিয়ে যাই। হাট-বাজার করে এখানে রাখি। ওরা দু'-একদিন পরপর এখান থেকে নিয়ে যায়। যতদিন আল্লাহ্ আমাকে জীবিত রাখেন, ততদিন মুজাহিদদের খেদমত করে যাব।"

ছায়েমা বৃদ্ধের কথা শুনে বলল, "জনাব! আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ দেখিয়ে সঠিক স্থানেই নিয়ে এসেছেন।"

এই বলে ছায়েমা তার জীবনের দুঃখের সমস্ত কাহিনী এক এক করে বলতে লাগল।

সোলাইমান পত্নী ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছায়েমার কথাগুলো কান পেতে শুনছিলেন। তিনি অধৈর্য হয়ে এক পর্যায়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাছারা! তোমাদের নিবাস কোথায়?"

ছায়েমা ঃ জাম্বুলের পার্শ্ববর্তী এলাকা মালাকানে আমার বাড়ি।

বৃদ্ধা ঃ জাম্বুলের দু'একজন অধিবাসীর নাম বলতে পার ?

ছায়েমা ঃ হ্যাঁ পারি। জামেউল উলুম মাদ্রাসার মহাপরিচালকের ছেলে খোবায়েব আমার ছাত্রজীবনের বন্ধু। আমরা একসাথে হিফজ জামাতে পড়েছি।"

বৃদ্ধা কেঁদে বললেন, খোবায়েব বেঁচে আছে? সে তো আমার ভাইয়ের ছেলে।"

বৃদ্ধ সোলাইমানও কেঁদে ফেললেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, "শুনেছি, সেও নাকি মুজাহিদ। কিন্তু অদ্যাবধি তার সাথে কোন সাক্ষাত নেই। শুনেছি তার আম্মা নাকি তার জন্য পাগল হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। আহ্, কেমন পর্দানশীল দ্বীনদার পরহেজগার ছিলেন। আজ পুত্রশোকে পথে পথে ঘুরছেন।"

বৃদ্ধার কথা শুনে ছায়েমা বলল, "আম্মি! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র খোবায়েবের উছিলায়ই আমি প্রাণে বেঁচে আছি। রাতের অন্ধকারে লাশের স্তূপ থেকে সে-ই আমাকে উদ্ধার করেছে। ওর আম্মাকেও খুঁজে বের করেছে। এখন আমি তাঁর নিকট থেকেই এসেছি। আমি যে সমস্ত অপারেশনের কথা বলেছি, ঐসব অপারেশন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র খোবায়েবের কমান্ডিং-এ হয়েছে। তিনি আমাকে ও তাঁর আম্মুকে তার বন্ধু তোরাব হারুনীর বাসায় রেখে আনোয়ার পাশার সন্ধানে বের হয়েছে। আজ প্রায় দেড় মাস গত হতে চলেছে এখনো ফিরে আসেনি। আমি তাঁর সন্ধানেই বের হয়েছি। দেখি তার সাক্ষাত মিলে কি-না! আমার মনে হয়, এ অরণ্যভূমিতেই তাকে পাওয়া যাবে। সে হয়ত এখানেই আশ্রয় নিয়েছে।"

বৃদ্ধা বললেন, “কতদিন হয় খোবায়েবকে দেখি না। তখন মক্তবে পড়ত। এখন দেখলে হয়ত তাকে চিনতে পারব না। অনেক মুজাহিদ তো এখানে এসেছে। সেও এসেছে কিনা কে জানে। আসলেও হয়ত পরিচয় না পাওয়ার কারণে চিনতে পারিনি।”

ছায়েমা বলল, “আচ্ছা দু'-একদিনের মধ্যে কি মুজাহিদরা এখানে আসার সম্ভাবনা আছে?”

বৃদ্ধ বললেন, “তা তো বলা যায় না। শুনেছি ওরা নাকি জঙ্গলের অনেক গভীরে চলে গেছে। আজ বেশ ক'দিন হয় তাদের কোন আনাগোনা লক্ষ্য করছি না।”

সোলাইমান পত্নী বললেন, “বাবা! তোমরা অধৈর্য হয়ো না। গরীবালয়ে এসেছ, এখানে বিশ্রাম নিতে থাক। এখানে বলসেভিকদের কোন আনাগোনা নেই। নেই লাল ফৌজের ভয়। তোমরা দ্বীনের মুজাহিদ। তোমাদের খেদমত করতে পারলেই আমরা ধন্য। দেখি বাছার সন্ধান পাই কিনা।”

ছায়েমা বলল, “ঠিক আছে আম্মি, আমরা তো অসহায়, নিরাশ্রয়। যাবই বা কোথায়। এখানে থেকে প্রতিদিন অরণ্যে তন্ন তন্ন করে দেখব পলাতকটার খোঁজ পাই কিনা।”

আচ্ছা! মুজাহিদরা গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে কেন, তা কি বলতে পারেন?”

ঃ হ্যাঁ, উলামায়ে কেরামের কলঙ্ক কতিপয় আলেম নামধারী আনোয়ার পাশার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ‘কেউ যেন মুজাহিদের সাহায্য না করে, তাদেরকে যেন ধরে লাল ফৌজের হাতে তুলে দেয়। মুজাহিদরা কিনা বাগী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও সন্ত্রাসী। এদেরকে ধরে দিলে নাকি অনেক ছওয়াব হবে।’

এতে সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয়ে মুজাহিদদের ধরিয়ে দিতে ব্যস্ত হয় পড়েছে। ধরিয়ে দিয়ে অনেক টাকাও পাচ্ছে। মুজাহিদরা ধরা পড়ার ভয়ে জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

[একুশ]

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা, দুপুর ও ভোর-বিহানে বুকাইলীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা এসে আমার কাছে ভিড় জমাচ্ছে। কেউ জরুরী মাসআলা-মাসায়েল জানতে চায়। কেউবা জিহাদের বিভিন্ন কলাকৌশল শিখতে চায়। কেউবা আবার বিভিন্ন অপারেশনের কারগুজারী, খোদায়ী মদদের কথা শুনতে চায়। আমি যথাসাধ্য তাদের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করছি। ওরা আমার কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে চলছে। এখানে যদিও শ্রোতার অভাব নেই; কিন্তু আমার মন শুধু একজন শ্রোতাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। সকলের চেহারায় আমার মনের মানুষটিকে খুঁজে বেড়ায়; কিন্তু সে ছবিটির দেখা পাচ্ছি না। আমার বিরহ-যাতনা বুকে নিয়ে সে পথে পথে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আহ্, তা কি করে আমি বরদাস্ত করতে পারি? আমার অন্তর ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। হৃদয় আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। ছায়েমার বিরহে আমার চোখ থেকে সর্বদাই অশ্রু ঝরছে। তা ফেরাতে পারছি না। আমার বিগলিত অন্তরে একটি কথাই বারবার আঘাত হানতে থাকে যে, হায়! এতদিন পর সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে হাজার প্রতিকূলতার পাহাড় মাড়িয়ে ফিরে এসেছি। আজ সে আমাকে খুঁজতে গিয়ে আবার হারিয়ে গেল। দেখা হয়েও হল না। আজ সে কোথায় কি অবস্থায় আছে, কিছুই জানতে পারছি না। কখন জানি কোন মুছিবতে নিপতিত হয়! এসব চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। খানাপিনা, ঘুম ও আরাম-আয়েশ দূর হয়ে গেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'ছায়েমা! ও ছায়েমা তুমি কোথায় ঘুরছ? আমি না এখানে। ফিরে এসো আমার উজাড় গৃহে, হৃদয় মন্দিরে। আমার অন্তরের সবগুলো অর্গল খুলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি ফিরে এসো! ফিরে এসো বোন!'

এক সময় আমার আবোল-তাবোল বকাবকি শুনে আল্লামা ইসমাঈল কারাভী আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা খোবায়েব! তোমার কী হয়েছে? একটু খুলে বল না।"

আমি ইসমাঈল কারাভীকে সব ঘটনা অদ্যোপান্ত খুলে বললাম।

তিনি বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর মস্তক উত্তোলন করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবা! কালবিলম্ব না করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তার খোঁজে বেরিয়ে যাও। যে করেই হোক তার সন্ধান কর। এ-ই তো আমাদেরকে উদ্ধার করে এনেছিল। হায় তার সাথে এতটুকু পরিচয় হওয়ার আগেই চলে গেল।"

কথাগুলো বলার সময় কারাবীর অশ্রুতে বক্ষদেশ প্লাবিত হচ্ছিল। পাগড়ীর অঞ্চলে চোখ দু'টি মুছে আবারও বললেন, "যাও বাবা যাও! দেরি কর না... ।"

ফকীহুল উম্মাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমি তোরাব হারুনীকে ডেকে বললাম, "শোন দোস্ত! ছায়েমার বিরহে আমি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। তাকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না। যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। ভাই হারুনী! জলদি করে আমাকে একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দাও।"

হারুনী বললেন, "খোবায়েব! তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন। তুমি না একজন মুজাহিদ! বিপদে ধৈর্যহারা হতে নেই। ছবর কর, পেরেশান হয়ো না। আজই তোমার জন্য একটি ভাল ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যদি ভাড়া দিতে হয়, তাও দেব। তুমি একটু ধৈর্য ধর।"

পরদিন প্রত্যুষে হারুনী তার এক প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে লাল রঙের সুস্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ একটি তাজি ঘোড়া নিয়ে এলেন এবং বললেন, "তোমার কথা শুনে সবাই ঘোড়া দিতে রাজি। কেউ ভাড়া নিতে রাজি নয়। সবাই বলে, আমারটা নিন, এটা ভাল হবে। তাই কয়েকটা থেকে বাছাই করে এটা নিয়ে এলাম।"

এদিকে আমার যাওয়ার কথা শুনে তৃষ্ণা ভোর রাতে তার রান্না শেষ করেছে। সে তাড়াতাড়ি খানা এনে বলল, "ভাইজান, না খেয়ে যাবেন না কিন্তু। আগে খানা খেয়ে নিন।"

আমার খানা শেষ হলে কিছু রুটি ও ভুনা গোস্তের একটি পুটুলী এনে সামনে রেখে বলল, "রাস্তায় এগুলোর দরকার পড়বে। কোথায় না কোথায় যান। এগুলোতে কমপক্ষে দু'দিন চলবে। নষ্ট হবে না। আর যদি ছায়েমাকে পেয়ে যান, তবে ওকে নিয়ে দু'জনে খাবেন। ওকে কিন্তু সাথে নিয়েই আসবেন। আমি নিজ হাতে তাকে বউ

সাজাব। মনের মত করে সাজাব।”

তৃষ্ণার কথা শুনে আমার মলিন মুখেও হাসি ফুটে উঠল। তোরাব হারুনী আমার পকেটে বেশকিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, “এগুলো নিয়ে যাও, কাজে আসবে।”

সকলের নিকট থেকে বিদায় ও দোয়া নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে পাড়ি জমালাম অজানার সন্ধানে। বন-বাদার, মাঠ-ঘাট, গিরি-কান্তার, ধূসর মরু ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে আমার ঘোড়া চলছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। কোথাও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই। নেই নিরাশার ছোঁয়া। আছে শুধু এক সাগর বেদনা। তাই হৃদয়ের বীনার তারে বেজে উঠল সেই রাগিনী–

“নায়াবাম ওরা ইয়া নায়াবাম, জুছতে জূয়ী মীকুনাম
হাছেল আয়াদ ইয়া নাআয়াদ আরজুয়ে মীকুনাম।”

অর্থাৎ– হে প্রিয়া! আমি তোমাকে পাই বা না পাই, তালাশ করতেই থাকব, করতেই থাকব। তোমাকে অর্জন করতে পারি আর না পারি আশা করতেই থাকব, করতেই থাকব।

“বারে বারে খোজি তোরে, ধরা নাহি দাও মোরে
চোখের জলে শরীর ভিজাই, খুঁজিয়া না আমি তারে পাই।”
“নারীরা নিষ্ঠুর জাতি, কচি প্রেমে টানল ইতি।
বুক চিরিয়া কাহাকে দেখাই, খুঁজিয়া না আমি তারে পাই।”
“আগে যদি জানতাম ওরে, ছেড়ে যাবে তুমি মোরে
তোমার প্রেমে মজিয়া না যাই, খুঁজিয়া না আমি তারে পাই।”

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে এল শোক গাঁথা। এদিকে ঘোটক চলছে তো চলছেই। একটানা কয়েক ঘন্টা। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল। যোহরের নামায এখনো পড়িনি। সঙ্গে যে পানি তা দিয়ে অজু করলে খাবারের পানির সংকট দেখা দেবে। তাই অশ্ব থেকে অবতরণ করে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলাম। তারপর দু'টি রুটি খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করলাম। এ অসময়ে ঘোটকটি নাসিকারন্দ্রের ফেনপুঞ্জ নিষ্কাশনপূর্বক খানিকটা বিশ্রাম করে নিল।

আমি নামাযান্তে অশ্বে সওয়ার হয়ে আবার সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। এলাকাটা অনেকটা পাহাড়ী। বড় কোন পাহাড় না

থাকলেও বড় বড় টিলা রয়েছে প্রচুর। অনুর্বর, কঙ্করময় প্রান্তর। শস্য খামার নেই বললেই চলে। তবে ফল-ফলাদির কিছু বাগান পরিলক্ষিত হল। সামান্য ফল-ফলাদির চাষাবাদ ও পশু পালনই তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। এই দিয়েই সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন মেটায়। শিক্ষা একেবারেই নেই। মুসলমান খুবই নগণ্য। এ এলাকাটি উপাজাতিদের আবাস। ধর্ম-কর্মের বালাই নেই। নেই ধর্মচর্চা। তবে উপজাতিরা মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সবাই মিলে-মিশে দিন যাপন করছে। সবাই সরল প্রকৃতির মানুষ।

সবিতা দুনিয়াবাসীকে আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে বিদায় নেয়ার পালা। পশ্চিমাকাশে লালিমা ছড়িয়ে বিদায় বার্তা জানাচ্ছে সে। কোথায় যাব অচেনা পথে? তাই এ পল্লীতেই রাত যাপন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ক্রমশই অন্ধকার ঘনীভূত হতে লাগল। রাখাল ছেলেরা মেষ, ছাগল, গাঁধা, ভেড়া নিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরছে। পাখ-পাখালিরাও যার যার নীড়ে আশ্রয় নিতে শরু করেছে। শ্যামা-পাপিয়ার গানও থেমে গেছে। কুলবধূরা সন্ধ্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন সন্ধ্যাপূজা।

বিরাট এলাকা জুড়ে তাদের কোন উপাসনালয় দৃষ্টিগোচর হল না। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে বুড়া-বুড়ি, যুবক-যুবতীরা দল বেঁধে এক বৃক্ষতলে জমায়েত হল। এক তরুণী একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই প্রদীপটির চারপার্শ্বে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন বলার সাথে সাথে সবাই চারদিক ঘুরতে লাগল। কয়েক চক্কর দিয়ে সবাই হাত তালি দিতে লাগল। সবাই উক্ত কুমারীর চারপাশে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। একজন বৃদ্ধ এসে বাতিটি নিভিয়ে দিলে সবাই গৃহাভিমুখে যাত্রা করল।

আমি অজু করে উক্ত বৃক্ষটির এক পার্শ্বে মাগরিবের নামায আদায় করে তাছবিহাত পাঠ করছিলাম। আমাকে উপাসনারত দেখে লোকগুলো আমার চারপাশে এসে ভীড় জমাল। একজন প্রবীণ লোক আমাকে বলল, "বাবা! তোমার পরিচয় কি? এ রাতে এখানে আসলেই বা কোথেকে? যদি মনে কিছু না কর, তবে আমাদের মেহমানদারি গ্রহণ করতে পার।"

আমি বললাম, "রাতে তো কোথায় যাওয়ার জায়গা নেই। এদিকেই রাতযাপন করতে হবে।"

তারা আমাকে বৃদ্ধের বাড়ীতে নিয়ে চলল। আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "জনাব! আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

তিনি বললেন, "আমার নাম শ্রীনিধি নিনাল তুংগা। আমিই এ মহল্লার সর্দার।"

বৃদ্ধের বয়স ষাটের কোঠায়। আচার-ব্যবহার খুবই অমায়িক। তিনি চাকরকে ডেকে আমার অশ্বটির যত্ন করতে বললেন।

কিছুক্ষণ পর মহল্লার ধনী-গরীব, ছোট-বড় সকলে এসে সর্দারজীর দহলিজে জমায়েত হল। সর্দারজী সবাইকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এখানে কেন?"

আগন্তুকদের মধ্য থেকে একজন বলল, "আমরা মেহমানকে দেখতে এসেছি এবং তাঁর থেকে কিছু ধর্মোপদেশ শুনব।"

সর্দারজী সবাইকে বসতে নির্দেশ দিয়ে আমাকে বললেন, "বাবা! আমরা তো বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তাঁরই অর্চনা করি। তারই স্তুতি গাই। তোমার উপাসনা দেখে মনে হয় তুমি ভিন্ন ধর্মের লোক। তোমার ধর্ম সম্পর্কে আমাদের কিছু শোনাও?"

সর্দারজীর কথা শুনে আমি বললাম, "হ্যাঁ, ধর্মের কথা যদি কেউ জানতে চায়, শুনতে চায়, তবে বলতেই হবে। আমি মুসলমান, আমার ধর্মের রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আল্লাহর উপাসনা করতে শিখিয়েছেন।"

তারপর মুসলমানের আকীদা-বিশ্বাসের উপর আলোচনা করলাম। এক এক করে সবগুলো কালিমা পাঠ করে তার অর্থ বুঝিয়ে বললাম। কিরাতের সুরে কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনালাম। যার অর্থ—

"তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহৎ। তারা (মুশরিক) যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে

ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।" (সূরা- হাশর ঃ আয়াত ২২-২৪)।

আমি বললাম, "আমার আল্লাহ্ আরো বলেন-

'বলুন, ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।" (সূরা- আলে ইমরান ঃ আয়াত ২৬-২৮)।

উক্ত আয়াতগুলো তিলওয়াত করে তার মর্মবাণী বুঝলাম। ইসলামের ধর্ম বিশ্বাস কি কিং, কি ধরনের বিশ্বাস রাখলে মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়, তাও বুঝানোর চেষ্টা করলাম। বললাম, স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ। আর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল মুসলমান। আর সর্বনিকৃষ্ট হল কাফির (আল্লাহকে অস্বীকারকারী), মুশরিক (আল্লাহর সাথে শরীককারী) আর মুসলমানদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হল মুনাফিক। এরা চতুষ্পদ জন্তু থেকেও অধম। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

আমার কথা শুনে সর্দার শ্রীনিধি নিনাল তুংগা বললেন, "বাবা! তোমাদের ধর্মের সব বাণীই সুন্দর। তবে আমাদের ধর্মও কম সুন্দর নয়। আমাদের ধর্মে জীব হত্যা মহাপাপ। তাই আমরা সবসময় নিরামিষ খাই। কোন প্রাণীকে হত্যা করি না।"

আমি বললাম, "সর্দারজী! আপনার ধর্ম আপনাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে পারে না। আপনি যার অর্চনা করেন, তিনি আপনাকে মহব্বত করেন না। যেমন, আপনি যার সৃষ্টি সাপ, বিচ্ছু, ভিমরুল, পিপিলিকা, মশা, মাছি ও আরো অনেক প্রাণী যারা মানুষকে কষ্ট দেয়, এমনকি মেরে ফেলে, এদের কামড় খেয়েও কাঁদতে পারবেন না এবং কিছু করতেও পারবেন না, মুখ বুজে তা বরদাস্ত করতে হবে।

আর আমাদের প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে আমাদের ভালবাসেন। আমাদের কোন ক্ষতি হলে বা আমাদের কষ্ট দিলে আল্লাহ তা বরদাস্ত করেন না। তাই আমাদের হুকুম দিয়েছেন যে, আমার কোন মাখলুক যদি তোমাকে কষ্ট দেয়, তবে তাকে হত্যা করো। এতে তোমাদের পাপ হবে না। তাই আমরা মানুষের শত্রু সাপ পেলে মেরে ফেলি, বিচ্ছু পেলে মেরে ফিলি, পাগলা কুকুর মেরে ফেলি, এমনকি মানুষ হয়েও যদি কেউ মানুষকে হত্যা করে, তাকেও আমরা হত্যা করি। মুসলমান আল্লাহর বন্ধু। আর বন্ধু হয়ে বন্ধুর কষ্ট সইতে পারেননি বিধায় হুকুম দিয়েছেন দুশমনকে হত্যা করতে।”

আমার আলোচনার পর অনেকেই বলে উঠল, যুবকের কথাগুলো সত্যিই যুক্তিযুক্ত। ইসলাম সত্য ধর্ম, মানবতার ধর্ম, ইনসাফের ধর্ম। তাদের ধর্মে তাদের ইজ্জত-সম্মান ও মর্যাদার গ্যারান্টি রয়েছে।

এমন সময় এক যুবক বলে উঠল, “হে যুবক মুসাফির! আমাদেরকে তোমার ধর্মে দীক্ষা দেবে কি? আমরা ইসলাম গ্রহণ করতে চাই।”

আমি বললাম, “তোমরা যারা মুসলমান হবে, তারা আমার সাথে সাথে কলেমা পাঠ কর।”

আমি উচ্চ আওয়াজে কলেমা পাঠ করতে শুরু করি। ওরা সমবেত কণ্ঠে কালেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হল। তাদের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ, ৩ জন মহিলা। তাদেরকে নিয়ে রাত ২টা পর্যন্ত ঈমাম-আকীদা, পাক-নাপাকি, হালাল-হারাম ও জায়েজ-নাজায়েজ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে বিদায় দিলাম। সবাই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতে লাগল। আমিও সর্দারজীর মেহমানখানায় শুয়ে পড়লাম।

বিছানায় শুয়ে আমি এপাশ-ওপাশ করছি। চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। শুধু একই চিন্তা- একই ভাবনা। কি করে ছায়েমাকে খুঁজে পাব। আমার অন্তর ভেঙ্গে-চুরে একাকার হয়ে যাওয়ার উপক্রম। খানাপিনা সবই আমার থেকে বিদায় নিয়ে গেল। এমন অস্থিরতা ও পেরেশানির মধ্যদিয়ে রাত কেটে গেল।

পাখিরা উড়ছে, মোরগ ডাকছে, রাঙ্গারবি পূর্ব আকাশ রাঙ্গিয়ে

উদিত হচ্ছে। শ্রমজীবি মানুষেরা জাগছে। এমন সময় আমি নামায আদায় করে বিছানায় বসে তিলাওয়াত করতে লাগলাম। নওমুসলিমরা গাত্রোত্থান করে সোজা চলে এল সর্দারের বাড়ী। সকলেই মনোযোগের সাথে তিলাওয়াত শুনছিল।

এভাবে কিছু সময় কেটে গেল। ছায়েমার খোঁজে বেরুতে হবে। এমন সময় সর্দারজী খানা এনে হাজির করলেন। আমি খানা খেয়ে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার বিদায় হওয়াটা তাদের জন্য ছিল এক বেদনাদায়ক বিষয়। আবার ফিরে আসার ওয়াদা দিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটালাম।

[বাইশ]

ছায়েমা পরদিন সকালে বৃদ্ধ সোলাইমানকে বলল, "ফুপাজান! আমরা একটু অরণ্যভূমি ঘুরতে চাই।"

বৃদ্ধ রাগান্বিত হয়ে বললেন, "আরে কী বলছ? তোমরা আমাদের মেহমান। আমরা তোমাদের সব প্রয়োজন পুরা করার চেষ্টা করব। সেখানে মুজাহিদরা আছে সঙ্গবদ্ধভাবে। তা না হয় থাকতে পারত বুঝি? সেখানে রয়েছে বড় বড় বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, গরিয়াল, গয়াল, শিপ্পাঞ্জি আরো কত প্রজাতির বন্য হায়েনা। তুমি ওখানে গিয়ে বাঘের খোরাক হবে। আমি তা কিছুতেই মানতে পারি না। দেখি মুজাহিদরা এদিকে আসে কি না। যদি আসে, তবে তোমার খোবায়েবের সন্ধান নেব।"

বৃদ্ধ সোলাইমানের কুটিরে তাদের তিনদিন কেটে গেছে। কোন মুজাহিদ এদিকে আসছে না। ছায়েমা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে গভীর অরণ্যের আঁকাবাঁকা পথ পানে। কই কোন মুজাহিদ আসার নাম-গন্ধ নেই। অগত্যা মাছুমাকে বলল, "কি বোন! এখন কি করতে পারি?"

মাছুমা বলল, "এ ব্যাপারে আমি কী পরামর্শ দিতে পারি বলুন? আমার চেয়ে তো আপনিই ভাল জানেন। তবে আমার মন চায় বনের অনেক গভীরে না গিয়ে একটু ভিতরে গিয়ে দেখি কোন সংবাদ পাই কিনা।"

মাছুমার কথায় ছায়েমা একমত হল এবং বলল, "চল আল্লাহর

নাম নিয়ে আগামীকাল সকলেই বেরিয়ে পড়ি। আশ্রয়দাতা তো নিষেধ করবেনই। তাই বলে কি আমরা এভাবে দিনের পর দিন বসে থাকতে পারি!"

পরদিন ভোরে ফজরের নামায আদায় করে জায়নামাযে বসেই ছায়েমা আল্লাহ্‌র দরবারে কাতরসুরে মুনাজাত করল–

"হে আমার মওলা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। তোমার মর্জিমত চলার তাওফীক দান কর।

হে আল্লাহ! জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার দুশমনদের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা দাও।

হে আমার মাওলা! আমরা তো ঈমান-আমলে, ছবর ও তাওয়াক্কুলে এবং দৃঢ়তায় খুবই দুর্বল। তাই বলে তুমি আমাদেরকে ভুলে যেও না।

হে আল্লাহ! তোমার দয়া, অনুগ্রহ, মদদ ও নুছ্‌রত থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না।

হে আল্লাহ্! আমার প্রাণপ্রিয় কমান্ডার খোবায়েব জাম্বুলীকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দাও।

হে আল্লাহ্! তোমার অসহায় দাসীকে পাগলের মত আর পথে পথে ঘুরিও না।

হে আল্লাহ্! তোমার দাসিটির দু'আ কবুল কল।"

মাছুমা বসে বসে আমীন, আমীন বলছিল। অতঃপর সোলাইমান পত্নী বৃদ্ধা মহিলাকে বলল, "ফুফুআম্মা! আমরা একটু পরে বাইরে যাব।"

বৃদ্ধা চোখ দু'টি কপালে তুলে বললেন, "আরে কী বলছো! কোথায় যাবে? দূরে জাস্‌নে কিন্তু...।"

তারপর বৃদ্ধা কয়েকটি রুটি আর মেষের দুধ এনে বললেন, "বাছারা! নাস্তা করে নাও।"

ছায়েমা মাছুমাকে নিয়ে নাস্তা করে ঘোটক দু'টিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বৃদ্ধা বাড়ীর বাইরে এসে অপলক নেত্রে অশ্বারোহীদের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ে জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। ঘন জঙ্গল। চারদিকে কণ্টক ও লতাগুল্মে ভরপুর। গাছের ডালপালা

এড়িয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। কাঁটারা আঘাতে আঘাতে কেবলই তাদেরকে বিরক্ত করে তুলল। ডাল-পালা ও পত্রাঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে অশ্বগুলো গতিহীন ও অচল হয়ে গেল। ছায়েমার কোমল হৃদয়ে ক্ষীণ আশার প্রদীপ মিট মিট করে জ্বলছে। হয়ত এ অরণ্যেই খোবায়েবের সাক্ষাত মিলবে।

ছায়েমা মনে মনে ভাবছিল, আমি তাকে তালাশ করতে এতদূর পথ আসব তা তো খোবায়েব কল্পনাও করেনি। আমাকে যখন দেখবে সৈনিক বেশে, তখন খোবায়েব সেদিনের মত দৌড়িয়ে পালাতে উদ্যত হবে। তখন আমি পিছন থেকে ডাকব, 'খোবায়েব ভাইয়া, খোবায়েব ভাইয়া! আমি ছায়েমা। পলাতককে গ্রেফতার করে নিতে এসেছি। দাঁড়াও-দাঁড়াও। না হয় গুলী চালাব কিন্তু... ।' আমার কণ্ঠ খোবায়েবের কাছে বহুদিনের পরিচিত। তাই সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখবে, আমি পশ্চাতে ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট। তখন চার চোখের মিলন ঘটবে। কি মজাটাই না হবে তখন! তারপর দু'জনে বসে আলাপচারিতায় মশগুল হব। অতিরিক্ত একটা মজা হবে, আমি অশ্বচালনা শিখেছি। সে তো আমার মত দৌড়াতে পারবে না। এখানে সে আমার নিকট অবশ্যই পরাজিত হবে। ইস্, কি মজাই না হবে!

ছায়েমা মনে মনে খোবায়েবের সাক্ষাত পেয়ে কি বলবে, কি করবে, ঠিক করে নিচ্ছে। ঘোটক আঁকাবাঁকা পথে মন্থর গতিতে চলতে চলতে অরণ্যের কয়েক মাইল ভেতর প্রবেশ করেছে। এখনো কোন কূলকিনারা নেই।

এতক্ষণে সূর্য্য মাথায় উপর এসে গেছে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে। অনেকটা বিরক্ত ও ক্লান্তি বোধ করছে। কিন্তু বলার সাহস হচ্ছে না।

আরো একটু পথ অতিক্রম করে ছোট্ট একটি ময়দান দৃষ্টিগোচর হল। জায়গাটা বেশ পরিচ্ছন্ন। এখানে মানুষের হাত লেগেছে তার বেশ প্রমাণও পাওয়া যায়। কে বা কারা লতাপাতা কেটে পরিষ্কার করেছে। তাঁবু টানানোর আলামতও রয়েছে। মনে হল সারিবদ্ধভাবে তিনটি তাঁবু রচনা করা হয়েছিল। পার্শ্বে একটি পরিত্যক্ত উনুনও

বিদ্যমান। এটা হয়ত মুজাহিদদের বা বন দস্যুদের দখলে ছিল। যে কোন কারণে এ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এ স্থান ত্যাগ করে হয়ত আশপাশের কোন স্থান বেছে নিয়েছে।

ছায়েমা অশ্ব থেকে অবতরণ করে উক্ত মাঠে পায়চারী করছে। মাছুমাও ছায়েমার পিছু পিছু হাঁটছে।

এক পর্যায়ে মাছুমা বলল, "আপামনি! আমার যে অনেক ক্ষুধা পেয়েছে! চল না কিছু আহার করে নেই।"

ছায়েমা হঠাৎ চম্‌কে উঠে বলল, "আরে এখানে খাবার পাবি কোথায়?"

মাছুমা বলল, "আসার পথে বুড়িমা কয়েকটি যবের রুটি ও কিছু গোস্ত দিয়ে ছিলেন।"

মাছুমার কথা শুনে ছায়েমা খুশী হয়ে মাঠের একপার্শ্বে বসে গেল। মাছুমা রুটিগুলো বের করে সামনে হাজির করল। তারপর দু'জনে রুটি খেয়ে পানি পান করে জঠরজ্বালা কিছুটা নিবারণ করল এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

এদিকে নামাযের সময় হয়ে গেছে। উভয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল।

নামায সমাপন করে মাছুমা ছায়েমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপামনি! সময় তো অনেক হয়ে গেছে। আপনার খোবায়েবের তো সন্ধান পাওয়া গেল না। এখন কি করা যায়? আমরা যদি আবার বৃদ্ধ সোলাইমানের কুটিরে ফিরে যাই, তবে তো এখনই যেতে হয়। এখনও যদি ফিরি, তবুও সন্ধ্যার আগে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব না। অন্যথায় রাস্তায় যদি রাত হয়ে যায়, তবে বিপদের সীমা থাকবে না। ঘোটকসহ বাঘের উদরে যেতে হবে। আমরা যেস্থানে অবস্থান করেছি, এ স্থানটিও আমাদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ, এখানে যে মানুষ বসবাস করেছে, এতে তো কোন সন্দেহ নেই। এটা যদি বন দস্যুদের আস্তানা হয়ে থাকে, তবে আমাদের বিপদের আশংকা ররেছে। কারণ, আমরা মাত্র দু'জন। ওরা সংখ্যায় বেশী। ওদের সাথে লড়াই করে টিকে থাকা কঠিন হবে। আমাদের গোলাবারুদ অত্যন্ত সীমিত আর ওদের গোলাবারুদ পর্যাপ্ত। আর এটা যদি মুজাহিদদের আস্তানা হয়ে থাকে, তবু আমাদের জন্য

বিপজ্জনক। কারণ, লাল ফৌজ মুজাহিদদের চিরশত্রু। আমরা সৈনিকের পোশাক পরে এসেছি। ওদের যদি এই পোশাক দৃষ্টিগোচর, তবে দূর থেকে নির্বিচারে ফায়ার আরম্ভ করবে। আমাদের পরিচয় দেয়ার আগেই কাবু করে বসবে। কাজেই আমাদেরকে খুব ঠান্ডা মাথায় পদক্ষেপ নিতে হবে।

ছায়েমা মাছুমার যুক্তিগুলো ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করে বলল, "সত্যি বোন! তোমার যুক্তিগুলো একেবারেই অকাট্য। ভাবাবেগে কোন কিছু করতে নাই। জোশের সাথে হুঁশও রাখতে হয়। শুধু জযবা দ্বারা কাজ করে কামিয়াব হওয়া যায় না। আগপাছ চিন্তা করে, ফলাফল কি হতে পারে- এসব বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। শুক্‌রিয়া, তোমাকে আল্লাহ্ শুভবুদ্ধির পুরস্কার প্রদান করুন। আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে তোমাকে সফলতা দান করুন। তোমাকে আজ আমি একজন সিপাহসালারের মর্যাদায় পাচ্ছি। তোমার বুদ্ধির প্রখরতা আরো বৃদ্ধি পাক। দ্বীনের জন্য তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যয়িত হোক।"

উভয়ে পরামর্শ করে বৃদ্ধ সোলাইমানের কুটিরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। ঘোড়া দাবড়িয়ে ফিরে চলল দুই তরুণী সৈনিক। গহীন বন। ঘোটক সামনে এগুতেই পারছে না। কেবলই থেমে যাচ্ছে। ভাবতেই গা শিউরে উঠে। অশ্বের খুর ধ্বনিতে বন্য হায়েনারা হুমড়ি খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। মনে হচ্ছে বন-জঙ্গল মাড়িয়ে ভেঙ্গে একাকার করে দিচ্ছে। তরুণীদ্বয়ের শরীর ভয়ে কাঁপছে। হায় আল্লাহ! এই বুঝি আমরা ব্যাঘ্রের মুখে যাচ্ছি। এই বুঝি জীবনের যবনিকা টানছি। এসব ভয় তাদের তাড়া করছে। দিক হারিয়ে কোনদিকে ছুটে চলছে, তা কেউ ঠাহর করতে পারছে না।

মাছুমা পশ্চাৎ দিক থেকে ডেকে বলছে, "আপামনি আমরা কোথায় যাচ্ছি! আগে তো এ ধরনের বৃক্ষরাজি দেখিনি! মনে হচ্ছে, পথ হারিয়ে অন্য পথে চলছি!"

হঠাৎ ব্যাঘ্রের হুংকার মাটি কাঁপিয়ে তুলছে।

মাছুমার ডাক শুনে ছায়েমা ঘোড়া থামিয়ে একটু দাঁড়াল। মাছুমা

ছায়েমার পার্শ্বে চলে আসল। ছায়েমা মাছুমাকে উদ্দেশ করে বলল, "হ্যাঁ বোন! আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি! যাব কোন্‌দিকে? তোমার কী মনে হয়?"

মাছুমা কাঁদ কাঁদ সুরে বলল, "আপামনি! আমিও তো বুঝতে পারছি না কোন্ দিকে যাচ্ছি বা কোন্ দিকে গেলে গন্তব্যে পৌঁছতে পারব। হায় আল্লাহ্! আমাদের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

অশ্ব দু'টি ভয়ে মাঝে-মধ্যে কান দু'টি খাড়া করে দাঁড়িয়ে যায়। বিপদাশংকায় ছায়েমার অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বেলা বেশী নেই। হয়ত দেড় দু'ঘন্টার মধ্যেই দিনমনি হারিয়ে যাবে।

ছায়েমা নিরুপায় হয়ে বলল, "কাদিসনে বোন! আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। এ বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহই আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারেন। চল এবার ডানদিকে অশ্ব হাঁকিয়ে এগিয়ে যাই, দেখি কোন উপায় হয় কিনা।"

আমরা আবার অশ্ব ঘুরিয়ে সোজা ডানদিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। প্রায় একঘন্টা পথ অতিক্রম করে নামাযের জন্য একটু বিরতি নিয়ে পূর্বের ন্যায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলাম,

"হে রহামানুর রাহিম আল্লাহ! সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সকলে যার যার আশ্রয় স্থল খুঁজে নিচ্ছে। একমাত্র আমরাই পথহারা অবস্থায় কূলহীন বিজন বনে ছুটে বেড়াচ্ছি। তুমি এই অবলাদের প্রতি দয়া কর। তোমার কঠিন পরীক্ষায় তোমার সাহায্য ছাড়া পরিত্রাণ পেতে পারব না। অতএব তুমিই অসহায়ের প্রতি রহম কর।"

দোয়া শেষে আবার অশ্বে আরোহণ করে দু'-যুবতী নিরুদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল। দিনমণি তার গতিতে চলছে। সন্ধ্যা নেমে আসার আর বেশী বাকি নেই। কিন্তু সন্ধ্যা আসার পূর্বেই যেন আবছা আবছা আঁধার নেমে এল। গহীন বনে এরকমই হয়ে থাকে। বেশ কিছুদূর রাস্তা অতিক্রম করতে না করতেই পাঁচ-সাতটি ছায়ামূর্তি পালিয়ে যেতে দেখল। ছায়েমা চমকে দাঁড়াল। মাছুমাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, "কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?"

ঃ হ্যাঁ, কয়েকটি ছায়ামূর্তি ক্ষিপ্রগতিতে ওদিকে দৌড়িয়ে গেল।

ঃ ওদেরকে মুজাহিদ বলে মনে হয়েছে? জিজ্ঞাসা করল ছায়েমা।

ঃ না। তাদেরকে মুজাহিদ বলে মনে হয় না। এতদূর কোন কাঠুরিয়াও আসতে পারে না। হয়ত বনদস্যু হবে। বৃদ্ধ তো বলেছিলেন এ বনে মুজাহিদ, বন দস্যু ও হিংস্র প্রাণীদের বসবাস। মনে হয় এরা ডাকাত দলই হবে।

ছায়েমা মাছুমাকে নির্দেশ দিল, কাঁধ থেকে অস্ত্র নামিয়ে ফায়ার পজিশনে চল। যে কোন মুহূর্তে ফায়ার করা লাগতে পারে। খুব সতর্ক অবস্থায় থাক। চোখ-কান জাগ্রত রাখ। ভয়-ভীতি অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেল। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা কর। অস্ত্র কিছু করতে পারবে না, একমাত্র আল্লাহই সবকিছু করতে পারেন।

এ সমস্ত উপদেশ শুনিয়ে আরো একটু সামনে অগ্রসর হয়ে দেখে সারিবদ্ধভাবে দু'টি তাঁবু সাজানো। এর ভিতর রয়েছে কাষ্ঠনির্মিত বড় বড় দু'টি বাক্স। উভয়টি তালাবদ্ধ। তাছাড়া ছোরা, লাঠি, চাকু, ডেগার, ২টি পাইপ গান, ৩টি পিস্তল ও ৯০ রাউণ্ড গুলী তাঁবুর একপার্শ্বে ত্রিপলের নিচে পড়ে আছে।

ছায়েমা এসব ছামানা দেখেই অনুমান করেছে যে, এগুলো মুজাহিদদের নয়— বন দস্যুদের হাতিয়ার। ছায়েমা তাড়াতাড়ি বাক্সের তালা ভেঙ্গে দেখে অনেক স্বর্ণালকংকার, টাকা-পয়সা, ঘড়ি ও কাপড়-চোপড়।

এতে তার বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হল। এগুলো গ্রামগঞ্জ থেকে ডাকাতি করে আনা সম্পদ। আনুমানিক কয়েক লক্ষ টাকার মালামাল। এগুলো ছাড়াও জমির দলিলপত্র, ব্যাংকের কাগজ ইত্যাদি রয়েছে। ছায়েমা দলিলপত্রগুলো পড়ে বিভিন্নজনের নাম ও বিভিন্ন এলাকার ঠিকানা জানতে পারল। তাছাড়া একটি চরমপত্র উদ্ধার করেছে। তাতে লেখা ছিল—

"অপারেশন গ্রুপের পক্ষ থেকে বণিক সমিতির চেয়ারম্যান জনাব আলতাফ হোসেন সাহেবের নিকট চরম পত্র।

জনাব আলতাফ সাহেব, আশা করি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ভাল আছেন। পর সংবাদ এই যে, বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম, আপনার প্রতি মাসে আয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা। এই টাকাগুলো আপনি

একাই ভোগ করছেন। আবার এটাও শুনেছি, আপনি নাকি প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা মুজাহিদদেরকে দান করেন। যেহেতু আপনি একজন বিরাট ব্যবসায়ী ও দানবীর, সেহেতু আমরা আপনার নিকট নগদ দু'-লক্ষ টাকা দাবি করছি। আর প্রতিমাসের এক তারিখে দশ হাজার টাকা করে আমাদেরকে নিয়মিত দিতে হবে। দুই লক্ষ টাকা আগামী শনিবার বিকাল ৩টায় বাসস্ট্যান্ডের উত্তর পার্শ্বের লিংকনের পান দোকানে রেখে দিবেন। তা না হয় আপনার স্কুল পড়ুয়া ৮ বৎসরের ছেলেকে অপহরণ করা হবে। অথবা এ মাসের যে কোন দিন আপনাকে রক্তাক্ত অবস্থায় বালিশ ছাড়া রাস্তায় শুইয়ে রাখা হবে। এখন চিন্তা করে কাজ করুন। এর চেয়ে এক ঘন্টা সময়ও বাড়ানো যাবে না। নির্দেশ মত কাজ না করলে ফল ভোগ করতে হবে।

—ইতি অপারেশন গ্রুপ।"

পত্রটি পাঠ করা শেষ করতে না করতেই মাছুমা বলে উঠল, "আপামনি! এরা তো হাইজ্যাক পার্টি। মাঝে-মধ্যে খবরের কাগজে আসে অমুক ব্যক্তির নামে-বেনামে চিঠি দিয়েছে টাকার জন্য। আবার ছেলে-মেয়ে ধরে নিয়ে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়। এরা তো ঐ পার্টি। ওরা আমাদেরকে দেখে মনে করেছে বনে সেনা অভিযান নেমেছে। তাই দেখার সাথে সাথে পালিয়ে গেছে। এখন এসব মালামাল কি করা যায়, তা চিন্তা করুন।"

ছায়েমা বলল, "তুমি ঠিক ধারণাই করেছ বোন! এরা নিরীহ মানুষের মালামাল ডাকাতি করে এখানে আশ্রয় নেয়। এটাই তাদের আস্তানা। আমাদের এখানে দেরি করা ঠিক হবে না। চল মালগুলো নিয়ে দ্রুত কেটে পড়ি। তারপর যদি কোনদিন সম্ভব হয়, ঐ সমস্ত ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেব। আর যদি সম্ভব না হয়, তবে জিহাদের ফান্ডে জমা দিয়ে দেব। মালগুলোর দু'টি পুটুলি তৈরী কর।"

ছায়েমার কথা মত মাছুমা মালগুলোর দু'টি পুটলি করল।

ছায়েমা মাছুমাকে ডেকে বলল, "আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। ওরা যে দলবলসহ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। জলদি চল।"

এই বলে উভয়ে নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ করে সামনে চলতে

লাগল। কোথায় যাবে, কি করবে, তা ভেবে পাচ্ছে না। তবু আনমনে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে সূর্য্য ডুবু ডুবু করছে। ভয়ে তাদের শরীর কাঁপছে।

[তেইশ]

আরো একটু অগ্রসর হয়ে মাগরিবের নামায আদায় করে ছায়েমা মাছুমাকে বলল, "বোন! এমন জযবা নিয়ে এ গহীন অরণ্যে প্রবেশ করা আমাদের উচিত হয়নি। জীবনের ভুলগুলোর মধ্যে এটাই হল উল্লেখযোগ্য। যে বনের কোন কূল-কিনারা নেই, তা পাড়ি দেয়া এত সহজ নয়। বন্য হায়েনারা জঠরজ্বালা নিবারণ করতে এতক্ষণে নিজ নিজ বলয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ শোন ব্যাঘ্রের হুংকার, সিংহের গর্জন, শিয়ালের হুক্কা হুয়া ডাক, বন বাঁদুরের পাখার পত্ পত্ ধ্বনি আর হরিণের কণ্ঠের বাঁশরীর সুরলহরী।

মাছুমা ভয়ে ছায়েমাকে জড়িয়ে ধরল। তার অন্তরাত্মা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কোমলমতি মাছুমার কুসুম কোমল গণ্ডদেশ পাংশু রঙ ধারণ করল। ভাগ্য বিড়ম্বনায় ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র পালের মধ্যে গভীর অরণ্য দেশে দু'টি যুবতী থর থর করে কাঁপছে। তাদের ছাতি ফেঁটে চৌচির হওয়ার উপক্রম হায়েনাদের ভয়ে। এই বুঝি ধরবে, এই বুঝি ছিঁড়েকুড়ে খেয়ে ফেলবে। উভয়ের আঁখিযুগলে অশ্রুর রেখা দেখা দিল। যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভের প্রবাহিত ফল্গুধারা, বেদনার উৎসধারা সতত প্রবাহমান।

মাছুমা জীবনের একটি দিনও তার মাকে ছাড়া কাটেনি। মাকে ছাড়া একাকী কখনো তার মামা বাড়ীও যায়নি। মায়ের পাশে রাতযাপন করতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ দ্বীনের রাস্তায় সব আরাম-আয়েস বিসর্জন দিয়ে গভীর অরণ্যবাসে আসতে হল। জীবনের কি নির্মম পরিহাস।

ছায়েমা মাছুমার বেদনা ও মনোঃকষ্ট বুঝতে পেরে খানিকটা সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল এবং বলল, "আমার বিপদের সাথী! বোন আমার! জীবন আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিষাদগ্রস্ত, দুর্বিষহ। আশৈশব যাকে প্রাণের চেয়ে ভালবেসেছিলাম, তাকে আজ হারাতে বসেছি।

অন্তর আজ নৈরাশ্যের তরঙ্গে দোল খাচ্ছে। অসহনীয় বেদনা আর যাতনা হৃদয়ের কানায় কানায় ভরপুর। ব্যর্থ প্রেমের নিষ্ঠুর কষাঘাতে কোমল বক্ষ ভেঙ্গে-চুরে চুমরার হতে যাচ্ছে। এই বয়সে এত ব্যথা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার সার্থকতা কী?”

নামাযান্তে বিশ্রাম নিয়ে যুবতীদ্বয় আবার ঘোড়া হাঁকায়। বন-জঙ্গল, কাঁটাগুল্মের ভেতর দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বার বার। তবু চলছে। রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। ভয়ও বাড়ছে। বন্য হায়েনাদের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে আসছে না। আঁধার দেখে আঁধারও যেন ভয় পায়। দু'হাত দূরের কোন বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয় না। হিংস্র প্রাণীদের তর্জন-গর্জনে অশ্ব দু'টি ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে চায়।

মাছুমা বলল, “আপামনি! কোন্ সময় জানি সাওয়ারীসহ আমরা ক্ষুধার্ত শার্দুলের উদরস্ত হই। জলদি চল। দেখি কোন অরণ্য বস্তি বা কাঠুরিয়ার কুটিরের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। তাড়াতাড়ি চল। বেশী বেশী জিকির কর।”

দুশমন ও জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ থেকে তারা আত্মরক্ষার জন্য চেম্বারে গুলী ভরে নেয়।

ছায়েমা মাছুমাকে বলল, “বোন! খুব সতর্ক থাকবে, আল্লাহ না করুন যদি কোন বিপদ দেখ তবে চোখের পলকে ট্রিগার টেনে ধরবে। প্রয়োজনে শহীদ হবো কিন্তু কারো কাছে আত্মসমর্পণ করবো না। বুঝতেই পারছ বন্দি জীবনের অবস্থা কি দাঁড়াবে! যথাসাধ্য একসাথে থাকার চেষ্টা করবে। এই গভীর অরণ্যে একজনকে যেন অপরজন হারিয়ে না ফেলি।”

এভাবে চলতে চলতে তারা আরো প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার পথ অগ্রসর হল। মাঝে-মাঝে দু'একটি প্রাণী তাড়িত শশক শাবকের মত প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে বন-জঙ্গল মাড়িয়ে। এতে অশ্ব দু'টি ভয়ে কাঁপছে। হঠাৎ কোন এক অদৃশ্যের বলে ঘোড়া দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও ঘোড়ার গতিরোধ করতে পারছে না তারা। মনে হল, কে যেন পেছনে তাড়া করছে। মাছুমা গুলী করার অনুমতির অপেক্ষা করছে। কিন্তু ছায়েমার পক্ষ থেকে কোন অনুমতি পেল না।

অশ্বের এলোপাতাড়ি ছুটাছুটির দরুন তারা ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে বসে থাকতে পারছে না। তবু দু'পা চেপে ও অলকগুচ্ছ খুব মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে রাখল। কাঁটার আঁচড়ে আঁচড়ে অশ্বের দেহ ক্ষত-বিক্ষত। উভয়ের জামা-কাপড়ও ছিঁড়ে বিনাশ হয়ে যাচ্ছে। এখন আর ঘোটক চলতে পারছে না। ক্লান্তিজনিত দুর্বলতার সাথে ক্ষুৎ-পিপাসায় অস্থিরতা ও বিপদাশংকা একসাথে যোগ হয়ে অশ্ব ও মানুষের অবস্থা খুবই শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে। অশ্ব দু'টি কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল। আর এক-পাও সামনে অগ্রসর হতে পারছে না।

ছায়েমা ও মাছুমা অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করার পর অশ্ব দু'টি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শ্রমক্লান্ত ঘোটক দু'টির দিকে তাকিয়ে দেখল, মুখগহ্বর ও নাসারন্ধ্র থেকে প্রচুর ফেনপুঞ্জ নিঃস্বরণ হচ্ছে। ছায়েমা বুঝতে পারল না, কেন এমনটি হল। মাছুমা বলল, "আপামনি! এ মুহূর্তে যদি এদেরকে পানি পান করানো না যায়, তবে এদের বাঁচানো যাবে না। আমরাও বাহনহারা হয়ে পড়ব।"

এই জায়গাটায় পানির সন্ধান করাও খুব কঠিন। মাছুমা আল্লাহর উপর ভরসা করে বলল, "আপা! আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি দেখি পানির খোঁজ পাই কিনা।"

এই বলে মাছুমা পানির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ ওদিক-ওদিক ছুটাছুটির পর প্রবাহিত পানির এক প্রকার কল কল ধ্বনি মাছুমার কানে এসে বাজল। আনন্দে নেচে উঠল মাছুমার মন। কলধ্বনির সুর ধরে একটু এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল মধুরতানে আপন গতিতে বইছে এক ঝর্নাধারা। এখন পানি কিসে করে নেয়া যায় তা নিয়ে ভাবছে। হঠাৎ মনে বুদ্ধি আঁটল, ভাবনা কিসের, কয়েক লিটার পানি তো আমার হেলমেটে করেই নেয়া যায়। তাছাড়া কটিদেশেও তো পানির বোতল আছে। তাতেও প্রায় ১ লিটার পানি ধরবে। মাছুমা প্রথমে কয়েক আঁজলা পানি পান করে নিল। তারপর বোতল ও হেলমেটে পানি ভর্তি করে দ্রুতপদে অশ্বের নিকট গেল। অশ্ব দু'টি পাগুলো কেবলই আছড়াচ্ছে। ছায়েমা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মাছুমা তাড়াতাড়ি করে ঘোড়ার মুখ গহ্বরে পানি ঢালতে

লাগল। ঘোটক মুখ নেড়ে নেড়ে পানি পান করতে লাগল। পানি শেষ হলে পুনরায় পানি নিয়ে আসল। এভাবে কয়েকবার পানি পান করানোর পর ঘোড়া শোয়া থেকে উঠে দাঁড়াল। অশ্ব দু'টি ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। ঘাড় নাড়িয়ে ছায়েমা ও মাছুমার দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ছায়েমা ও মাছুমা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে গাছের লতা-পাতা আহার করছিল। ছায়েমা মাছুমাকে বলল, "দেখ বোন, আমরা তো কিছু না কিছু আহারাদি করেছি। পানি পান করেছি। তাই ক্ষুধায় একেবারে ধরাশায়ী হইনি। কিন্তু ঘোড়া দু'টো তো কিছুই খেতে পারেনি। তাই এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ওরা মরতে বসেও বেঁচে গেল।

যামিনীর দুই-তৃতীয়াংশ পেরিয়ে গেছে। প্রভাত হওয়ার তেমন বাকি নেই। শেষ রজনীর পাখিরা ছুবহে সাদেকের আগমনী বার্তা শুনিয়ে গেল। উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে খানিক আগে। এখন প্রবাহিত হচ্ছে হীমপ্রবাহ। পাহাড়ী এলাকায় এমনটিই হয়ে থাকে। প্রকৃতি নিদ্রাপুরীতে অচেতন। শুধু বন মোরগ ও পাখ-পাখালিরা ভোরের আগমনী গান আরম্ভ করেছে। পাখির কল-কাকলিতে ঘুমন্ত প্রকৃতি আঁখি মেলছে। আঁধার কেটে আলো প্রকাশ পাচ্ছে। এতে যুবতীদ্বয়ের আনন্দের সীমা রইল না। নিশাবসানের সাথে সাথে উভয়ে ফজরের নামায আদায় করে আল্লাহর শোকর আদায় করতে লাগল।

কাঁচা সোনালী রোদ পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে যেন দুই যুবতীকে দেখছিল। নিশি কেটে ভোর হয়েছে। সাথে সাথে কেটে গেছে সংকটপূর্ণ সময়। এটা সত্যিই আনন্দের বিষয়। কিন্তু ছায়েমার অন্তরে খুশীর কোন আলামতই নেই। কারণ, এতো পেরেশানির পরও খোবায়েবের সন্ধান পেল না। দুঃখ ও বেদনায় জীবন ওষ্ঠাগত। কষ্ট ও পেরেশানীর কষাঘাতে তার অপরূপ সৌন্দর্য যেন ম্লান হতে চলেছে। নেই দীপ্তিমান নয়নের চটুল চাহনী, নেই রূপের বাহার। অকালেই হারিয়ে যাচ্ছে নিবীড় কৃষ্ণ কুন্তলদামের অপরূপ শোভা ও কুহকিনীর মাধুর্য! এক কথায় বলতে গেলে, যুবতীর যৌবন-কুসুম ফুটতে না ফুটতেই শুকিয়ে যাবার উপক্রম। কুসুমকোরককে বিষাক্ত

কীট প্রবেশ করে যেমন দিন দিন ধ্বংস করতে থাকে, তেমনিভাবে ছায়েমার অন্তরেও খোবায়েবের বিরহ বেদনা প্রবেশ করে শেষ করে দিচ্ছে। যুবতীর মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ, অবলম্বনহীন দেহবল্লরী ভেঙ্গে যেন অস্থিরতায় প্রান্তসীমায় উপনীত।

পথহারা যুবতীদ্বয় সূর্যোদয় দেখে দিক নির্ণয় করছে। এশ্‌রাকের নামায আদায় করে আবার ঘোটককে দ্রুতগতিতে হাঁকাতে লাগল। এখন অরণ্য অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে, হাল্কা হতে হতে হয়ত গ্রামে এসে মিশে গেছে। এভাবে চলতে চলতে দুপুর ১২টার দিকে তারা একটি পল্লীর সন্ধান পেল। পল্লীবাসীরা দু'জন সৈন্যকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। ছায়েমা তাদের মন থেকে ভয় দূর করার জন্য তাদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করতে লাগল। ছায়েমা এক যুবককে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভাই! তোমাদের এই পল্লীর সর্দারের নাম বলতে পার কি?"

যুবক উত্তর দিল, "আমাদের পল্লী সর্দারের নাম শ্রীনিধি নিনাল তুংগা।"

ঃ তোমরা জাতিকে কি?

ঃ আমরা বৌদ্ধ।

এই বৌদ্ধ বিহারের নাম মাছুমা ও নাঈমা অনেক আগেই শুনেছে। মাছুমা বলল, "আমাদেরকে পল্লী সর্দারের বাড়ী নিয়ে চল।"

যুবক আগে আগে হেঁটে চলছে। ছায়েমা ও মাছুমা যুবকের পিছু পিছু যাচ্ছে। কয়েকটি বাড়ী পার হতেই পল্লী সর্দারের বাড়ী এসে হাযির হল। সর্দারজী বাড়ীর বাইরে এসে কুশল বিনিময় করে তাদের বসার ব্যবস্থা করলেন এবং খাবারের আয়োজনে চলে গেলেন। চাকর বদনায় করে পানি নিয়ে এল। হাত-মুখ ধুয়ে উভয়ে মেহমানখানায় গিয়ে বসল। সর্দারজী খুব তাড়াহুড়া করে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলেন। দু'জনে খানা খেয়ে যোহরের নামায আদায় করল।

নামায শেষে ছায়েমা পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিস্থিতি ও লোকজনদের অবস্থা জানতে চাইলে সর্দারজী সবকিছুই খুলে বললেন। কথা প্রসঙ্গে সর্দারজী চুরি-ডাকাতির কথাও বললেন। ছায়েমা উদ্ধারকৃত মালামালগুলো পল্লী সর্দারের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "মনে হয় এগুলো এ এলাকার সম্পদ হবে। আমানতদারীর

সাথে এগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে পৌঁছিয়ে দেবেন।”

গাঠুরী খুলে সর্দার অবাক হয়ে গেলেন। এত মালামাল, টাকা-পয়সা ও স্বর্ণাংকাল! সর্দার তার এক চাকরকে ডেকে বললেন, “আশপাশের গ্রামে কারো বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে কিনা এবং রাস্তা থেকে কারো মালামাল ছিনতাই হয়েছে কিনা খোঁজ নাও। আর সবাইকে বলে দাও, দুপুর দু’টার মধ্যে আমার বাড়ীতে আসতে।”

চাকর সংবাদটা মুহূর্তের মধ্যেই পৌঁছিয়ে দিল।

লোকজন দু’টা বাজার পূর্বেই এসে হাজির হল। তাছাড়া দর্শকের সংখ্যাও ছিল অনেক। সর্দার কিভাবে মালগুলো হস্তান্তর করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি ছায়েমাকে বললেন, “স্যার! আপনি নিজ হাতে এগুলো দিয়ে দিন।”

ছায়েমা সর্দারজীর নিকট দু’জন শিক্ষিত মুরুব্বী গোছের লোক চাইলে সর্দার দু’জন মুরুব্বীকে ডেকে পাঠালেন।

ছায়েমা মাছুমাকে বলল, “তুমি একজন একজন করে ছাড়বে। ক্লাশিনকভ নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও।”

সর্দার নাম ডাকলেন। মাছুমা ঘরের ভেতর ঢুকার অনুমতি দিলে লোকজন এক এক করে ঘরে ঢুকে। এরপর সকলের উপস্থিতিতে ছায়েমা জিজ্ঞাসা করে, “আপনার স্ত্রী, মেয়ের অথবা পুত্রবধূর যে অলংকার ডাকাতি হয়েছে, তা কোন্‌টি।” তখন হাত দিয়ে সব তালাশ করে দেখায় এইটা! তখন উক্ত ব্যক্তির বউ, স্ত্রী বা মেয়েকে আনা হয় এবং বলা হয়, “তোমার অলংকারটি বেছে বের কর।” উভয়ের দেখানো অলংকার যদি মিলে যায়, তবে তাদেরকে সেই অলংকার দিয়ে দেয়া হয়। এভাবে যতটুকু সম্ভব যাচাই-বাছাই ও সাক্ষ্য-প্রমাণসহ কাপড়-চোপড়, ঘড়ি, চশমা ও অলংকারাদি মালিকদের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়।

এদিকে আছরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। ছায়েমা ও মাছুমা নামায আদায় করে নিল। উভয়ের নামায পড়া দেখে সর্দারসহ গ্রামের লোকজন বলাবলি করতে লাগল, “তাহলে এরা মুসলমান।”

নওমুসলিমরাও এসেছিল উক্ত অনুষ্ঠানে। এরা সবাই এসে বলল, “আমরাও মুসলমান।”

তাদের চেহারায় মুসলমানের কোন নিদর্শন না থাকায় মাছুমা প্রশ্ন করল, "তোমাদেরকে তো মুসলমান বলে মনে হয় না।"

একজন উত্তর দিল, "আজ দু'দিন হল আমরা মুসলমান হয়েছি। একজন যুবক মুসাফির ঘোড়া হাঁকিয়ে আমাদের এদিকে এসেছিল। তার কথাবার্তা শুনে আমরা ১৭ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছি।"

ছায়েমা জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা কি সেই মুসাফিরের নাম বলতে পারেন?"

তারা বলল, "জ্বি, তার নাম খোবায়েব। বড় ভাল মানুষ তিনি।"

খোবায়েবের নাম শুনে ছায়েমা চমকে উঠল। হৃদয়ে আশার আলো প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, "তার কোন খোঁজ কি আপনাদের কাছে আছে? তিনি কোথায় থাকেন, তা কি বলতে পারেন?"

তারা বলল, "না অত কিছু জানি না। তবে এখানে তিনি আবার আসবেন বলে ওয়াদা দিয়ে গেছেন। তাকে ঘোড়া হাঁকিয়ে বনের পথে যেতে দেখেছি।

মাছুমা ছায়েমাকে বলল, বোন! আমাদের এখানে দু'-চার দিন অপেক্ষা করা উচিত। এর মধ্যে হয়ত খোবায়েব ভাইয়া আসতেও পারেন।

ছায়েমা মাছুমার কথায় রাজি হল।

[চব্বিশ]

আমি বৌদ্ধ বিহার থেকে বিদায় নিয়ে কুকান্দুজের দিকে অগ্রসর হলাম। অশ্ব চলছে খট্ খট্। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। একটানা কয়েক ঘন্টা সামনে চলছি। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল। যোহরের নামাযের সময় যায় যায়। পথে কোথাও পানির সন্ধান পেলাম না। মাঝে-মধ্যে দু'একটি বাড়ী দেখেছি বটে; কিন্তু অশ্ব থেকে অবতরণ করিনি। ভেবেছিলাম সামনে হয়ত লোকালয় পাব, সেখানে অজু করে নামায আদায় করব এবং অশ্বকেও কিছু ঘাস-পানি খাওয়াব। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! এখানে আর কোন বাড়ী-ঘর, নদী-নালা, খাল-বিল দৃষ্টিগোচর হলো না।

অগত্য কোন উপায় না দেখে অশ্ব থেকে অবতরণ করে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলাম। অশ্বকে যিনমুক্ত করে সবুজ প্রান্তরে ছেড়ে দিলাম কিছু ঘাস খেয়ে ক্ষুধা নিবারণের জন্য। ঘোটক মনের আনন্দে কাঁচা ঘাস খেয়ে উদর পূর্ণ করতে লাগল।

আমি একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছি। পানির পিপাসায় আমার কলিজা ফেঁটে যাওয়ার উপক্রম। ক্ষুধার অনলে উদর জ্বলছে। এই মুহূর্তে যদি সামান্য পরিমাণও পানি না পাই, তাহলে এখানেই আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটবে। সীমাহীন পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করতে লাগলাম।

এদিকে মায়ের তিরোধানে অন্তর ক্ষতবিক্ষত। জীবনে কোনদিন মায়ের মুখে হাসি ফুটাতে পারিনি। অন্তিম সময়ে মা আমার নাম ধরে ডাকছিলেন। সে ডাকেও সারা দেয়ার সুযোগ হল না। বিদায় মুহূর্তেও আম্মার পাশে থাকার সৌভাগ্য হল না যে, তার মুখে শেষ পানিটুকু তুলে দেব। আল্লাহর কালাম সূরা ইয়াসিন পাঠ করতে পারিনি। যে মা আমার জন্য চিন্তা করতে করতে পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে আমাকে তালাশ করেছেন, বন্দি জীবনের অসহনীয় বেদনা ভোগ করেছেন– সেই মায়ের খেদমত করতে পারলাম না। অপরদিকে যে মেয়েটিকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে তার ইজ্জত-আবরু ও সম্ভ্রম রক্ষা করেছি, যে আমাকে জিহাদ করার কলাকৌশল শিক্ষা দিয়েছে, যে আমাকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, যে আমাকে জীবনের চেয়ে ভালবেসেছে, যে আমাকে খুঁজতে গিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, যে পাগল হয়ে আমাকে খুঁজতে বের হয়েছে– আজো তার কোন সন্ধান পেলাম না। হতভাগিনী না জানি কোথায় কি অবস্থায় আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

সবগুলো চিন্তা এসে একযোগে আক্রমণ করে আমার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করছে। পানির পিপাসায়ও জীবন ওষ্ঠাগত। কি করব না করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। নিজ হাতে যদি নিজের জীবন বধ করার অনুমতি থাকত, তবে ক্লাশিনকভটির বেরেল বক্ষে স্থাপন করে ট্রিগার চেপে জীবন নাট্যের অবসান ঘটাতাম। তা তো আর সম্ভব হচ্ছে না। আমি নিরুপায় হয়ে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে লাগলাম।

যোহর শেষ হয়ে আছরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এখানে বসে ভাবনার অসীম সাগরে হাবুডুবু খেয়ে লাভ নেই। কোন একটা গন্তব্যে পৌছতে হবে। দেখতে পেলাম, ঘোটক ঘাস খেতে খেতে বহুদূর চলে গেছে। আমি অশ্বটিকে তাড়িয়ে এনে যিন কষিয়ে আবার অজানা পথে ঘোড়া হাঁকালাম।

ঘোড়া বিরামহীন চলতে লাগল। আশপাশে কোন বাড়ীঘর নেই। নেই উন্নত বা প্রশস্ত রাস্তা। পায়ে চলার মেঠো পথ। তাও আবার আঁকাবাঁকা। কেবলই টেকটিলা, ঝোঁপ-ঝাড়। বাবলাজাতীয় কন্টকময় গাছ-গাছড়ায় ভরা। শুনেছি, এই পথে কুকান্দুজে যাওয়া যায়। মনে মনে ভাবলাম, পথে কোন যাযাবর বা কাঠুরিয়ার জীর্ণ কুটির মিললে সেখানেই রাত্রি যাপন করব।

ভাবনার সাগরে ভাসতে ভাসতে অনেক পথ পেছনে ফেলে এসেছি। আছরের সময় পেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। অশ্ব থেকে নেমে তায়াম্মুম করে দু'রাকাত নামায আদায় করলাম। নামায শেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাকিয়ে দেখি, বেশ দূরে কিছু লোক দ্রুতপদে অরণ্যের দিকে যাচ্ছে। তাদের দেখে প্রথমে কাঠুরিয়া মনে হচ্ছিল। ওদিকেই হয়ত তাদের নিবাস। লোকগুলোকে দেখে আমার অন্তরে আশার আলো জ্বলে উঠল। আমি দেরি না করে তাদের দিকে অশ্ব হাঁকালাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের নিকটে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনটি গাঁধার পিঠে কিছু মালামাল বোঝাই করে তারা অরণ্যাভিমুখে চলছে। তারা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তাদের পরনে সেলোয়ার ও ঢিলেঢালা কোর্তা। ঝাকড়া চুল, মোটা মোটা গোঁফ। চেহারায় নূরানী আভা। এরা যে মুজাহিদ তা আর বুঝতে বাকি রইল না। আমি দূর থেকে সালাম দিয়ে আরো একটু কাছে গিয়ে অশ্ব থেকে অবতরণ করলাম। সকলের পেছনে লোকটি সালামের উত্তর দিয়ে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি আমার পরিচয় কি দেব তা নিয়ে ভাবছিলাম। লোকটি আমার অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন, আমি আমার পরিচয় দিতে ইতস্তত বোধ করছি। তিনি আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, "বাবা! তোমাকে এত বিষন্ন দেখাচ্ছে কেন? ভয়

পাওয়ার কিছু নেই। নির্ভয়ে তোমার পরিচয় দিতে পার, কোন অসুবিধা হবে না।”

আমি বললাম, “হুজুর! আমার পরিচয় দেয়ার আগে যদি আপনাদের পরিচয়টা পেতাম, তবে খুবই ভাল হত।”

লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, “আমরা পাহাড়ী মানুষ। পাহাড়ে আমাদের বসবাস। বাজার থেকে খাদ্য কিনে আবার জঙ্গলে চলে যাচ্ছি।”

আমি প্রশ্ন করলাম, “হুজুর! লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন কেন? আপনাদের কি কোন বাড়ীঘর নেই? আর পাহাড়ে থেকেইবা কি করেন? এখানে তো হিংস্র প্রাণী আর চোর-ডাকাতের আস্তানা। ইদানিং শুনেছি এখানে নাকি আনোয়ার পাশার মুজাহিদ বাহিনী আশ্রয় নিয়েছে। তাহলে আপনারা কি...?”

গাঁধাচালক বললেন, “তুমি দেখছি সবই জান? তুমি কি কোন গুপ্তচর বা ডাকাত সর্দার, নাকি মুজাহিদদের কেউ? নয়ত এ বয়সে এতকিছু জান কি করে?”

এসব কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ দেখি চোখের পলকে আমার অস্ত্রটা ওদের একজনের হাতে চলে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম না কোন্ কৌশলে কি করে আমার অস্ত্র নিয়ে গেল। আমি হাবার মত ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আবার জিজ্ঞেস করল, “তুমি ঘোড়া পেলে কই? এদিকে ঘোড়া নিয়ে আর কাউকে তো আসতে দেখিনি। তোমার আর লোকজন কোথায়? ওরা কি আগে চলে গেছে, না পশ্চাতে।”

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি বললাম, “জনাব! আপনি যা ভাবছেন, আসলে আমি তা নই। আমি একজন বিপন্ন পথিক। আমার এক সাথীকে খুঁজতে গিয়ে এদিকে চলে এসেছি। আমাকে ক্ষমা করুন।”

লোকটি অগ্নিশর্মা ধারণ করে আমার দিকে তাকালেন এবং দন্তপাটি কট্‌মট্ করতে করতে অপর একজনকে বললেন, “এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন! জলদি লোকটার হাত-পা বেঁধে ফেল।”

যা হুকুম তা-ই হল। আমার দু'টি হাত পশ্চাৎ দিকে নিয়ে গাঁধার

রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। এই বুঝি প্রাণবায়ু আমাকে ফেলে রেখে সমিরণে মিশে যাবে। আহ্! ছায়েমার দেখা আর হল না।

মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেল। মনে মনে ভাবছিলাম, হয়ত নামায পড়া হবে না। পথিকদের কাছে পানি ছিল। তাকিয়ে দেখি একে একে সবাই অজু করে নিচ্ছে। আমি বিনয়ের সুরে বললাম, "বন্ধুরা! আমি পিপাসায় কাতর, বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম। আমাকে সামান্য পানি দিলে পিপাসা নিবারণ করব আর বাকিটুকু দিয়ে অজু করে নামায আদায় করব।"

দলপতি অপরজনকে হাতের ইশারায় পানি দিতে বললেন। একজন এসে আমাকে বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। অপরজন এক বোতল পানি দিলেন। আমি কয়েক ঢোক পানি পান করে বাকি পানি দিয়ে অজু করে নিলাম। আমি যেন পালাতে না পারি সে জন্য একজন পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে। অজু শেষে জিজ্ঞেস করলেন, পিপাসা নিরারণের জন্য আর পানির প্রয়োজন আছে কি? উত্তরে বললাম, যদি দয়া হয়। তিনি আর এক বোতল পানি দিলেন। আমি সবটুকু পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম।

সামনে একজন দাঁড়িয়ে মধুরকণ্ঠে ক্বিরাতের মাধ্যমে নামায পড়াচ্ছেন। নামাযের সময় আমার দু'পার্শ্বে দু'জন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করল। সুন্নত পড়ে প্রায় চার-পাঁচ মিনিট কিছু তাছবিহাত পড়ে আওয়াবীনও পড়লেন। এরপর আমাকে পূর্বের ন্যায় বেঁধে হাঁটতে লাগলেন। আমি পুরোপুরি ধরতে পেরেছি ওরা মুজাহিদ। কিন্তু বেশী কিছু বলার সাহস সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি।

ইস্ কি অন্ধকার! দু'চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার দু'ধারে শুধু কাঁটা আর কাঁটা। এর মধ্যদিয়ে চলছে এ ক্ষুদ্র কাফেলা। এদের অন্তরে ভয়ের লেশমাত্র নেই। বিরামহীনভাবে চলতে চলতে রাত ১১টার দিকে একটি স্থানে আসতেই দূরে তাকিয়ে দেখি ক্ষুদ্র একটি প্রদীপ মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। প্রদীপটি দেখেই আমার মন স্বাক্ষ্য দিল, হয়ত ওখানেই হবে এদের আস্তানা। চলতে চলতে একটি জীর্ণশীর্ণ বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ালাম। ঘর থেকে এক বুড়ো প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এলেন। সালাম-মুসাফাহা বিনিময়ের পর বুড়ো

বললেন, মালামালগুলো গাঁধার পিঠ থেকে নামিয়ে ঘরে তোল।

তারা রশি খুলে বস্তা কয়টি ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গেলেন। ঘর আর বাইর একই। ঘরের একদিক দিয়ে তাকালে অপরদিকে কি আছে দেখা যায়। ঘরগুলো লতাপাতায় নির্মিত। বস্তাগুলো যথাস্থানে রাখার পর পানি নিয়ে এলেন হাত-মুখ ধুতে বা অজু করার জন্য।

বুড়োর খেদমত দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে যেতে না যেতেই বৃদ্ধ খানা এনে হাজির করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, ওরা যে এখানে আসবে সেটা পূর্বপরিকল্পিত। তা না হলে বৃদ্ধ এত তাড়াতাড়ি খানার এন্তেজাম করতে পারতেন না। ঘরের লোক বুড়াবুড়ি দু'জন। খাবার আনা হয়েছে চার-পাঁচজনের।

তারা আমার হাতের বন্ধন খুলে পায়ের বন্ধন আরো শক্ত করে দিল। আমাকেও খানা খাওয়ার জন্য বলল। ভাবলাম, কথা উপেক্ষা করে না খাওয়াটা ঠিক হবে না। তাই নিজ হাতে দু'-টুকরা রুটি আর এক বাটি ডাল নিলাম। আহারাদি শেষ করে সবাই বৃত্তাকারে বসে গেল। বৃদ্ধ লোকটিও থালা-বাটি ঘরে রেখে এসে মাহফিলে বসলেন।

দলপতিকে বাড়ীওয়ালা জিজ্ঞেস করলেন, "এ যুবককে কোথা থেকে নিয়ে এলেন? তার পরিচয় কি? ওকে এমন করে বেঁধে রেখেছেন যে?"

দলপতি উত্তর দিলেন, "এ যুবক সন্দেহভাজন। মনে হয় বলসেভিকদের চর। তার কথাবার্তা খুবই আপত্তিকর ও সন্দেহমূলক। তাই গ্রেফতার করা হয়েছে।"

বুড়ো বললেন, "এ ভেজাল টেনে লাভ কি? কিছু উত্তম-মাধ্যম দিয়ে ঘোড়াটি রেখে পথেই ছেড়ে দিয়ে আসতে। কিন্তু এখন যেহেতু আস্তানায় নিয়ে এসেছ। তো ছাড়া যাচ্ছে না।"

দলপতি বললেন, "এতটুকু সময় আমাদের হাতে ছিল না। তাছাড়া তখন এ বুদ্ধিও মাথায় আসেনি। আবার এটাও ভাবলাম যে, এর থেকে অনেক তথ্য উদ্ধার করা যাবে। তারপর রাখা না রাখা বিবেচনা করে দেখব। আগে গোপন তথ্য ও গোপন পরিকল্পনা জেনে নেই।"

অপর এক সাথী বললেন, "আমরা তো এখনো এশার নামায

পড়িনি। একটু পরে মাকরুহ ওয়াক্ত হয়ে যাবে। চলুন নামায আদায় করে পরামর্শ করি।”

দলপতি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন। একজন আমার পায়ের বন্ধন খুলে দিলেন। একজন ইমামের মুসল্লায় দাঁড়ানো। অপরজন ইকামাত দিতে উদ্যত। এমন সময় একজন ভর্ৎসনা করে বললেন, “হুজুর এ দেখছি পাক্কা মুসল্লি। তাকে ইমামতি করতে দিন।”

দলপাতি মুচকি হেসে পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন। “তাই তো, বুজুর্গ লোক পেছনে রেখে নামায পড়ানো শক্ত বেয়াদবী হবে। যান হুজুর নামায পড়ান।”

এই বলে আমাকে ঠেলে ইমামের মুসল্লায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমিও কিছু না বলে ইকামাতের নির্দেশ দিলাম। সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি জীবনের শেষ নামায মনে করে বিগলিত কণ্ঠে ক্বিরাত পড়তে লাগলাম। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আলে ইমরানের ২৫নং আয়াত থেকে ২৮নং আয়াত পর্যন্ত পাঠ করলাম। যার অনুবাদ নিম্নরূপ–

“বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতর। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।”

দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করলাম। এটা জীবনের শেষ রাকাত মনে করে যত সুন্দর সম্ভব পড়তে চেষ্টা করলাম। আল্লাহর ছানা-ছিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে প্রেমসাগরে তুফান আরম্ভ হল। তাই কেঁদে কেঁদে পাঠ করছিলাম। নামাযের মধ্যেই পেছনে থেকে কান্নার সুর শুনতে

পেলাম। এভাবে দু'রাকাত নামায শেষ করে আল্লাহর দরবারে আখেরী প্রার্থনা জানালাম। এতে নিজের জন্য, পিতা-মাতা, প্রতিবেশী ও দেশবাসীর জন্য এবং সমস্ত মুজাহিদদের জন্য দোয়া করলাম। দোয়া করলাম আল্লাহর যমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে যেন শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করতে পারি।

মোনাজাত শেষ করে সুন্নত ও বেতর আদায় করে পশ্চাতে মুখ করে বসলাম। চেয়ে দেখি সবাই এখনো দু'হাতে চেহারা ঢেকে কাঁদছেন। কিছুক্ষণ পর দলপতি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা! তোমার আসল পরিচয়টা দাও। কোথায় তোমার বাড়ী, কি তোমার বংশ পরিচয়? এখানে কেন এলে তা সত্য সত্য বল। সাবধান মিথ্যা বলবে না। নির্ভয়ে বল।"

আমি বললাম,"জনাব! সত্য বলার জন্য উপদেশ দিতে হবে না। আমি মিথ্যা বলি না। তবে শুনুন আমার ক্ষুদ্র জীবনের হৃদয়-বিদারক ঘটনাবলী।

আমার নাম হাফেজ খোবায়েব। পিতা আল্লামা ইউসুফ শহীদ (রহঃ)। আর দাদাজানের নাম আমীরজান বাগদাদী (রহঃ)। বাড়ী জাম্‌বুলে। আমি সমরকন্দের আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলাম। আমার পিতা ছিলেন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপরিচালক। বলসেভিকরা ধরে নিয়ে আমার আব্বাকে শহীদ করে দিয়েছে এবং মাদ্রাসা বন্ধ করে লাল ফৌজদের সেনা ছাউনিতে পরিণত করেছে। এরপর আম্মার অসহায়ভাবে মৃত্যুর কথা, ছায়েমার বিপ্লবী জীবনের কথা, বিভিন্ন অপারেশনের কথা এক এক করে বর্ণনা করলাম।

আমার মর্মান্তিক ঘটনাবলী শুনে সকলেই কাঁদতে লাগলেন। আমার কথা শেষ হতে না হতেই সকলে হস্ত প্রসারণপূর্বক চুমু দিতে লাগলেন এবং করজোড় ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তাঁদের এ ব্যবহার আমি কল্পনাও করতে পারেনি।

দলপতি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, "বাবা! আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে না চিনে তোমার উপর জুলুম করেছি। আমি তোমার আব্বার প্রথম জামানার ছাত্র। আমার নাম আবদুর রহমান হানাফী।"

তিনি আরো বললেন, "পত্র-পত্রিকায় তোমাদের সফল

অভিযানের কথা শুনেছি। আনোয়ার পাশা (রহঃ) প্রায় সময় তোমাদের অভিযানের কথা বলে আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন। এমনকি তোমাদের সাথে সাক্ষাত হওয়ার জন্য দোয়াও করতেন। আজ তিনি আমাদেরকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে জান্নাতে চলে গেছেন। আল্লাহর শোকর এতদিন পর তোমার সাক্ষাত পেলাম।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জনাব! আপনি কোন্ দায়িত্বে আছেন?"

তিনি বললেন, "আমি সামরিক বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি।"

সেনাপতির দর্শন লাভে আমার অন্তর আনন্দে নেচে উঠল। বাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন, "বাবা! আমি তোমার ফুফা। আর ওঘরে তোমার ফুফিমা। আমরা অনেক দুঃখ-কষ্ট করে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি।"

অতঃপর তাঁর দুঃখের ইতিহাস শোনালেন।

ফুফা আমাকে ফুফিমার নিকট নিয়ে গেলেন। ফুফিমা আমাকে পেয়ে খুব রোদন করলেন। বললেন, "বাবা! তোমার খোঁজে ছায়েমা ও মাছুমা এসেছিল। চুপি চুপি ওদের পরিচয় আমার কাছে দিয়েছে। এখানে দু'দিন অবস্থান করে না বলেই চলে গেছে। জানি না এখন কোথায় আছে।"

আলাপ-আলোচনায় সারা রাত কেটে গেল।

[পঁচিশ]

শ্রীনিধি নিনাল তুংগা ছায়েমাকে বললেন, "মুসাফির বাবা! তোমরা অনেক দূর থেকে এসেছ। আমি তোমাদের উপযুক্ত খেদমত করতে পারব না ঠিক, তথাপি আশা করব, তোমরা আমাকে কিছুদিন মেহমানদারী করার সুযোগ দেবে। তোমরা তো মুসলমান, আমাদের রান্না খাবেও না আর তা তোমাদের রুচিসম্মতও হবে না। আমি তোমাদের জন্য মুসলমানদের ঘরে খানাপিনার ব্যবস্থা করে দেব। তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।

বৌদ্ধ বিহারের সর্দার শ্রীনিধি নিনাল তুংগা বড় দয়ালু মানুষ। তার ভদ্রসুলভ আচরণে ছায়েমা খুবই প্রীত। তাই সর্দারের সাদর

আমন্ত্রণে রাজি হয়ে বলল, "সর্দারজী! আপনার অমায়িক ব্যবহারে আমরা আনন্দিত। আমরা আরো দু'-চার দিন আপনার এখানে অবস্থান করব, ইনশাল্লাহ্।

বৌদ্ধ বিহারের আশে-পাশে কিছু মুসলমান বস্তিও ছিল। ঐসব মুসলমান খবর পেয়ে দলে দলে ছায়েমা ও মাছুমাকে দেখতে আসে। সকলেই এ সুদর্শন চেহারা দেখে আবেগাপ্লুত। নও-মুসলমানরা স্বদলবলে আসে ছায়েমার কাছে ধর্মোপদেশ শোনার জন্য। ছায়েমা তাদেরকে জরুরী মাসআলা-মাসায়েলের তালিম দেয়। বৌদ্ধরাও অনেকেই তালিমের আসরে যোগ দেয়। একবার এক যুবক ছায়েমাকে খুব বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা মুসাফির ভাই! আমরা একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছি। তার একটা সমাধান আপনার যবান থেকে শুনতে চাই।"

ছায়েমা যুবকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বলুন, আপনাদের সন্দেহটা কি?"

যুবক বলল, "ভাইজান! পোশাক-পরিচ্ছদে বুঝায় আপনারা লালফৌজ। আবার নামাযও পড়তে দেখি। ডাকাতদের কাছে পাওয়া মালামালও আমাদের পৌঁছে দিলেন। লালফৌজরা তো এমন করার কথা না। বরং মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচার করে মাল–সামানা নিয়ে যায়। ধর্ষণ, খুনখারাবিই হল ওদের কাজ। আপনাদের আসল পরিচয়টা জানতে পারি কি?"

যুবকের প্রশ্নের উত্তরে ছায়েমা বলল, "আমরা সরকারী সৈন্য নই, যদিও পোশাক তাদের। আমরা মুসলমান এবং মুজাহিদ। আমরা আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করি। তাছাড়া বঞ্চিতের অধিকার আদায় করতে, জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করতে, অনাথ-অনাথিনীর মলিন মুখে হাসি ফুটাতে, ভুখা-নাঙ্গার মুখে অন্ন তুলে দিতে, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিতে, বিধবা-এতিম-কাঙ্গাল ও অসহায়দেরকে শান্তি দিতে আমরা আমাদের জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা বিধান করতে আমরা জিহাদ করি। দেশ এবং জাতিকে আগ্রাসন থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করি।"

ছায়েমার কথা শুনে এক যুবক বলে উঠল, "আমরা তো জানি, মুজাহিদরাই চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুট-তরাজ, খুন-খারাবী, অপহরণ, ব্যভিচার অর্থাৎ যাবতীয় অসামাজিক কাজ-কর্মে লিপ্ত। এরাই এগুলো করে।"

ছায়েমা চোখ দু'টি লাল করে যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি যেসব কথা বলেছ, তার প্রমাণ অবশ্যই তোমাকে দিতে হবে।"

যুবক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "স্যার! আমাকে মাফ করবেন! কিছু দিন আগে বলসেভিক কর্মীরা আমাদের এলাকায় এসে সবাইকে ডেকে এসব কথা বলে গেছে। তারা এও বলেছে যে, ওদেরকে যেভাবেই পার ধরিয়ে দেবে। তাতে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাবে। তাছাড়া আমাদের এলাকায় প্রতি রাতেই কোন না কোন বাড়ীতে বা রাস্তাঘাটে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, অপহরণ হচ্ছে। তারা ডাকাতি করার সময় বলে, আমরা মুজাহিদ, যা আছে দিয়ে দে। মাঝে-মধ্যে কাগজও লিখে যায়।"

যুবকের কথায় ছায়েমা গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ে। মাছুমা ছায়েমাকে বলল, "আপু! এবার আমার বুঝে এসেছে কারা এসব অপকর্ম করে মুজাহিদদের বদনাম ছড়াচ্ছে। ওরাই বলসেভিক। কমিউনিজমের কর্মী। জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য, মুজাহিদদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য পরিকল্পিতভাবে তারা এগুলো করছে।"

ছায়েমা মাথা নেড়ে বলল, "তোমার ধারণা সম্পূর্ণ সত্য।"

ছায়েমা উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলল, "ওহে লোক সকল! আপনারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছেন বলসেভিক দুশমনদের হাতে। আবার তারা মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক সংবাদ ছড়িয়ে আসল সত্য ধামা চাপা দিচ্ছে। বিভ্রান্তির ধুম্রজালে আপনারা আটকা পড়ে আছেন।"

সে আরো বলল, "হে যুবক ভাইয়েরা! তোমরা আজ খেলাধুলায় মেতে আছ। আনন্দ-ফূর্তিতে মূল্যবান সময় নষ্ট করছ। তোমাদের মুসলিম ভাই-বোনেরা জিন্দাখানায় শৃঙ্খলাবদ্ধ। অনেক আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখকে সাইবেরিয়ার তুষারাঞ্চলে বন্দি করে রেখেছে। সেখানে জনমানবের চিহ্নটুকু নেই। আছে বরফ আর বরফ। সন্তানহারা জননীর বুকফাটা চিৎকার, স্বামীহারা নারীর

আর্তনাদ, এতীম-অসহায়ের আহাজারী প্রতিদিন শুনতে হচ্ছে। তাদের প্রতি কি তোমাদের কোন মায়া-মমতা নেই? কত মা-বোন ইজ্জত হারিয়ে পথে পথে ঘুরছে। লুটতরাজ, রাহাজানী আর চুরি-ডাকাতিতে নিরীহ জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এসব অপকর্মের প্রতিকার কে করবে?"

"হে যুবক বন্ধুরা! ঐসব মজলুম তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। তোমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে– হে যুবক! হে তরুণ! আমাদেরকে উদ্ধার কর। কোথায় ওমর-হায়দার, কোথায় তারেক-যিয়াদ, কোথায় সালাহউদ্দীন আইউবী, কোথায় মাহমুদেরা, কোথায় তাদের উত্তরসূরী জওয়ানরা। তোমরা জাগো, ভীরুতা ও কাপুরুষতার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমাদের উদ্ধার কর।"

ছায়েমার তেজোদ্বীপ্ত ভাষণে যুবকদের মধ্যে এক জাগরণ সৃষ্টি হল। সাড়া পড়ে গেল যুব-মনের ঘুমন্ত অন্তরে। অসামাজিক ও অন্যায় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার মত মনমানসিকতা সৃষ্টি হল তাদের অনেকের মনে।

এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল, "হে আমাদের সম্মানিত মেহমান! আপনার কথাগুলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। শুধু হৃদয়গ্রাহী নয়, অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর কথা। আমাদের অবস্থা এতই শোচনীয়, যা ভাষায় ব্যক্ত করতেও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। এমন কোন রাত যায় না যে, তাতে কোন না কোন বাড়ী লুণ্ঠিত হচ্ছে না। রাতের ঘুম এলাকাবাসীর জন্য হারাম হয়ে গেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যা করতে হয়, আমরা তাই করতে প্রস্তুত আছি। আপনি দয়া করে আমাদেরকে কাজ করার সুযোগ করে দিন।"

ছায়েমা বলল, "আজ থেকে আপনারা জিহাদের নিয়তে নিয়মিত ব্যায়াম করতে থাকুন আর একটি বাইতুল মাল গঠন করে সাধ্যানুসারে অর্থ জমা করতে থাকুন। এ অর্থ দ্বারা অস্ত্র ক্রয় করা হবে। যদি কয়েকটি অস্ত্র এই এলাকায় এসে যায় আর আপনারা দু'একটি সফল অভিযান পরিচালনা করতে পারেন, তবে এ এলাকা থেকে সন্ত্রাসীরা পালাতে বাধ্য হবে।"

ছায়েমা ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে একজনকে

আমীর নিযুক্ত করল। তারপর ব্যায়ামের কিছু আইটেম শিখিয়ে সবাইকে বিদায় জানাল।

বেলা দু'টা। ছায়েমা মাছুমাকে নিয়ে সর্দারজীর মেহমানখানায় এসে খানাপিনা সেরে নামায আদায় করে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য খাটে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে উভয়কে অচেতন করে দিল। বিকাল চারটায় ঘুম ভেঙ্গে গেলে গাত্রোত্থান করে আসর নামাযের জন্য তৈরী হল। ছায়েমার অন্তরে শান্তি নেই। নৈরাশ্যের উর্মিমালায় সাঁতার কাঁটছে যেন। কূল-কিনারা নেই। ক্ষণে ক্ষণে অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস।

মাছুমা ছায়েমার মলিন বদন অবলোকন করে বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন মতেই ছায়েমার সুন্দর মুখের মলিনতা দূর হচ্ছে না। মাছুমার অন্তরেও দুঃখের অবধি নেই। তারপরও মাছুমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাছুমা ছায়েমাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বলল, "আপু! ঐ দেখুন কুকান্দুজের বনভূমি ও জাবালার পর্বতশৃঙ্গ কত সুন্দর, মত মনোরম! চলুন না এক শুভ বিকালে ঐদিক থেকে একটু ঘুরে আসি। যাবেন আপু? ঐ দেখুন কত সুন্দর সুন্দর পাখি ডানা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে। শুনুন না ওদের কলকাকলি কত মধুর, কত মন মাতানো। আহ্, অমন করে যদি আমরা দু'জন উড়ে বেড়াতে পারতাম। ইস্ কি মজাটাই না হত, তাই না বোন? চল না এ পড়ন্ত বেলায় ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসি। যাবে আপু?"

ছায়েমা মৃদু হেসে বলল, "তোর জ্বালায় আমি একটু নীরবে বসে চিন্তাও করতে পারব না। তুই আছিস শুধু মানুষের জ্বালা বাড়ানোর ধান্দায়। এ অবেলায় ওদিকে ঘুরতে যাবি নাকি? জানিস না ওখানে সাপ-বিচ্ছু ও হায়েনাদের বসবাস। দু'দিন আগে না গিয়েছিলাম, দেখেছিস না মজাটা? এ অসময়ে আবার বনে বনে বেড়াতে চাস? দেখ না পাহাড়ে পাহাড়ে কেমন আঁধার নেমে আসছে। মাগরিবের আগে তো ফিরে আসা যাবে না। তবে চল, সামান্য ঘুরে আসি।"

এই বলে একে অপরের হাত ধরে ধীরগতিতে কুকান্দুজের দিকে হাঁটতে লাগল।

ছায়েমার মুখে হাসি নেই, আছে শুধু চিন্তা। সামান্য কিছু দূর গিয়ে একটি টিলার উপর গিয়ে বসল। চারদিকে সবুজ-শ্যামলের মাতামাতি। স্নিগ্ধ সমীরণ বইছে, শরীর জুড়াচ্ছে। পাখীরা গান গাইছে। এ যেন এক আনন্দময় বিকাল। ছায়েমা উদাস নেত্রে তাকিয়ে আছে মুক্তপানে। হঠাৎ যেন তার অন্তরে তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল। দৃষ্টি মাছুমার দিকে ফিরিয়ে ছায়েমা বলল, "মাছুমা! চল বোন, আজ রাতে একটা অপারেশন চালাই। এসব এলাকায় তো প্রতি রাতেই চুরি-ডাকাতি হয়, আর দোষ চাপায় মুজাহিদদের উপর। আমরা যদি ডাকাত দলের কিছু একটা ক্ষতি করতে পারি, তবে হয়ত এসব এলাকার ডাকাতিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তুমি কী বল?"

মাছুমা খানিকটা চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে, প্রস্তুতি নাও।"

এদিকে সূর্য্য পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার উপক্রম। একটু পরেই সূর্য্য মসিভাণ্ড ঢেলে দেবে বসুন্ধরায়। তাই আর বিলম্ব না করে টিলা থেকে নেমে বৌদ্ধ বিহারের দিকে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্দারজীর বাড়ীতে আঙ্গিনায় এসে হাজির হল। নামায আদায় করে তিলাওয়াতে বসে গেল। সর্দারসহ বাড়ীর আশপাশের লোকজন কান পেতে কালামে পাক তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হল। অনেকেই মনে মনে ভাবছে, ছেলেটার কি সুন্দর চোহারা আর কত মধুর তিলাওয়াত!

রাত আনুমানিক আটটা পর্যন্ত ছায়েমা তিলাওয়াত করল। অনেকেই ভেবেছিল, হয়ত কিছু আলোচনা করবে। কিন্তু আজ তা করেনি, বরং আজকের মত সবাইকে বিদায় দিয়ে ঈশার নামায আদায় করল। তারপর খানা খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রাত বারটা। ছায়েমার চোখে ঘুম নেই। মাছুমা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। ছায়েমা মাছুমাকে আলতো ঝাঁকুনী দিয়ে বলল, "ওরে বে-খবর! আর কত ঘুমাবি? এবার জাগ না। দেখ না দুনিয়াটা কেমন হয়েছে।"

ছায়েমার ডাক শুনে মাছুমা জেগে গেল। বলল, "যা অজু করে আয়।"

মাছুমা অজু করে দু'রাকাত নামায পড়ে ছায়েমার নিকট গিয়ে বসল। ছায়েমাও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে দরজা বন্ধ করে অস্ত্র দু'টি নিয়ে বসল। তারপর ভালভাবে প্রতিটি পার্স খুলে খুলে মুছে

তেল লাগাল। ম্যাগজিনে গুলী ভর্তি করে নিল।

রাত প্রায় ১টা। আর বিলম্ব করা যায় না। এই সময়েই বেশীর ভাগ ডাকাতি হয়ে থাকে। তাই আর দেরি না করে অস্ত্র কাঁধে তুলে বেরিয়ে এল।

নিঝুম রাত। অন্ধকারে ছেয়ে আছে দশদিক। কেউ বাইরে নেই। সবাই নিজ নিজ কক্ষে অর্গলাবদ্ধ। নীরব-নিথর এই ধরণী। মাঝে-মধ্যে দু'একটি কুকুরের কর্কশ আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। মাথার উপর অম্বরী নামক চাঁদোয়া ছড়ানো। তারই নীচে নক্ষত্র নামক লণ্ঠন মিট মিট করে জ্বলছে। তাছাড়া আর কোথাও কোন প্রজ্বলিত প্রদীপ দৃষ্টিগোচর হয় না। জোনাকিরাও আজ যেন অন্য কোন প্রোগ্রামের জন্য কোথাও চলে গেছে। না হয় মসিলিপ্ত দুনিয়া থেকে ভয়ে পালাচ্ছে। মনে হল, কে যেন দুনিয়াবাসীকে না জানিয়ে মসিভাণ্ড উপুড় করে ফেলে দিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। তা না হয় এত অন্ধকার এলো কোত্থেকে। অন্ধকারে হারিয়ে গেল অকুতোভয় দুই মুজাহিদ। অন্তরে শিকার ধরার নেশা। ওরা জানের মায়া ত্যাগ করে, জীবন বাজি রেখে, নিশাচরের ভয় দূর করে পল্লীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ যেন কোন সাড়া শব্দ না পায় সে জন্য বিড়ালের মত পা ফেলে অগ্রসর হচ্ছে। গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণ থেকে গগনবিদারী একটা চিৎকার ভেসে আসল। থমকে দাঁড়াল ছায়েমা। কানটা ভাল করে এদিক-ওদিক ঘুরাল। মাছুমাকে জিজ্ঞাসা করল, এটা উত্তর-পূর্ব নয়?

মাছুমা বলল, হাঁ এটা পূর্ব-উত্তর কোণ।

দূর কতটুকু? জিজ্ঞাসা করল ছায়েমা।

মাছুমা বলল, রাতের আওয়াজ অনেক দূরে যায়। এ হিসাবে মনে হয় আধা কিলোমিটার হবে। ছায়েমা দ্রুত পদে চিৎকারের সুর ধরে এগিয়ে চলল। সামান্য কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পরই ওখান থেকে আরো একটু ডানদিকে বেশ ক'জন লোকের কান্না একযোগে শোনা গেল। তখনো প্রথমবারের চিৎকার মিলিয়ে যায়নি।

ছায়েমা মাছুমাকে বলল, এ যে ডাকাতি হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ

নেই। প্রথম চিৎকারে সন্দেহ ছিল যে, ডাকাতি না কোন মৃত্যুর সংবাদ। এখন বুঝতে বাকী নেই যে, কোথাও ডাকাতি হচ্ছে। মৃত্যুর বিলাপ বাড়ী বাড়ী হয় না।

ডাকাতদলের এক বছরের অর্জিত ধন-দৌলত সবই খোয়া যাওয়ার কারণে তারা খুব ক্ষিপ্ত। তাই তারা ক্ষতি পূরণের জন্য পাইকারী হারে ডাকাতি ও লুটতরাজ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। এ জন্য নির্বিচারে লুণ্ঠন আরম্ভ করেছে।

ছায়েমা অনেক ভেবে-চিন্তে আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী করল। সে চিন্তা করল, এভাবে আক্রমণ করলে হয়ত শত্রুদের সমূলে ধ্বংস করা যাবে না। ছুটাছুটি করে ২/১ জন হলেও পালিয়ে যাবে। আর যদি আমরা তাদের ফিরে যাওয়ার পথে এ্যাম্বুশ লাগাতে পারি, তবে কেউ হয়ত বাঁচতে পারবে না। ছায়েমা আরো একটু এগিয়ে পরপর ৩টি ফায়ার করল। ফায়ারের বিকট শব্দে ডাকাত দল ভয় পেয়ে গেল। ওরা ভাবছে, হয়ত এখানে কোন সেনাবাহিনী ছাউনী ফেলেছে। তাই তারা পালানোর পথ ধরল।

ছায়েমা চিন্তা করল, ওরা ডাকাতি করে নিশ্চয়ই অরণ্যে আশ্রয় নেবে। তাই অরণ্যে প্রবেশের সম্ভাব্য একটি রাস্তার পার্শ্বে প্রকাণ্ড এক বিটপীর আড়ালে মাছুমাকে নিয়ে এ্যাম্বুশ লাগাল। মাছুমাকে জানিয়ে দিল যে, শত্রুরা রেঞ্জের ভেতর আসার সাথে সাথে একযোগে ব্রাশফায়ার আরম্ভ করতে আর যথাসাধ্য বৃক্ষটিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে।

উভয়ে মৃতের মত ওঁৎপেতে দুশমনের জন্য অপেক্ষা করছে। বেশ সময় কেটে গেল। দুশমনের কোন পাত্তা নেই। মশা ও পিঁপড়া দু'জনকে অতিষ্ঠ করে তুলল। তবু নড়াচড়া করছে না। মশা-পিঁপড়ার কামড় থেকে বাঁচার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর মাছুমা বলল, "আপু! আর পারছিনে। দুশমনের তো কোন খবরই নেই।"

ছায়েমা বিরক্ত হয়ে বলল, "প্রয়োজন হলে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে হবে। যদি এপথে দুশমন না-ই আসে, তবে তো কিছু করার নেই। কিন্তু আরো কিছু সময় ধৈর্য ধরে বসে দেখি কী হয়।"

ছায়েমার কথা শেষ হতে না হতেই একটু দূরে টর্চ লাইটের ক্ষীণ আলো প্রকাশ পেল। ছায়েমার অন্তর একদিকে আনন্দে ভরপুর অপরদিকে ভয়ে হাঁটু কাঁপছে। এতক্ষণে ডাকাত দল রেঞ্জের ভেতর এসে গেছে। ছায়েমা মাছুমাকে সংকেত দিল অস্ত্র তাক করার জন্য।

মাছুমা তৈরী। একযোগে গর্জে উঠল দু'টি ক্লাশিনকভ। বেরেলের ছিদ্রপথে বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক গুলী। কেড়ে নিল ৫ ডাকাতের জান। গুরুতর জখমী হয়ে কাতরাচ্ছে দু'জন।

ছায়েমা ছুটে গেল তাদের নিকট। দেখল তাদের অবস্থা। ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে আর ২ জন আহত। এর মধ্যে একজন সামান্য যখম নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। ছায়েমা তাকে ফিরিয়ে এনে দেখে মুমূর্ষু ব্যক্তিটিও মৃত ৫ জনের সাথী হয়েছে। তাদের কাছে লুণ্ঠিত মালামাল বেশী ছিল না। কারণ, দু'টি বাড়ী ডাকাতির পরই তো ওদের চলে আসতে হল। তাদের কাছে পাওয়া গেল গুলীবিহীন একটি কাটা রাইফেল, ২টি পাইপগান, ৬ রাউন্ড গুলী আর ৪টি ছোরা।

ছায়েমা এসব মালামাল ও আহত দুশমনকে নিয়ে চলল সর্দারজীর বাড়ীতে।

এদিকে প্রচন্ড গুলীর আওয়াজে গ্রামবাসীরা জেগে ওঠেছে। অনেকেই ছুটে গেল সর্দারের নিকট। খোঁজ করছে মুসাফিরের। সর্দার অবাক হয়ে বলল, "হায়, মুসাফিররা গেল কই! ওদেরকে দেখছি না যে!"

এক যুবক বলে উঠল, "সর্দারজী! বেড়ায়ই ক্ষেত খেল নাকি? ওরাই তাতে জড়িত কিনা?:"

সর্দার নিরুত্তর। কি বলবে তা ভেবে পাচ্ছেন না। এরই মধ্যে একজন বলে উঠল, "সর্দারজী! শুনুন, শুনুন ওইদিকে কাদের যেন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ওরা কারা? বনের দিক থেকে এদিকে আসছে! ডাকাত না তো?"

এরই মধ্যে ছায়েমা উচ্চ আওয়াজে দিল, "ভাইসব! আমরা মুসাফির। আমরা এসেছি।"

ডাক শুনে এক যুবক মশাল হাতে এগিয়ে গেল তাদের দিকে।

সর্দারজী মশালের আলোতে বন্দিকে ভালভাবেই চিনে নিলেন। তাছাড়া অনেকেই চিনেছে তাকে। সর্দার বন্দির জবান থেকে গোপনীয় অনেক কথাই জানতে পারলেন।

ডাকাত বলল, "আমরা বলসেভিকদেরই একটি গ্রুপ। আমাদের কাজ হল, এখনো যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঁচতে চায়, তাদেরকে শেষ করা। আপাতত লুটতরাজ ও অপহরণ চলছে। প্রয়োজনে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশও রয়েছে। আমাদের আরো একটা কাজ হল, আমাদের কর্মকাণ্ডের দায়ভার মুজাহিদদের উপর চাপিয়ে দেয়া।"

বন্দির জবানবন্দি শেষ হলে ছায়েমা তাকে নিয়ে গেল বাড়ীর বাইরে। তারপর বুক বরাবর একটি গুলী ছুঁড়ে তাকেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল।

ছায়েমা সর্দারকে বলল, "জনাব! এসব এলাকায় আর হয়ত ডাকাতি হবে না। মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে।"

সে আরো বলল, "সর্দারজী অমুক স্থানে আরো ৫টি লাশ পড়ে আছে। তাদেরকে তুলে কোন পরিত্যক্ত কূপে নিক্ষেপ করলে ভাল হয়।"

সর্দার লাশগুলো গুম করার নির্দেশ দিলে একদল যুবক বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর কাজ সমাধা করে ফিরে এল।

ছায়েমা সবাইকে বিদায় দিয়ে শয্যাগ্রহণ করল।

পরদিন ভোরবেলা। অনেক লোকজন এসে সর্দারের বাড়ীতে জমায়েত হল। ছায়েমা মুসলমান যুবকদেরকে উদ্দেশ করে বলল, তোমরা কি সত্যি জিহাদ করবে?

সবাই একসুরে বলে উঠল, জ্বি মুসাফির ভাইয়া! আমরা জিহাদ করব।

ছায়েমা বলল, জিহাদ করতে হলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রশিক্ষণ ছাড়া জিহাদ করতে পারবে না। আমি এখনই তোমাদেরকে দু'টি অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেব।

ছায়েমা প্রথমে গনীমতের রাইফেল তারপর ক্লাশিনকভের প্রশিক্ষণ দিল। ছায়েমা অস্ত্রটাকে ৩ ভাগে ভাগ করে পার্টে পার্টে বুঝাতে লাগল। যেমন- (১) বাট (২) বডি (৩) বেরেল।

প্রথমে বাট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলল, বাট ২ প্রকার। হিল বাট ও টুবাট। বাটের তলায় থাকে বাট হোম। এর মধ্যে গানঅয়েল

নেকড়া ও ফিতা রাখা হয়, যা গান মোছার কাজে সাহায্য করে। বাটের এক পার্শ্বে রয়েছে বেল্টকেস, যার মধ্যে বেল্ট লাগানো হয়।

বডি-এর উপরে রয়েছে রেঞ্জপ্লেট, যা দূরে এবং নিকটে গুলী ছোঁড়ার জন্য সাহায্য করে। বেগ ছাইট ইউআর ফরসাইট নফ এক বরাবর করে ট্রিগার টানলে নির্দিষ্ট নিশানায় গুলী লাগে।

বডির নীচে রয়েছে ট্রিগার। ট্রিগার গার্ড ও ট্রিগার লক। অন্য পার্শ্বে রয়েছে কাকিং হেন্ডেল। গ্যাসওয়ে, গ্যাস সিলিন্ডার, গজ, পিষ্টন, বোল্ড, ফায়ার পিন, ম্যাগজিন, ম্যাগজিন লক।

অর্থাৎ ছায়েমা বাইরের গ্রুপ ও ভেতরের গ্রুপ খুলে খুলে দেখাল। নামও মুখস্ত করাল, কার কি কাজ তা বর্ণনা করল। বারবার খুলে এবং ফিট করে শিখাল। তারপর গনীমতের অস্ত্রগুলো আমীর সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে বলল, আপাতত এগুলো দিয়ে কাজ চালিয়ে যান। তারপর নিজেরা আরো অস্ত্র ক্রয়ের জন্য চেষ্টা করবেন। সাহসিকতার সাথে কাজ চালিয়ে গেলে প্রচুর গনীমত হাতে আসবে। তারপর ছায়েমা সবাইকে প্রয়োজনীয় নছিহত করে বিদায় দিয়ে মাছুমাকে নিয়ে মেহমানখানা গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

[ছাব্বিশ]

আমার ফুফী আনন্দে আত্মহারা। কী খাওয়াবেন, কী আপ্যায়ন করবেন ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছেন। সেই শিশুকালে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমিই ছিলাম তার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র। তাই আদর-সোহাগের অভাব ছিল না। ফুফিমা কেঁদে কেঁদে বললেন, "বাবা! তোমার জন্য তোমার মা কত কেঁদেছে। দিন-রাত বেদনা সইতে না পেরে শুধু বুক চাপড়াত ও মাথার চুল টেনে চিড়ত। আমরা তাকে কত যে বুঝানোর চেষ্টা করেছি; কিন্তু মানাতে পারিনি।"

ফুফিমা আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আরো বললেন, "বাবা! এ অল্প বয়সে তোমাকে মাতাপিতা হারাতে হল। হারাতে হল বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী। তোমাকে হারাতে হল খেলার সাথীদের। কত করুণ ইতিহাস।"

তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, "বাবা! তোমার সুখে

হাসবে, তোমার দুঃখে কাঁদবে এমন কেউ জগতে নেই। কোথাও তুমি আশ্রয় নেবে, এমন কোন মানুষ নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিল, তারা কেউ বেঁচে নেই। অনেকে শহীদ হয়েছে। অনেকে বাড়ী-ঘর হারিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। আবার শুনেছি কেউ কেউ নাকি আফগানিস্তানের দিকে হিজরত করছে। বাবা খোবায়েব! তুমি খেয়ে না খেয়ে পথে পথে ঘুরে সোনার মত দেহটা ছাই বানিয়েছে। কাজেই কিছুদিন এখানে বিশ্রাম কর। ঘুম-গোসল, খানাপিনা ও কিছুদিন নিশ্চিন্তে থাকলে স্বাস্থ্যটা একটু ভাল হবে। তোমার ফুফা তোমার জন্য বন থেকে হরেক রকম পাখী, বন মোরগ, বক, ঘুঘু শিকার করে আনবেন। আমি সুন্দর করে তোমাকে রান্না করে খাওয়াব। এভাবে যদি কিছু দিন ভাল ভাল খানা-পিনা কর, তবে শরীরে প্রচুর শক্তিও পাবে। জিহাদ করতে অনেক শক্তির প্রয়োজন। শক্তি ছাড়া জিহাদ করা যায় না।”

শিকারের কথা শুনে আমি ফুফিমাকে প্রশ্ন করলাম, “ফুফু আম্মা! ফুফা কি দিয়ে শিকার করেন?”

ফুফিমা আমাকে ইশারা দিয়ে দেখালেন, “ঐ দেখছ না ঝুলানো জাল। ওটা দিয়ে। তাছাড়া তীর-গুলাল দিয়েও শিকার করেন। তিনি শিকারে গিয়ে কোনদিন খালি হাতে ফিরেন না।”

আমি বললাম, “ফুফু আম্মা! আমার কোন আশ্রয় নেই বলা ঠিক হবে না। বর্তমানে যেখানে অবস্থান করছি এটা কি আমার আশ্রয় নয়? আমি এখানেই থাকব। আপনার কথাগুলো আম্মুর মতই। আপনাকে দেখলে আম্মুর কথা মনে পড়ে। আপনিও আম্মুর মত আদর করেন। কাজেই আমি এখানেই থাকব। তবে আজকে একটু সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে যাব। সেখানে গিয়ে রাস্তাঘাট চিনে সকলের সাথে পরিচিত হয়ে আসব। তাহলে পরে নিজে নিজেই মার্কাজে যেতে পারব।”

আমার কথায় ফুফিমা রাজি হলেন বটে, কিন্ত ২ দিনের মধ্যে ফিরে আসার ওয়াদা নিয়ে ছাড়লেন।

সেনাপতি সাহেব অন্য দু'জনকে মালামালগুলো গাঁধার পিঠে তোলার নির্দেশ দিলেন। খাদ্যদ্রব্যগুলো অন্যান্য সাথীরা গাঁধার পিঠে

তুলে দিলেন। কাফেলা সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগল। আমিও চললাম কাফেলার সাথে।

দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে চলেছে। আনোয়ার পাশার দলে যোগদানের আশা নিয়ে কত পাহাড়-জঙ্গল, গিরি-কান্তার, মরু চরাচর ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে এ পর্যন্ত এসেছি। আজ সে কাঙ্খিত কাফেলার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। ইস্, কি আনন্দ।

আমি আজ আমাদের সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আকিলের অনুসরণ করছি। আমি আজ আনন্দিত ও গর্বিত। আমাদের প্রাণপ্রিয় সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আকিলও আমাকে পেয়ে আনন্দিত। সেনাপতি সাহেব চলার পথে আমাকে বললেন, "বাবা খোবায়েব! তোমাদের অপারেশনগুলোর কথা যখন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হত, তখন আমরা শোকর আদায় করতে গিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়তাম।"

তিনি আরো বললেন, "খোবায়েব! তোমাকে দেখার জন্য আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুজাহিদে আযম আমীরুল মুজাহিদীন হযরত আনোয়ার পাশা শহীদ (রাহঃ) অনেক সময়ই আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন। আজ আমরা তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি বটে, কিন্তু আনোয়ার পাশাকে জনমের মত হারিয়েছি। হয়ত একদিন সাক্ষাত হবে জান্নাতে।"

আলাপ-আলোচনার মধ্যদিয়ে আমরা অনেক রাস্তা অতিক্রম করে এসেছি। সম্মুখে কুকান্দুজের বিশাল অরণ্য আমাদের সামনে। বিশালাকৃতির মহিরুহগুলো সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশচুম্বি বিটপির মাথার উপর দিয়ে জাবালার কৃষ্ণশিলার পর্বতশৃঙ্গ দানবের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এসব দেখলেই গা শিউরে উঠে। উফ্, কি ভয়ংকর! আমরা হাল্কা-পাতলা ছোট-খাট বনগুলো পাড়ি দিয়ে বিশাল অরণ্যের দিকে এগিয়ে চলছি।

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম। এখনো আমরা আসল অরণ্যে ঢুকতে পারিনি। একটু সামনে এগুতেই শুনতে পেলাম পাহাড়ী ঝর্ণার কল কল ধ্বনি। জাবালা পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত হয়ে কুকান্দুজের বনভূমির বুক চিরে আঁকা-বাঁকা হয়ে বয়ে গেছে বহুদূর। আমাদের কাফেলা উক্ত ঝর্ণার নিকট এসে বিরতি টানল।

সেনাপতি সবাইকে লক্ষ্য করে নামাযের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। আমরা মনের আনন্দে হাঁসের মত ঝর্ণায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কেউ হাত-পা ধুয়ে, কেউ মাথায় শীতল পানি ঢেলে আরাম নিচ্ছি।

সেনাপতি অপর এক সাথীকে নিয়ে গর্দভের পৃষ্ঠদেশ থেকে নেমে বস্তাগুলো নামিয়ে নীচে রেখে দিলেন। তারপর গর্দভ তিনটিকে ঝর্ণায় নামিয়ে গোসল করাতে লাগলেন। গর্দভগুলো হিমের পরশ পেয়ে চুপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলাম।

আমরা সকলেই ছিলাম ক্ষুধার্ত। দু'-এক টুকরা রুটির জন্য সবাই ছিলাম লালায়িত। ঝর্ণার পানি পান করে যদিও কিছুটা তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে। কিন্তু খাওয়ার আগ্রহ যেন বেড়ে গেল। সেনাপতি সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! এখনো পথচলার কিছুই হয়নি। বহু পথ সামনে এগিয়ে যেতে হবে। চল, সময় নষ্ট না করে জলদি তৈরী হও।"

আমি ভেবেছিলাম, ঝর্ণার কিনারে বসে আহারাদি সেরে আবার পথ চলব। কিন্তু তা আর ভাগ্যে হল না। পেটে ক্ষুধা নিয়ে আবার কাফেলা অরণ্য পথে সামনে এগিয়ে চলল। কি ঘন বন! কন্টকাকীর্ণ রাস্তা! দু'ধারে রয়েছে বাবলা জাতীয় বৃক্ষ। কাঁটাগুল্মে ভরা চারদিক। এরই মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলছি সামনের দিকে। পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে তাকালে দেখা যায় সবিতার হাসি। কুকান্দুজের গভীর অরণ্যে প্রবেশের পর মনে হল চাঁদনী রাত। একটা স্নিগ্ধ কিরণ ছড়িয়ে আছে চারদিক। অরণ্যের গভীরেও ঠিক এমনই মনে হচ্ছে। আল্লাহর সৃষ্টির বৈচিত্র শোভা আর অবর্ণনীয় সৃষ্টিকৌশল দেখে তারই প্রশংসা করতে করতে চলছি আমরা।

বিকেল ৪টা পেরিয়ে গেছে। ক্ষুধার তাড়নায় সকলের শরীর কাঁপছে। ছোটখাটো টিলা অতিক্রম করার ক্ষমতাও নেই। পদযুগল শরীরের ভার বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে। চোখ কেবলই ভুল দেখে চলছে। গভীর অরণ্যে যেন কোন কৃষাণ সরিষার চাষ করেছে। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। মুখগহ্বর শুকিয়ে নিরস হয়ে গেছে। চলার পথে সাথীরা কন্টকবিহীন পল্লব দল মুঠি মুঠি মুখগহ্বরে

ঢুকিয়ে বকরীর মত চিবিয়ে রস পান করছে। সাথীদের কষ্ট দেখে নিজের বিগত দিনগুলোর প্রতি ধিক্কার আসতে লাগল।

জীবনে যেসব কষ্ট করেছি, তা একান্তই নগণ্য। দ্বীনের জন্য, ইলাহে কালিমাতুল্লার জন্য এত ত্যাগ, এত কুরবানীর পরও কতিপয় নামধারী আলিম আমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করছেন। অপবাদ ছড়িয়ে সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। আমরা আজ মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকার সীমানার বাইরে কেন এসেছি। তার মূল্যায়ন করল না। আমরা তো পারতাম ফ্যানের নীচে বসে দরস দিতে, ইমামতি করতে। এসব আরামের জিন্দেগীকে পদাঘাত করে কষ্টের জিন্দেগী এখতিয়ার করেছি কিসের আশায়, কিসের নেশায়, তা কে বুঝবে? কেন আজ আমরা লোকালয় ছেড়ে স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে হিংস্র পশুদের সাথে বসবাস করাকে বেছে নিয়েছি। যেখানে নেই হাট-বাজার, নেই রাস্তা-ঘাট। পাই না নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার-দাবার। আমাদের দুঃখ-বেদনা কে বুঝবে, কে একটু সান্ত্বনা দেবে বিগলিত হৃদয়ে।

এসব চিন্তা করতে করতে পথ চলছি আর কেঁদে কেঁদে বক্ষদেশ সিক্ত করছি।

সেনাপতি সাহেব কাফেলার গতিরোধ করে বললেন, "ভাইসব! আছরের নামাযের সময় হয়ে যাচ্ছে। জলদি নামাযের প্রস্তুতি নিন।"

আমরা চলার গতি থামিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। জীবনে যত বিশ্রাম নিয়েছি এর মত এত আনন্দদায়ক বিশ্রাম, এত মধুর বিশ্রাম আর কোনদিন করিনি। পানি না থাকায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলাম। নামায শেষ করে জিজ্ঞেস করলাম, "জনাব! গন্তব্য আর কতদূর?"

সেনাপতি উত্তরে বললেন, "এই তো আর সামান্য যেতে হবে।"

কাফেলা এগিয়ে চলছে। ঘোর অন্ধকার। কিভাবে পথ চলব ভেবে পাচ্ছি না। গর্দভগুলো বস্তাপিঠে দন্ডায়মান।

গাঁধা আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। অল্প বোঝা নিয়ে এরা চলতে চায় না। পিঠের উপর বেশী মাল বোঝাই করলে অর্থাৎ পিঠ ভারে বাঁকা হয়ে গেলে ওরা খুব খুশী হয়।

আমাদের নামাযের সময় ওরা অনুগতের ন্যায় চুপ-চাপ আমাদের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইল।

তাছবীহাত আদায় করে কাফেলা আবার চলতে শুরু করল। আমরা আজ দিকহারা পথিক। অন্ধকার আমাদের সাথী। আল্লাহ্ আমাদের রাহবার। চলার পথে কাঁটাগুলো কাপড়-চোপড় আঁকড়িয়ে ধরছে। জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে অনেকেরই। খুব আস্তে আস্তে পথ চলছি। বিরামহীন চলতে চলতে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অনেক গভীরে এসে পৌঁছেছি।

সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আকিল কাফেলার প্রতিরোধ করে বললেন, "প্রিয় মুজাহিদ সাথীরা! তোমরা তো দ্বীনের জন্য অনেক কষ্ট করেছ। কিন্তু সাহাবাদের কষ্টের তুলনায় এ কষ্ট কিছুই নয়। দোয়া কর, আল্লাহ্ যেন আমাদের এ কষ্টকে কবুল করেন। আল্লাহ্ যেন দ্বীনের জন্য অনেক বেশী বেশী কষ্ট করার সুযোগ করে দেন। তোমরা সবাই তায়াম্মুম করে নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ কর।"

আমরা নামায আদায় করলাম। সেনাপতি খানা খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের এক সাথী পুটলী থেকে শুকনো রুটি বের করে সকলের হাতে হাতে পৌঁছে দিলেন। তা চিবানো ছিল খুবই কষ্টকর। পানিও ছিল খুব সীমিত। সকলেই রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে সামান্য পানি পান করে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেনাপতি নিজেই পাহারাদারীর দায়িত্ব নিলেন। একটানা ফজর পর্যন্ত ঘুমালাম। ফজরের নামায আদায় করে কাফেলা আবার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

আমরা বেলা ১টার দিকে মার্কাজে হাজির হলাম। জাবালা পর্বতের পাদদেশে প্রথম মোর্চাটি। এরই আশপাশে ও পর্বত গুহায় ও পর্বতশৃঙ্গে রয়েছে অনেকগুলো মোর্চা। সেনাপতির আগমনের খবর প্রতিটি মোর্চায় মোর্চায় ওয়ারলেসের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হল। গ্রুপ কমান্ডারগণ এসে দেখা করতে লাগলেন। সেনাপতি সকলের অবস্থা জানতে চাইলেন। কমান্ডারগণ নিজ নিজ গ্রুপের অবস্থা, অবস্থান ও কারগুজারী শোনালেন। এতে জানতে পারলাম ৭২ ঘন্টা যাবত তারা না খেয়ে আছে। জাবালার ঝর্ণা থেকে শুধু পানি পান করে জীবন বাঁচিয়ে রেখেছেন তারা।

সেনাপতি সাহেব ৬ বস্তা আটা বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে বললেন, "দিনে একবার আহার করবে। কারণ, ফান্ডে অর্থকড়ি নেই। সহজে খাদ্য সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। ছবর, তাওয়াক্কুল ও দোয়াকে আমাদের পুঁজি বানাতে হবে।"

কমান্ডাররা নিজ নিজ মোর্চায় ফিরে গেলেন।

[সাতাইশ]

ছায়েমা সর্দারজীর বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে কুকান্দুজের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এদিকে গ্রামের ছোট-বড় সবাই বিদায়ী মুসাফিরদেরকে একনজর দেখার জন্য সর্দারজীর বাড়ির আঙ্গিনায় এসে জমায়েত হতে লাগল। সর্দারজীর রাখাল সকাল থেকেই ঘোটক দু'টিকে ঘাস-পানি, খৈল-ভূষি খাওয়াতে ব্যস্ত। ছায়েমা জনতার উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করে–

"হে আমার মুসলমান যুবক বন্ধুরা! বিদায়লগ্নে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় পল্লী সর্দার ও এলাকার মুরুব্বীয়ানে কেরামগণের। পাশাপাশি মোবারকবাদ জানাচ্ছি অত্র এলাকার জনসাধারণের ও টগবগে যুবক বন্ধুদের। আমরা আপনাদের মানবতা, উদারতা, ভদ্রতা, সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা, সহনশীলতা ও পরদুঃখে কাতরতার কথা আজীবন স্মরণ রাখব। আপনাদের স্মৃতি চিরদির অম্লান হয়ে বেঁচে থাকবে আমাদের হৃদয়পটে। গ্রীজওয়ের পথঘাট, গাছগাছালী ও পাখ-পাখালীরাও যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছে, হে পথিক একটু থেমে যাও, একটু বিশ্রাম নিয়ে যাও, একটু অবস্থান কর। অত্র এলাকার শিশুরাও যেন নীরব ভাষায় সম্বোধন জানাচ্ছে। পশুরাও যেন ডেকে বলছে, ওহে মুসাফির! আবার ফিরে এসো এ নিবিড় পল্লীতে। গ্রীজওয়ের জনপদ আমার ভালবাসা। গ্রীজওয়ের নিবৃত পল্লি আমার আশার আলো।"

"হে আমার প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইয়েরা! তোমরা যদি ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাও, জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে চাও, সারাদেশে শান্তির স্নিগ্ধ সমীরণ বইয়ে দিতে চাও, সারা এলাকা যদি মহাশান্তির প্লাবনে ভাসিয়ে দিতে চাও; তবে তোমাদের জন্য জিহাদ

ছাড়া অন্য কোন আমল খুঁজে পাবে না। তাই আজ থেকে বজ্রশপথ গ্রহণ কর, দৃঢ় সংকল্প কর, জিহাদের জন্যে তোমরা দলে দলে আনোয়ার পাশার মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করে জিহাদ চালিয়ে যাব। তোমরা শান্তিতে থাকতে পারবে।”

“ওহে আমার টগবগে যুবক ভাইয়েরা! বিদায় বেলা আমি তোমাদেরকে কয়েকটি কথা বলে যেতে চাই। আশা করি মনের কান দিয়ে শুনবে ও আমল করবে। তোমরা আমার নিকট থেকে যা কিছু শিখেছ, তা ভুলবে না কখনো। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) এরশাদ করেন– ‘যে যুদ্ধবিদ্যা লাভ করে ভুলে গেল, সে যেন নবীর সাথে নাফরমানী করল।’

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন– ‘সত্যিকার মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি, যে ধর্মযুদ্ধের সাথে সাথে নিজের নফসের সাথেও জিহাদ করে।’ (তিরমিযি)।

তিনি আরো বলেন– ‘জান্নাত চিরশান্তির আবাস স্থল। যে ব্যক্তি সেখানে একবার প্রবেশ করবে, তাকে সারা দুনিয়ার রাজত্ব দান করে দুনিয়াতে পুনর্বার প্রেরণ করতে চাইলেও সে রাজি হবে না। কিন্তু শহীদ ব্যক্তির এত বড় মর্যাদা পাবে যে, সে ঐ মর্তবা বৃদ্ধির জন্য আরো দশবার দুনিয়াতে এসে দশবার শহীদ হয়ে মর্যাদা লাভ করার আকাঙ্খা করবে।’ (বুখারী)।

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন- ‘আমার উম্মতের মধ্যে দু’টি দল এমন হবে, যাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। একদল, যারা হিন্দুস্তানে (ইন্ডিয়ায়) জিহাদ করবে, অপরদল যার ঈসা (আঃ)-এর দলভুক্ত হয়ে জিহাদ করবে।’ (নাসাঈ)।

উক্ত হাদীস শ্রবণ করে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, হায়! আমি যদি জীবনে হিন্দুস্তানের জিহাদের সুযোগ পাই, তবে জান-মাল দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করব। যদি সে জিহাদে শহীদ হই, তবে শ্রেষ্ঠ শহীদ হব। আর যদি গাজী হই, তবে দুনিয়াতে আমি দোযখ থেকে মুক্ত হিসাবে বিচরণ করব। (নাসাঈ)।

তিনি বলেন– আমার নৈকট্য লাভের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী আমল হয়েছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।”

ছায়েমা উক্ত হাদীসগুলো শুনিয়ে বলল,

"তোমরা সবসময় আমীরের অনুগত হয়ে কাজ করবে। পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করবে না। পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত যদি নিজের মনের বিরুদ্ধেও হয়, তবু তা পালন করবে। এতেই রয়েছে মঙ্গল। সাবধান! সাধবান! তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। পারস্পারিক বিবাদের কারণে অনেক মুসলিম জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে। নিফাক থেকে দূরে থাকবে। ফেৎনা-ফাসাদ থেকে সবসময় পবিত্র থাকবে। ঐক্য বজায় রাখবে। শয়তান সবসময় ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে। এদিকে বিশেষভাবে নজর রাখবে। গোপনীয়তা রক্ষা করবে। যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর কাছে ফয়সালা চাইবে। সাবধান! আমানতে খেয়ানত করবে না। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

এই কথাগুলো যদি মেনে চলতে পার, তবে আল্লাহর মদদ ও নুসরত পাবে।

আরো একটি কথা বলে যাচ্ছি। তাহল, আমার প্রাণপ্রিয় কমান্ডার খোবায়েব জাম্‌বুলী যদি আবার এখানে আসে, তবে আমার সালাম দিয়ে বলবে, সে যেন এ স্থান ত্যাগ না করে, আমি তার খোঁজে আবার আসব। এখনও তার সন্ধানেই যাচ্ছি।"

ছায়েমার নছীহতপূর্ণ উপদেশ বাণী শেষ হতে না হতেই পল্লী সর্দার দাঁড়িয়ে বললেন, "বাবা! কোন্ আনোয়ার পাশার কথা বলছ? আনোয়ার পাশা নামক এক মুজাহিদ সিপাহসালার তো গত এক দেড় মাস আগে শাহাদাতবরণ করেছেন। তাঁর অসংখ্য অনুসারী বলসেভিকদের প্রচণ্ড আক্রমণে পরপারে বিদায় নিয়েছেন। আর যারা এখনো বেঁচে আছেন, তারা বিভিন্ন পাহাড়-জঙ্গলে, ঝোপ-ঝাড়ে আত্মগোপন করে রয়েছেন। তারা অসহায়, নিরাশ্রয়, মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তারা যদি বন-জঙ্গল থেকে লোকালয়ে বেরিয়ে আসেন, তখন এলাকার সাধারণ মুসলমানগণ তাদেরকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য বলসেভিকদের নিকট খবর পৌঁছিয়ে দেয়। বলসেভিকরা অতর্কিত আক্রমণ করে তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় অথবা হত্যা করে পবিত্র লাশগুলো কোন চৌরাস্তায় গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে।"

ছায়েমা সর্দারের মুখে এই অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদ শুনে অবোধ

বালিকার ন্যায় হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলে। ছায়েমার কান্না দেখে কোমলমতি মাছুমাও ঠিক থাকতে পারল না। উভয়ে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতে লাগল। ছায়েমা নিজেকে সামলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং কাতরসুরে দোয়া করতে লাগল−

"মাওলায়ে কারীম! রাহমানুর রাহীম! আপনার অসহায়া এক দাসী আপনার রহমতের প্রত্যাশী, আপনার দুয়ারে হাজির। আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন।

ওগো আমার মাওলা! নির্যাতিতের কান্ডারী, সিপাহসালার আনোয়ার পাশার শাহাদাতকে কেন্দ্র করে ঘুমন্ত মুসলমানদের অন্তরে জাগরণ দিয়ে দাও। আমার আব্বা-আম্মা, আত্মীয়-স্বজন ও সমস্ত শহীদদের উচ্চ মর্যাদা দান কর।

হে আল্লাহ! আমি যার সন্ধানে পথে পথে পাগলিনীর বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যার বিরহ বেদনায় জ্বলে-পুড়ে ছাই হচ্ছি, যার সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে অঘুম নয়নে রাতযাপন করছি; সেই খোবায়েবকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও।

হে আল্লাহ! বিরহের ব্যথা আর সইতে পারছি না। বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও।

হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দারা শাহাদাতের পথ ধরে তোমার সান্নিধ্যে হাজির হচ্ছে। তাদের পথ ধরে তোমার কাছে হাজির হওয়ার তাওফীক দাও। পাপে পূর্ণ বসুন্ধরা থেকে মুক্তিদান কর। আমীন।"

ছায়েমার সাথে অনেকেই মুনাজাত অংশ নিয়েছে। আমীন আমীন বলে দু'আ কবুলের দরখাস্ত পেশ করেছে।

মুনাজাত শেষে ছায়েমা অশ্ব দু'টি সাজাতে লাগল। উপস্থিত জনতা অশ্রুতে বক্ষদেশ সিক্ত করতে করতে বলল, "ওহে মুসাফির! তোমার আগমনটা ছিল রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক আশির্বাদ। তোমার পদার্পনে আমরা ধন্য হয়েছিলাম। তোমার যথাযথ খেদমত ও উপযুক্ত সম্মান করতে পারিনি বলে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার আগমনে ঘুমন্ত ব্যাঘ্রের ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে। তোমার বক্তব্য মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার করেছে। তোমার অনুপ্রেরণায় আমরা পেয়েছি কর্মপদ্ধতি ও কর্মধারা। দেখিয়েছ মুক্তির

পথ। শুনিয়েছ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শাশ্বত বাণী। তুমি আমাদেরকে দিয়ে গেলে দিক-নির্দেশনা। আমরা তোমাকে জানাই মোবারকবাদ।

ওহে মুসাফির! তোমার পথের যাত্রীদের রেখে কোন্ সুদূরে চলে যাচ্ছ? কুকান্দুজের গভীর অরণ্যে নেই কোন লোকালয়। নেই জনমানবের চিহ্ন। সেখানে হিংস্র জানোয়ারের চারণভূমি। কুকান্দুজের অরণ্যভূমিতে কত শিকারী, কত পথিক, কত কাঠুরিয়া অকাতরে প্রাণ দিয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আমাদেরকে ফেলে রেখে অমন করে চলে যেও না, মুসাফির ভাইয়া! ভালবাসার জাল ছিন্ন করে তুমি যেতে পারবে না।”

ছায়েমা ও মাছুমাকে নারী হিসাবে এখনো চিনতে পারেনি গ্রীজওয়ের জনগণ। তাই ভাই ভাই বলেই সম্বোধন করছে।

ছায়েমার চলার পথে বাঁধার সৃষ্টি করবে বা পথ আগলিয়ে দাঁড়াবে এমন সাহস কারো নেই। কারো বাঁধা নতশীরে মেনে নেবে এমন মেয়েও ছায়েমা নয়। ছায়েমা চিরবিপ্লবী অকুতোভয় এক নারী। ভয়-ভীতি ও বাঁধার প্রাচীর মাড়িয়ে চলা তার স্বভাব। হ্যাঁ, আমীরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সে। আল্লাহর হুকুম পালনে সে নিবেদিত। অত্র এলাকার জনগণ যেহেতু তার আমীর নন, সেহেতু তাদের কথা মানা ফরয নয়। তাই গম্ভীর সুরে বলল-

“ওহে আমার প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা আমার চলার পথে বাঁধার সৃষ্টি কর না, বরং যাওয়ার ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তা কর। আমাকে তোমরা হাসিমুখে বিদায় দাও। আমার তো আশা ছিল আনোয়ার পাশার সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করব। জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে মজলুমদের মলিন মুখে হাসি ফুটাব। বলসেভিকদের কবর রচনা করে খোদার রাজ কায়েম করব। কমিউনিজমকে দাফন করে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করব। তাসখন্দ, সমরখন্দ, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, বুখারা, চেচনিয়া, বসনিয়াসহ সারা দুনিয়ার জিহাদের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব। তোমরা আমাদের জন্য দোয়া কর, আল্লাহ যেন আমার আশা পূরণ করেন। আমি আনোয়ার পাশাকে পেলাম না। তার মিশনের মুজাহিদ সাথীদের

সাথে সাক্ষাত করার শপথ নিয়েছি। সাক্ষাত আমি করবই। এতে আমি কারো বাঁধা মানব না। আমি তোমাদেরকে যেসব উপদেশ দিয়েছি, তার প্রতি যত্নবান হবে।”

এই বলে ছায়েমা মাছুমাকে অশ্বে আরোহণের নির্দেশ দিয়ে নিজেও ঘোড়ায় চেপে বসল। এবার বিদায়ী সালাম জানিয়ে কুকান্দুজের অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করল।

গ্রীজওয়ে গ্রামটাকে পিছনে ফেলে বিদ্যুদ্গতিতে দু'টি ঘোড়া ছুটে চলছে কুকান্দুজ অভিমুখে। অশ্বের খুরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে এক ভয়ংকর শব্দের সৃষ্টি করছে। শত শত লোক সর্দারজীর দহলিজে দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে এ দৃশ্য দেখছিল। অশ্ব যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছে, পদধ্বনি ততই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হতে লাগল। দেখতে দেখতে অশ্বারোহীরা চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

ছায়েমা ঘোড়া হাঁকিয়ে বেশ কিছুদূর চলার পর দূর থেকেই কুকান্দুজের বনভূমি আবছা আবছা দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। দেখতে যেন ঘন কুয়াশায় ঢাকা, যেন মেঘাচ্ছন্ন। গাছ-গাছালীর মাথার উপর দিয়ে জাবালার কৃষ্ণশীলার পর্বতশৃঙ্গ সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কেমন যেন দানবের মত ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে স্বগর্ভে শির উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কেউ একবার দেখলেই ভয়ে গা শিউরে উঠবে। ভয়ে অন্তরাত্মা দুরু দুরু কাঁপতে শুরু করবে।

ছায়েমা বিরাট সাহসিকতার সাথে বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। লতাপাতা ও ডালপালায় শত বাঁধা প্রতিহত করে সামনে এগিয়ে চলছে। মাছুমা খুব কষ্টে ছায়েমার অনুসরণ করছে। বিকাল দু'টা বাজতে আর বেশী বাকি নেই।

ছায়েমা জাবালার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। এই এলাকায় মুজাহিদদের কয়েকটি মোর্চা রয়েছে। এরও কিছু দূর দিয়ে রয়েছে পাহারার ব্যবস্থা। অশ্বের পদধ্বনি শুনে পাহারারত মুজাহিদরা সতর্ক হয়ে যায়। দুর্বিনের সাহায্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে।

হঠাৎ চমকে গেল দুর্বীনওয়ালা মুজাহিদ। একি! লাল ফৌজের আগমন এ অরণ্যে! কে জানে কতজন এদের পিছু আসছে! মনে হয় এ দুইজন অগ্রবর্তী কাফেলার সদস্য। মুজাহিদদের নীরব আস্তানার

সংবাদ পেয়েছে ওরা। হয়ত আর রক্ষা নেই। এখানেই হয়ত জীবনের সমাপ্তি ঘটবে।

সাথে সাথে ওয়ারলেসে সংবাদ পৌছে গেল সবগুলো মোর্চায়। মুজাহিদরা অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে লাল ফৌজদের অপেক্ষায় ওঁৎপেতে বসে যায়। ছায়েমা চলছে অগ্রে আর মাছুমা বিশ-পঁচিশ গজ পিছনে। ছায়েমা ও মাছুমা মুজাহিদদের এলাকায় প্রবেশ করেছে। তারই চারদিকে ছোট-বড় প্রায় পনেরটি মোর্চা। সকলেই ফায়ার পজিশনে অপেক্ষমান। কমান্ডারের বাঁশীর ফুঁৎকারের সাথে সাথে গর্জে ওঠবে চার দিক থেকে শত শত আগ্নেয়াস্ত্র।

প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আকিল মারকাজ থেকে ওয়ারলেসে জানিয়ে দিলেন যে, দুশমনদেরকে জীবিত পাকড়াও করার আপ্রাণ চেষ্টা কর। যদি একান্ত না-ই পার বা অবস্থা বেগতিক দেখ, তবে যা করার তাই করবে।

সকলেই শত্রুদের জীবিত ধরার জন্য তৈরী হয়ে বসে যায়। কমান্ডার মনসুর বাংকার থেকে বেরিয়ে এসে একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়ালেন 'হোল্ড' দেয়ার জন্য। অর্থাৎ কাফেলাকে গতিরোধ করে দাঁড়ানোর জন্য।

কমান্ডার মনসুরকে প্রথমে মাছুমা দেখে ফেলে। সাথে সাথে মাছুমা ভয় পেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে পালানোর চেষ্টা করে। এদিকে কমান্ডার মনসুর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আওয়াজ দিলেন, হোল্ড।

ছায়েমা থমকে দাঁড়াল। মাছুমাকে ক্ষিপ্রগতিতে পালাতে দেখে কমান্ডার মনসুর মাছুমার মাথা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লেন। সাথে সাথে বিকট আওয়াজে জঙ্গলের নীরবতা ভঙ্গ হল। মাছুমার লাশ ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশ থেকে পড়ে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

ছায়েমা ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখে চারদিকে মুজাহিদরা সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ছায়েমা বুঝতে পেরেছে যে, এ হল মহাবিপদ। লাল ফৌজ মনে করে গুলী ছোঁড়া ওদের জন্য অন্যায় নয়। আর ছায়েমার জন্য গুলী ছোঁড়া বিলকুল হারাম। মাছুমার শাহাদাতের সংবাদ এখনো পায়নি ছায়েমা। সম্মুখ থেকে উচ্চ আওয়াজে কমান্ডার মনসুর ঘোষণা করলেন, ওহে সিপাহী! অস্ত্র

ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ কর। অন্যথায় গুলী করব।

ছায়েমা ক্লাশিনকভটি দূরে নিক্ষেপ করে দু'হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

কমান্ডার মনসুর আবার বললেন, ওহে সৈনিক! তুমি হাত উঁচিয়ে ৫০ মিটার সামনে এগিয়ে আস। ছায়েমা ৫০ মিটার সামনে এগিয়ে আসলে পিছন দিকে থেকে একজন মুজাহিদ এসে অস্ত্রটি তুলে নেয়। কমান্ডার মনসুর রশি হাতে এদিকে এসে ছায়েমার হাত দু'টি পিছনে নিয়ে বেঁধে ফেললেন।

কমান্ডার মনুসর ছায়েমার চেহারার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে ভাবছিলেন, যুবকটি দেখতে তো খুব নওজোয়ান! কি আকর্ষণীয় তার চেহারা। মনে হয় এত অল্প বয়সের এই যুবককে ওরা জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে নিয়ে এসেছে। না হয় এত অল্প বয়সে কি কেউ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়? এখনো দাড়ি-গোঁফ গজায়নি।

ছায়েমার চেহারা দেখে কমান্ডার মনসুরের অন্তর মমতা ও ভালবাসায় ভরে গেল। মনসুর ছায়েমার সৌন্দর্য্যের ফাঁদে আটকা পড়ে গেলেন। কমান্ডারের পক্ষে ছায়েমার উপর টর্চার করা আর সম্ভব হবে না। কমান্ডার মনসুর ছায়েমার চেহারার দিকে তাকিয়ে আরো অবাক হলেন যে, বন্দির চেহারায় ভয় বা পেরেশানীর কোন চিহ্নমাত্র নেই।

লাল ফৌজ দেখার জন্য চারদিক থেকে মুজাহিদরা দলে দলে আসতে লাগল। ছায়েমার অন্তরে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। রয়েছে বিপুল আনন্দ। কারণ, তার দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্খা আজ পূরণ হয়েছে। এই পবিত্র লোকগুলোকে দেখে ছায়েমার আনন্দের সীমা নেই। সকলের সাথেই হাসিখুশী ব্যবহার করছে। সালাম বিনিময় হচ্ছে।

ছায়েমা একজন মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করে মাছুমার কথা জানতে চাইল।

মুজাহিদ জিজ্ঞেস করলেন, মাছুমা কে?

ছায়েমা বলল, মাছুমা আমার সঙ্গী।

তোমার সঙ্গে যে সৈন্য ছিল, সে আমাদের গুলীতে নিহত হয়েছে।

মাছুমার নিহতের কথা শুনে ছায়েমা কেঁদে ফেলল। হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাল। আর মনে মনে ভাবতে লাগল, সে কত

সৌভাগ্যশীল। আমার আগেই মেয়েটা শাহাদাত পেয়ে গেছে! মুনাজাত শেষে সবাইকে ডেকে বলল, "মুজাহিদ ভাইয়েরা! নিহত সৈন্যটি একজন মহিলা মুজাহিদ। শরীয়ত অনুযায়ী তার কাফন-দাফন ও জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার এবং শহীদী গোরস্তানে দাফনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।"

কমান্ডার মনসুর জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি ও মুসলমান?

ছায়েমা উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, শুধু মুসলমানই নয়, একজন বীর মুজাহিদও।"

এবার সব মুজাহিদরা মিলিত হয়ে মাছুমার নামাযে জানাযা পড়ে মাকবারে শুহাদায় দাফন করেন।

কমান্ডার মনসুর সাহেব ছায়েমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানতে চাইলেন।

ছাঁয়েমা বিনয়ের সাথে বলল, "আমার পরম শ্রদ্ধেয় কমান্ডার সাহেব! আপনি আমার বেয়াদবী মাফ করবেন। আপনাদের যত প্রশ্ন আছে, সব প্রশ্নেরই আমি উত্তর দেব, তবে দয়া করে আমাকে আপনাদের প্রধান সেনাপতির নিকট পাঠিয়ে দিন। বারবার উত্তর দেয়ার চেয়ে একবারই দেব।"

প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আকিল মার্কাজে অবস্থান করছিলেন। ওখান থেকে মার্কাজ এক কিলোমিটারের রাস্তা।

ছায়েমাকে তারা বেঁধে নিয়ে গেল মার্কাজে। সেনাপতি আবদুল্লাহ তখন খোবায়েবকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মত্ত। এমন সময় একজন গিয়ে সেনাপতিকে খবর দিলেন, লাল বাহিনীর জওয়ানকে গ্রেফতার করে মার্কাজে নিয়ে এসেছি। আপনি বললে এখানে নিয়ে আসি।

সেনাপতির হুকুম পেয়ে তিনজন মুজাহিদ ছায়েমাকে নিয়ে সেনাপতির মোর্চায় প্রবেশ করলেন। আমিও সেখানে উপবিষ্ট। আসামী আর আমার চার চোখের মিলন ঘটে গেল। একে অপরের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলাম। নীরব ভাষায় অনেক কিছুই আলোচনা করে চললাম। উভয়ের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ভাবাবেগে কারো মুখ থেকে কোন শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে না। সেনাপতি অপলক নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি সেনাপতির নিকট অনেক পূর্বেই ছায়েমার কথা আলাপ করেছিলাম। উভয়ের অবস্থা অবলোকন করে সেনাপতি আড় চোখে খোঁচা মারলেন। আমি সেনাপতির দিকে একটু বাঁকা চাহনী দিয়ে জানিয়ে দিলাম, "এই আমার সেই হারানো সম্পদ, যাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ছায়েমার অন্তর ভেঙ্গে-চুরে বেরিয়ে আসে একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস। আমি ছায়েমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল, "আর বিরহ নয়, আর বিরহের যাতনা ভোগ করতে হবে না আমার প্রিয়তমা!"

[আটাইশ]

জাবালার পাদদেশে কাষ্ঠ ও পাথর দিয়ে নির্মিত প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আকিলের মোর্চা। একশ' মিটার দূরে রয়েছে চারদিকে চারটি পাহারাদারীর চৌকি। প্রত্যেক চৌকিতে তিনজন করে প্রহরী চব্বিশ ঘন্টা পালাক্রমে পাহারা দেয়। সেনাপতির মোর্চার এক পার্শ্বে রয়েছে খাদ্যগুদাম আর অন্য পার্শ্বে অস্ত্রের ভান্ডার। খাদ্যগুদামের তত্ত্বাবধানে রয়েজে ২ জন, আর অস্ত্র ভান্ডারের জিম্মায় ২ জন। তাছাড়া বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে অসংখ্য বাংকার ও মোর্চা।

সেনাপতি একটি মোর্চা খালি করে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। ছায়েমাকে আহারাদি করিয়ে ঐ মোর্চায় বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আমিও তার সঙ্গে গেলাম। মোর্চায় বসে বসে দু'জন অতীতের দুঃখ-বেদনা ও বিচ্ছিন্ন জীবনের খুঁটি-নাটি অনেক আলাপ-আলোচনা করলাম।

আমার আম্মুর তিরোধানের সংবাদ পেয়ে ছায়েমা কেঁদে ফেলল। এক পর্যায়ে চোখের অশ্রুগুলো মুছতে মুছতে বলল, "খোবায়েব ভাইয়া! এখন তো তোমার-আমার জীবন এক প্লাটফর্মে এসে গেছে। আমার সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় অংশ নেবে এমন কেউ নেই। তোমার অবস্থাও একই। আমি একজন অবলা নারী। তুমি হলে পুরুষ, যখন যা ইচ্ছা করতে পার। দেখ, আমাকে রেখে আর কোনদিন পালাবে না কিন্তু...। তোমার ভাল-মন্দে, দুঃখে-কষ্টে আমাকে পাশে থাকতে দিও। তোমার বিরহ যাতনায় আমি অনেক কেঁদেছি। তোমার জন্য আমার অন্তর বিদীর্ণ। এ আহত হৃদয়ে আর

আঘাত দিও না ভাই।"

আমি ছায়েমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম, "দেখ ছায়েমা! আমি তোমার সব কথা শুনেছি। তোমার মনোভাব বুঝতে আমার একটুও বাকি নেই। অতীতে যা হয়েছে দ্বীনের খাতিরেই হয়েছে। ভবিষ্যতে যা হবে, তাও দ্বীনের খাতিরেই হবে। শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত শান্তির মুখ দেখতে পারব না।"

আমি আরো বললাম, "এতদিন পর দু'টি বিরহ প্রাণের মিলন কত যে মধুময় ও আনন্দদায়ক, তা অন্যেরা বুঝবে কি করে? একমাত্র বিরহনী প্রাণই তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে পানিবর্ষণ হলে যে শীতলতা অনুভব হয়, ঠিক তেমনই এক অনাবিল শান্তি মিলনে পাওয়া যায়।" আমার আলোচনার ফাঁকে একজন মুজাহিদ এসে আমাকে সেনাপতি সাহেবের নিকট নিয়ে গেলেন।

ছায়েমা অবসন্ন দেহ বিছানায় রেখে অচেতন অবস্থায় পড়ে রইল।

আমি সালাম দিয়ে সেনাপতি সাহেবের মোর্চায় প্রবেশ করলে তিনি আমাকে বসার নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁর পার্শ্বে বসে গেলাম। তিনি আমাকে অনেক আদর-সোহাগ ও ভালবাসা দিয়ে খুব নম্র ভাষায় বললেন, "বৎস! অনেক ত্যাগ, তিতীক্ষা ও কুরবানীর বদৌলতে তোমরা জিহাদের কন্টকাকীর্ণ প্রান্তরে এসেছ। জিহাদের ময়দানে কদম রাখা খুবই কঠিন ও সৌভাগ্যের কথা। জিহাদের ময়দান পবিত্র ময়দান। জিহাদের ময়দান হল সত্যিকার অর্থে ইবাদতগাহ্। এখানে যে যত পবিত্র থাকতে পারবে, তার কুরবানী তত বেশী কবুল হবে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর, অনেক কুরবানী ও ঈমানী পরীক্ষার পর তোমাদের এ পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য হয়েছে। তোমাদের করুণ ও মর্মান্তিক ইতিহাস বড়ই বেদনাদায়ক। দ্বীনের জন্য আমরাও তোমাদের মত এত কুরবানী পেশ করতে পারিনি।"

"প্রিয় খোবায়েব! আজ আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কিছু কথা বলতে চাই। তা তুমি মন দিয়ে শোন। হযরত আনোয়ার পাশার শাহাদাতের পর মোস্তফা কামাল পাশা কমান্ডার ইন চীফের দায়িত্বে আসেন। কিছুদিন এক সাথে কাজ করার পর তার দিক-নির্দেশনার মধ্যে এক ধরনের ফাটল পরিলক্ষিত হয়। আনোয়ার পাশা (রহঃ)

শাহাদাতবরণ করার আগের দিন সকল মুজাহিদকে ডেকে এক জরুরী পরামর্শ করেন। সেই বৈঠকে তিনি বলেছিলেন,

'হে আমার মুজাহিদ ভাই ও বন্ধুরা! আমার নাকে জান্নাতের সুঘ্রাণ আসছে। জান্নাতী হাওয়ায় আমার শরীর জুড়াচ্ছে। অনাবিল আনন্দে আমার হৃদয় ভরপুর। অন্তরে আমার এ কিসের আনন্দ, কিসের উল্লাস, কিচ্ছুই বুঝতে পারছি না। তবে আমার অন্তর বার বার সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। জান্নাতের দরজাগুলো আমার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। হুর-গেলমানরা সুসজ্জিত হয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মনে হয় আগামীকালই আমি আমার চরম ও পরম মাহবুবে আলার সান্নিধ্যে ফিরে যাব।'

তিনি সব কথা শুনিয়ে আমাদেরকে কিছু নসীহত করলেন। তিনি বললেন, 'ওহে বীর সেনানীরা! আমার শাহাদাতের পরে ৬ সদস্যবিশিষ্ট শূরার মাধ্যমে এ মিশন পরিচালিত হবে। তারপর তিনি ৬ জন সুযোগ্য মুহাক্কিক ও বিচক্ষণ আলিম দ্বারা একটি কমিটি গঠন করে আমীর নিযুক্ত করেন। এতে সিপাহসালারের দায়িত্ব দেন মোস্তফা কামাল পাশার হাতে। উলামায়ে কেরামগণ যে সিদ্ধান্ত দিবেন, কামাল পাশা তা বাস্তবায়ন করবেন।'

তারপর তিনি বললেন, 'সাবধান! উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত ছাড়া তোমরা সামনে অগ্রসর হবে না।' আর আলিমগণকে বললেন, 'আপনারা পবিত্র কুরআন-হাদীস ও ইজমা-কিয়াসের ভিত্তিতে ফায়সালা দিবেন। সাবধান! আপনারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেন না। নিজেদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করবেন না। যদি কোন কারণে মনোমালিন্য দেখা দেয়, তবে নিজেরা বসে তার সমাধান করে নেবেন।'

এভাবে তিনি সবগুলো কাজ গুছিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। পরদিনই লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। আনোয়ার পাশার মৃত্যুর পর উক্ত শূরার মাধ্যমেই জিহাদী মিশন পরিচালিত হয়। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর কমান্ডার ইন চীফ মোস্তফা কামাল পাশা তার ইচ্ছামত মিশন পরিচালনা করতে লাগলেন। উলামায়ে কিরাম দ্বারা গঠিত শূরার কোন পরামর্শই গ্রহণ করেননি।

বরং এ সমস্ত মহান জানবাজ মুজাহিদদেরকে সুকৌশলে একজন একজন করে দল থেকে বহিস্কার করেন। তারপর তিনি এমন কাজ করেন, যা কুরআন-হাদীস সমর্থন করে না। এ ব্যাপারে একজন মুজাহিদ সমালোচনা করার কারণে প্রকাশ্যে তাকে শহীদ করে দিয়েছে। তাছাড়া তিনি কিছু যুবককে আমাদের বাহিনীতে ঢুকিয়েছেন, যাদের মধ্যে সুন্নাতের কোন পাবন্দি ছিল না। এমনকি নামাযেও অলসতা করত। এসমস্ত ফাছিকদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হয়। এ সমস্ত আপত্তিকর কর্মকান্ডের কারণে আমাদের মধ্যে এক বিরাট ফাটল দেখা দেয়। তাছাড়া তিনি আরো একটি জঘন্য কাজ করেছেন, যা পুরাতন কেউ মেনে নিতে পারেননি। তিনি শক্তিশালী ও ভাল ভাল অস্ত্রগুলো খুব সুকৌশলে আমাদের হাত থেকে নিয়ে তার অনুগতদের হাতে তুলে দেয়।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা উলামায়ে কিরামগণকে সাথে নিয়ে এক পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হই। সেখানে আলিমদের পরামর্শক্রমে আমাকে কমান্ডার ইন চীফ নিযুক্ত করা হয়। আমরা প্রায় রিক্তহস্তে আলাদা হয়ে যাই। তারপর কয়েকটি হামলা করার পর গনীমত হিসাবে কিছু অস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। তা দিয়েই আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

তিনি আরো বললেন, বর্তমানে আমরা ত্রিমুখী সংকটে পড়েছি। প্রথম সংকট হল, নিজেদের এক অংশ আমাদের চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে আমাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারে। দ্বিতীয় সংকট হল, আমাদের আসল দুশমন বলসেভিক লালফৌজ ও কমিউনিষ্টরা। তৃতীয় সংকট হল, এদেশের জনসাধারণ কমিউনিজমের দালাল ও বলসেভিকদের খাঁটি গোলাম। আর একশ্রেণীর নামধারী আলিমের ফতোয়ার কারণে সরলমনা মুসলমানরাও আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা আগে পেয়েছি, তা সবই বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন আর্থিক সহযোগিতা, নিজ বাড়ীতে আশ্রয়, তাদের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস হাট-বাজার ও রসদপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি। এখন ওরা অর্থকড়ির যোগান দিচ্ছে না। টাকা দিলেও খাদ্যদ্রব্য,

ঔষধ, পোশাক সংগ্রহ করে দিচ্ছে না। আমরা যদি বিপদে পড়ে কারো বাড়ীতে আশ্রয় প্রার্থী হই, তবে বলসেভিকদের খবর দিয়ে ধরিয়ে দেয়। তাই আমরা লোকালয় ছেড়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাবন করছি। ওরা আমাদের অনেক সাথীকে শহীদ করেছে। অনেককে ধরে নিয়ে গেছে। এসব হয়েছে একমাত্র মুনাফেকির কারণে। একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন কত দিন আমরা এ অরণ্য ভূমিতে টিকে থাকতে পারব। শহরগুলো একচেটিয়া শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এমনকি থানা শহরগুলোও তাদের দখলে। শুনেছি, বলসেভিকদের বর্তমান টার্গেট কুকান্দুজের বনভূমি ও জাবালার পর্বতমালা। আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দু'আ করতে থাক, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন। আর যদি আল্লাহ্র মর্জি অন্যকিছু হয়, তবে যেন শাহাদাতের পিয়ালা পান করার তৌওফীক দান করেন। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে দুশমনের হাতে বন্দি কর না।"

আমি সেনাপতি আবদুল্লাহ্ বিন আকিলকে জিজ্ঞাসা করলাম, "জনাব! আনোয়ার পাশার সহযোদ্ধা এবং তাঁর নির্বাচিত কমান্ডার ইন চীফ মোস্তফা কামাল পাশার দ্রুত পরিবর্তন হওয়ার কারণ কি? তিনি কী বলতে চান বা কী করতে চান, তা জানতে পেরেছেন কি?"

জবাবে কমান্ডার বললেন, "বাবা! তার চিন্তাধারা এখনো পুরাপুরি বুঝা যাচ্ছে না। তবে এই দিনগুলোতে আমরা যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাতে এতটুকু অনুমান করেছি যে, বলসেভিকদের সাথে তার গোপন আঁতাত হয়েছে। গোপন সূত্রে জানতে পেরেছি, বলসেভিকরা তাকে প্রস্তাব দিয়েছে যে, তুমি যদি জিহাদী কার্যক্রম পরিত্যাগ করে কমিউনিজমের দিকে ফিরে আস, তবে একটি দেশ তোমার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে এবং সব ধরনের আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। তোমার রাষ্ট্রে আমরা কোন হস্তক্ষেপ করব না। সেখানে তুমি তোমার ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করবে। তুমি তোমার রাষ্ট্র তোমার মত করে ঢেলে সাজাবে।

তিনি উক্ত প্রস্তাবে সাক্ষর করেছেন বলে জানা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইদানিং তার গ্রুপে সে সমস্ত যুবকদেরকে ভর্তি করছে, ওরা

বলসেভিক জওয়ান ও লাল ফৌজ।

গত তিন দিন আগে আরো একটি সংবাদ পেয়েছি। তাহল, কামাল পাশার ৫/৭ জন মুজাহিদ এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে যাওয়ার সময় অস্ত্রসহ লাল ফৌজের হাতে ধরা পড়েছে। এ সংবাদ পেয়ে কামাল পাশা এক দূতের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করেন। লাল ফৌজ বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে তাকে অস্ত্রসহ ছেড়ে দেয়। এই ঘটনা সহজেই চুক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া আরো অনেক কর্মকান্ড রয়েছে, যা পর্যালোচনা করলে কামাল পাশার প্রতি অনেক সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এগুলো ছাড়াও তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা নামক এক মতাদর্শের প্রচার করতে চাচ্ছেন। ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে তিনি গোপনে গোপনে যে প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন, তাহল, রাষ্ট্র থেকে নিয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে সকল ধর্মই এক সমান। সকল ধর্মের মর্যাদা সমান। সকল ধর্মের প্রতিই সকলের সমান বিশ্বাস রাখতে হবে। কোন ধর্মকেই প্রাধান্য দেয়া যাবে না। সকল ধর্মের প্রতিই হতে হবে শ্রদ্ধাশীল অনুগত। কোন ধর্মকে মিথ্যা বলা যাবে না। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। এরূপ বিশ্বাসের আধুনিক নামই হল 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'।

আমার মতে, ধর্ম নিরপেক্ষতা আর ধর্মহীনতা এক কথা। কেননা, এক ধর্মের অনুসারী কখনো অন্য ধর্মকে সত্য হিসাবে মেনে নিতে পারে না। সকলেই নিজ নিজ ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতা একমাত্র পাগলের কাছেই পাওয়া যায়। তাছাড়া কোন শিক্ষিত বা বিবেকবান মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতা মানতে পারে না। এটা পাগলের প্রলাপ। ছেলে নিকট পিতার মর্যাদা অনেক বেশী। যার পিতার কোন পরিচয় নেই, পিতা কে জানা নেই, এমন জারজের নিকট সকল পুরুষই পিতার মর্যাদা পাবে। একজন হারামজাদার পক্ষেই সকল পুরুষকে পিতার স্থলে আনা বা পিতা মনে করে সম্মান করা সম্ভব। তাছাড়া কোন বৈধ সন্তান পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করা বা পিতা হিসাবে জ্ঞান করা আদৌ সম্ভব নয়। ঠিক তেমনিভাবে বেঈমান ছাড়া সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দিবে এমনটা হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "একমাত্র ইসলামই হল আমার নিকট মনোনীত ধর্ম।" অন্য সব ধর্ম মিথ্যা ও কাল্পনিক। কোন মুসলমান যদি অন্য ধর্মকে সত্য বলে মনে করে, তবে তার ঈমান থাকবে না, সাথে সাথে বেঈমান হয়ে যাবে, তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্মহীনতা। মোস্তফা কামাল পাশা এখন আর মুসলমান নন। তিনি মুরতাদ হয়ে গেছেন।"

সেনাপতি মুখ থেকে এসব কথা শুনে আমি অনেক দুঃখিত হলাম। বেদনা ও অনুশোচনায় আমার হৃদয় ভারী হয়ে উঠল।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সেনাপতি সাহেবের নিকট কিছু মন্তব্য করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। আমি বললাম, "হুজুর! আপনার আলোচনায় বুঝতে পারলাম, আমাদের পরিণতি কী হবে। আমাদের জিহাদী মিশন এখন অথৈ পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে সাগরের গহীন তলায় হারিয়ে যাবে। আহ্, এ জাতিকে রক্ষা করা আর সম্ভব নয়। চেয়েছিলাম জিহাদের মাধ্যমে এ জাতিকে উদ্ধার করতে। চেয়েছিলাম কমিউনিজমের কবর রচনা করে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে। চেয়েছিলাম নির্যাতিত-নিপিড়ীত মানুষকে মুক্তি দিতে, বঞ্চিতের অধিকার ছিনিয়ে আনতে, মলিন মুখে হাসি ফোটাতে। এতিম ও বিধবাদের চোখের পানি মুছে দিয়ে শান্তির বিধান করতে। তা আর সম্ভব হল না।"

এতক্ষণে সূর্য্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। সেনাপতি বাঁশিতে ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে অন্যান্য মুজাহিদগণ দৌড়িয়ে আসলেন আমাদের মোর্চায়। তারপর তিনি যোহরের নামায আদায় করার হুকুম দিলেন। আমরা অজু-এস্তেঞ্জা সেরে কয়েক সারিতে দাঁড়িয়ে গেলাম। কমান্ডার সাহেব ইমামতি করলেন। নামায সমাপণ করে সবাই ছুটে গেলাম নিজ নিজ তাবুঁ ও মোর্চায়।

আমি কয়েক কদম এগিয়ে ছায়েমার খোঁজ নিতে তার বাংকারে গেলাম। তখনো সে গভীর নির্দায় নিমগ্ন। আমি আস্তে আস্তে ডাকলাম— "ছায়েমা! ও ছায়েমা! নামাযের সময় বয়ে যাচ্ছে। জলদি নামায পড়ে নাও।"

ছায়েমা আমার ডাক শুনে শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করে বাংকারের ভেতরই নামায আদায় করল। আমার ছায়েমা! ছায়েমা! ডাক শুনে আশপাশের মুজাহিদদের মধ্যে কানাঘুষা আরম্ভ হয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল, "তা হলে কি লোকটা মহিলা! এ আবার কোন্ ফেৎনা?"

এ সংবাদটি দাবানলের মত এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে, এক মোর্চা থেকে অন্য মোর্চায় ছড়িয়ে পড়ল।

ছায়েমার ব্যাপারটা একমাত্র সেনাপতি ছাড়া অন্য কেউ জানতেন না। তবে সকলের একটু সন্দেহ ছিল। সেনাপতি সাহেব আমাকে বললেন, "বাবা খোবায়েব! তোমাদের কাহিনী শুনে খুবই দুঃখিত হলাম। তোমার অবিভাবক বলতে সংসারে কেউ নেই, মাথা গোজারও ঠাঁই নেই। আশ্রয়ের জায়গা নেই। জিহাদের পবিত্র ময়দানে আমিই তোমাদের অভিভাবক, এতে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে?"

আমি উত্তর দিলাম, "জনাব! বর্তমানে আপনিই একমাত্র আমাদের অভিভাবক আর জিহাদের ময়দানই আমাদের আশ্রয়স্থল। আমাদেরকে যেভাবে পরিচালিত করবেন, আমরা সেভাবেই চলব।"

তিনি বললেন, "ছায়েমা মালাকানীকে তুমি তোমার জীবন সঙ্গিনী হিসাবে বরণ করে নাও। আমি তোমাদের জন্য একটি তাঁবু দান করব। তাতে তোমরা পর্দামত থাকতে পারবে। একটি সুন্দরী যুবতী মেয়েকে এভাবে রাখা শরীয়তে জায়েয নয়। মেয়েটাকে অন্য কোথায় স্থানান্তর করা বা অন্য কোথাও রাখারও জায়গা নেই। তোমাদের চিন্তা-চেতনা যেহেতু এক, সেহেতু তাকেই তুমি সহধর্মিনী হিসাবে বরণ করে নাও।"

জবাবে আমি বললাম, "হুজুর! সত্যি আপনি আমাদের অভিভাবক। আপনার হুকুম পালন করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আপনার প্রস্তাবে আমার কোন দ্বিমত নেই। আমার আম্মু জীবিত থাকতে ছায়েমার উপর এতই খুশী ছিলেন যে, তার খেদমত, তার আচার-ব্যবহার সবকিছু মিলিয়ে অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। মাঝে-মধ্যে কোন সময় 'বউ মা' বলে ডাকতেও শুনেছি। তাছাড়া আমার

এক বন্ধু আছেন তোরাব হারুনী। তাঁর বাড়ীতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। তিনি আম্মুর সাথে এ ধরনের আলাপ করেছিলেন এবং সব আয়োজনও নাকি সম্পন্ন করেছিলেন। এতদিন একের পর এক প্রোগ্রাম চালানো, সফর আর বন্দি জীবনের গ্লানি কাটিয়ে এ ধরনের চিন্তা করার সুযোগই হয়নি। এখন আমি নিজেকে আপনার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলাম।”

সেনাপতি সাহেব আমার আর্থিক সঙ্গতি জানতে চাইলেন। তখন আমার হাতে একটি কপর্দকও ছিল না। আমার পরনের কাপড়-চোপড়, অস্ত্র ও ঘোড়াটি ছাড়া আর কিছু নেই। আমার কাছে টাকা যা ছিল, তা আগেই বাইতুলমালে জমা দিয়েছিলাম। মাননীয় সেনাপতি সাহেব তাঁর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ফান্ডে কি পরিমাণ অর্থকড়ি জমা আছে? তিনি হিসাবের খাতা দেখে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ জানিয়ে দিলেন। সেনাপতি সাহেব তাকে পাঁচশ টাকা আমাকে দান করার নির্দেশ দিলেন। কোষাধ্যক্ষ একটু পরে এসে টাকাগুলো আমার হাতে দিয়ে গেলেন।

সেনাপতি আমাকে ডেকে বললেন, “আগামীকাল সকালে কোষাধ্যক্ষকে সাথে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বাজারে যাবে। অলিমার জন্য ১শ’ টাকার খেজুর, আর ২শ’ টাকার কাপড়-চোপড় ও অলংকার আনবে। অবশিষ্ট ২শ’ টাকা মোহর হিসাবে ছায়েমাকে প্রদান করবে।

[ঊনত্রিশ]

আমীর সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কেটে গেল অনেক সময়। এবার তিনি বাইরে একটু ঘোরাফেরা করে মাগরিবের নামায আদায় করতে বললেন। আমি বাইরে এসে নিবৃত বন-বনানীর অন্তঃপুরে মনের আনন্দে পায়চারী করছিলাম। জীবনের আর সব বিকেলের মধ্যে সেদিনের বিকালটা ছিল ব্যতিক্রম। অনেক পুণ্যেভরা এক শুভ বিকেল। এমন বিকেল জীবনে একবারই আসে। ভাবলাম, একা একা আনন্দ উপভোগ করায় মজা নেই। তাই আরো একটু অগ্রসর হয়ে ছায়েমার ঘরে চলে গেলাম। তখন সে তিলাওয়াত করছিল।

আমাকে দেখা মাত্র ছায়েমা তিলাওয়াত বন্ধ করে বলতে লাগল,

"খোবায়েব ভাইয়া! তুমি এত নিষ্ঠুর, এত পাষাণ, তা আগে বুঝতে পারিনি। আমাকে রেখে কোথায় যে হারিয়ে যাও, বুঝি না। সেই কখন তুমি বেরিয়েছ, এতক্ষণ পর এলে। না আসলেই তো পার এ অভাগিনীর কাছে। মনে হয়, আমার কাছে আসলে তোমার শরীরে জ্বালা ধরে যায়। তুমি আসলে একটা নিমকহারাম। তা না হয় এত কষ্ট করে সাত ঘাটের পানি পান করে তোমাকে খুঁজে বের করেছি, তারপরও তুমি দূরে দূরে থাক। কত কথাই না এখনো না বলা রয়ে গেল। তোমার দর্শনে আমার ক্ষুধা নিবারণ হয়, তোমার সাক্ষাতে আমার পিপাসা মিটে যায়। তুমি যদি বিরহিনীর অন্তরের জ্বালা বুঝতে, তবে অমন করে দূরে দূরে সময় কাটাতে পারতে না।"

ছায়েমার কথা শুনে আমি মুচকি হাসতে লাগলাম। ছায়েমা আমার দিকে তাকিয়ে অভিমানের সুরে বলল, "ইস্, রূপালী দাঁতগুলো বের করে আবার হাসছে! একটু লজ্জাও লাগে না। অন্তরে দয়ামায়ার লেশটুকু নেই। আমাকে কাঁদাতে পারলেই খুশী হয়, নিষ্ঠুর।"

আমি দু'কদম এগিয়ে গিয়ে বললাম, "এত রাগ কর কেন বোন! এখন থেকে ছায়ার মত তোমার কাছে কাছেই থাকব। আগামীকাল থেকে তোমার বিছানাটা একটু প্রশস্ত করে বিছিয়ে রেখ।..."

ছায়েমা চেহারাটা লাল করে বলল, "ছিঃ, দূরে দূরে থেকে বুঝি দুষ্ট হয়ে গেছ? মুখের বুঝি এখন আর ব্রেক নেই! যা আসে তাই বলে ফেলছ। আল্লাহর ভয় আর লজ্জা-শরম বুঝি হারিয়ে ফেলেছ?"

আমি বললাম, "আমি কি বলেছি আর তুমি কি বুঝেছ? আমি বলছি বিছানাটা একটু প্রশস্ত করে বিছাতে।"

"তারপর কি বলতে চেয়েছিলে তা কি বুঝিনি? আমি এখন আর ছোট খুকি নই, সবই বুঝি। তোমার পেটে পেটে শুধু দুষ্টুমি।"

এদিকে জাবালার গর্বিত উচ্চ চূড়ার আড়ালে দিনমণি পালানোর রাস্তা খুঁজছে। আবছা আবছা অন্ধাকার নেমে এসেছে। প্রতিটি মোর্চায় মোর্চায় মাগরিবের নামাযের ইকামত হচ্ছে। আমি দৌড়িয়ে গিয়ে জামাতে শামিল হলাম। ছায়েমা তার বাংকারে নামায আদায় করে আবার সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগল।

নামাযান্তে আমাদের ফিল্ড মার্শাল আবদুল্লাহ বিন আকিল দাঁড়িয়ে তাছবীহাত পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। তাছবীহাত আদায় করে তিনি জাতির জন্য মোনাজাত করলেন। তারপর তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন–

"প্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত, যার বীরত্বগাঁধা ইতিহাস শুনে তোমরা নবদিগন্তের সন্ধান পাবে, যাকে দেখার জন্য হযরত আনোয়ার পাশা (রাঃ) আকাংখা ব্যক্ত করেছিলেন। তাছাড়া আরো একজন বীরাঙ্গনা তোমাদের মাঝে রয়েছে, যাকে তোমরা গ্রেফতার করে এনেছ। এই দুই অকুতোভয় ব্যক্তিত্বের নাম হাফেজ খোবায়েব জাম্‌বুলী ও হাফেজা ছায়েমা মালাকানী।"

এতটুকু বলেই তিনি আমাদের জিহাদী জীবনের বেশকিছু ঘটনা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, "আগামীকাল বাদ আছর খোবায়েব জামবুলী ও ছায়েমা মালাকানীর আক্বদ মোবারক (শুভ বিবাহ) সম্পন্ন হবে। উক্ত পবিত্র অনুষ্ঠানে সবাইকে দাওয়াত করা হল।"

সেনাপতির কথাগুলো শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অতঃপর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, "আগামী কাল ফজরের নামায পড়েই খোবায়েবকে নিয়ে বাজার করতে চলে যাবে। আসার পথে জনাব সোলাইমান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।"

ঈশার নামাযের পর পাহারাদারী বন্টন করে যার যার তাঁবুতে ও যার যার দায়িত্বে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

আমি ছায়েমার বাংকারে ফিরে গিয়ে দেখি সে নামায আদায় করে মুনাজাত করছে। আমি আস্তে করে এক কোণে বসে বললাম, "আমার জন্যেও দু'আ কর বোন।"

কিন্তু ছায়েমা সাথে সাথে মুনাজাত সমাপ্ত করে আমার দিকে তাকিয়ে বসল এবং জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া! সেনাপতি সাহেব তো আমাকে ওদিকে যেতে মানা করেছেন। এখন বলুন তো এতক্ষণ আপনারা কী আলোচনা করলেন?"

আমি বললাম, "তুমি নাকি একা একা থাকতে ভয় পাও, আর একা জীবন নাকি তোমার ভাল লাগে না, তাই আমাকে ডেকে বলেছেন তোমার সাথে... ।"

"ছিঃ আবার দুষ্টুমী! আসলে সিপাহসালার কি বলছেন, তা শুনাও না ভাইয়া?" ছায়েমা বলল।

"হ্যাঁ, সিপাহসালার বলছেন আগামীকাল বাদ আছর তোমার সাথে আমার... ।"

ছায়েমা একটু রেগে গিয়ে বলল, "তোমার সাথে আমার কি? মাথা না মুন্ডু?"

"আরে বুঝবে, বুঝবে, আগামীকাল আসুক তারপর দেখবে সুন্দরী!"

"ও বুঝেছি, অপারেশনে পাঠাবে ভাইয়া।"

"না, ওসব নয়। আমীর মোহতারাম বলেছেন, আমাদের পর্দার খেলাফ হচ্ছে। এতে গুনাহ্ হচ্ছে। জিহাদের ময়দান হল পবিত্র ময়দান। এ গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আগামীকাল ফুফাজীকে এনে বাদ আছর আমাদের শাদী মোবারক সুসম্পূর্ণ করবেন। তারপর আমাদের জন্য নিবৃত স্থানে একটি তাঁবু রচনা করে দেবেন, সেখানে আমরা... ।"

আমার কথা শুনে ছায়েমা একটু হেসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পরক্ষণেই মুক্তার দানার মত কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমরা নিজ নিজ তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ফজরের নামায আদায় করে দ্রুতগামী দু'টি অশ্ব নিয়ে ছুটে গেলাম বাজারে। অল্প সময়ের মধ্যে সওদাপাতি করে চলে আসলাম ফুফাজীর কুটিরে। সেখানে যোহরের নামায আদায় করে খানাপিনা সেরে ফুফাজীকে সঙ্গে নিয়ে ৩টার দিকে জাবালার পাদদেশে মার্কাজে ফিরে আসলাম। ফুফিমা বিবাহের কথা শুনে খুবই খুশী হলেন ও আমাদের সুখময় দাম্পত্য জীবন কামনা করে দু'আ করলেন।

আমরা মার্কাজে ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে অন্যান্য মুজাহিদরা দেখার জন্য ছুটে আসলেন। আমীর সাহেব একজন মুজাহিদকে জিঁজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কাজ কতটুকু হয়েছে?"

মুজাহিদ উত্তর দিলেন, "হুজুর! সম্পূর্ণ কাজ সুচারুরূপে সমাধা করেছি। যদি আরো কিছু করতে হয় তবে করা যাবে।"

আমীর সাহেব আমাকে, ফুফাজীকে ও আরো কয়েকজন মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে হাঁটতে লাগলেন। সামান্য একটু এগিয়ে

দেখি আমাদের জন্য সবুজ রঙের একটি তাঁবু রচনা করা হয়েছে। বেশ কতটুকু জায়গা নিয়ে লতাপাতার বেষ্টনি দেয়া হয়েছে। এরই ৫/৭ হাত দূর দিয়ে কল কল রবে প্রবাহিত হচ্ছে এক নির্ঝরিনী। জায়গাটা খুবই মনোরম। সকলেই জায়গাটা পছন্দ করলেন। ঝর্ণার সন্নিকটেই পত্রবেষ্টিত গোসলখানা ও একটু দূরে শৌচাগার।

ফুফাজী কাপড়-চোপড়গুলো ছায়েমার খিমায় পৌঁছিয়ে দিয়ে বললেন, "মা! তুমি গিয়ে ঝর্ণার পানিতে গোসল করে এগুলো পরিধান কর।"

ছায়েমা ভেবে অস্থির কি থেকে কি হতে চলেছে। সে গোসল করে নিজেই নিজেকে সাজাল। ছায়েমা এ সময় মনে মনে ভাবছিল, হায়! আমি কত কনেকে সাজিয়েছি। আর নিজেই আজ নিজেকে সাজাচ্ছি! আজ কোথায় আমার বান্ধবী আমিনা, তাহমিনা, তৃষ্ণা, মাছুমা, পারভীন ও ছফুরা!

আছরের নামায আদায় করে আমি সেনাপতির সামনে বসলাম। ফুফাজী ছায়েমা থেকে অনুমতি আনার জন্য তার তাঁবুতে গেলেন। ছায়েমা ফুফাজীর নিকট অনুমতি দিয়েছে বটে, কিন্তু মোহরের ব্যাপারে একটি দাবি করে বসল। তাহল মহরের পরিবর্তে আমাকে খোবায়েবের ক্লাশিনকভটি দিতে হবে। ফুফাজী এতে রাজি হয়ে গেলেন। আমীর সাহেব নিজেই বিবাহ পড়ালেন। তারপর খেজুর ছড়িয়ে অলীমা খাওয়ালেন। সবই আমাদের জন্য দু'আ করলেন।

দিনমণি এতক্ষণে পশ্চিম গগনে দ্রুত পালানোর আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়েছে পশ্চিমাকাশে। পক্ষীকূলের কণ্ঠে সন্ধ্যার আগমনী বার্তা বেজে উঠছে। সকলেই সন্ধ্যা উপাসনার জন্যে তৈরী হচ্ছে। সিপাহসালার আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ছায়েমার তাঁবুতে। সেখানে আমি ছায়েমাকে পশ্চাতে রেখে সর্বপ্রথম নামাযের ইমামতি করলাম। তারপর সুন্নত আদায় করে দু'রাকাত শুকরিয়ার নামায পড়লাম।

ছায়েমাও শুকরিয়ার নামায আদায় করে যমিনে লুটিয়ে পড়ে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করতে লাগল—

"প্রভূ হে! তোমার প্রশংসা করার সাধ্য আমার নেই। তথাপি আমি

তোমার প্রশংসা করছি। তুমিই সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র যোগ্য।

হে আমার মাওলা! আমার পাপরাশী কূলহীন পারাবারের ফেনার চেয়েও অধিক। দয়া করে সবগুলো অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করে দাও।

প্রভূ হে! এক সময় আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করেছিলাম, হে আল্লাহ্! আমার শুভ পরিণয় হোক জিহাদের ময়দানে এবং একজন মুজাহিদের সাথে, যেন তাকে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ এবাদতে সাহায্য করতে পারি। আমার দীর্ঘদিনের আশা-আকাংখা আজ তুমি পূরণ করেছ।

হে আমার মাওলা! বেঈমানদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে যেন আমি শাহাদাতের নেয়ামত লাভ করি, সে তাওফীক দান কর।"

অরণ্যের মধ্যে আমাদের দাম্পত্য জীবনের তিন দিন কেটে গেল। ৪র্থ দিনে এক ঘোরসওয়ার মুজাহিদ গোয়েন্দা এসে কমান্ডার ইন চীফের নিকট সংবাদ পৌঁছালেন, আমরা যে এখানে অবস্থান নিয়েছি, সে সংবাদ বলসেভিকরা জেনে ফেলেছে। এখানকার রাস্তা-ঘাট, মুজাহিদ সংখ্যা ও রসদপত্রের তথ্য তারা সংগ্রহ করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানও ভালভাবে জেনে নিয়েছে। ত্রিশ হাজার সৈন্য ও বিপুল গোলাবারুদ, কামান ও অশ্বারোহী নিয়ে যে কোন সময় আমাদের উপর চারদিক থেকে আক্রমণ চালাতে পারে। মোস্তফা কামাল পাশার অনুগত বাহিনীর একজন গুপ্তচরের মাধ্যমে তারা এ সংবাদ পেয়েছে। বলসেভিকরা সমস্ত শহর, উপশহর, জেলা ও থানা শহরসহ সমস্ত হাটবাজার, রাস্তাঘাট, নৌপথ কব্জা করে নিয়েছে। শুধু তুর্কিস্তান কামাল পাশার নিয়ন্ত্রণে। সেখানে আরবী বর্ণমালা বাদ দিয়ে লেটিন বর্ণমালা চালু করা হয়েছে। তার প্রতিবাদ করার অপরাধে তিন হাজার আলিমকে একই সাথে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। তুর্কিস্তান এখন পুরোটাই কামাল পাশার অনুগত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এখনই পরামর্শ করে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার।

সেনাপতি এ সংবাদে ঘাবড়ে গেলেন। সাথে সাথে বিপদ সংকেত বাজিয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সকল মুজাহিদ দৌঁড়িয়ে হেড কোয়ার্টারে চলে আসলেন। সিপাহসালার আবদুল্লাহ্ বিন আকিল দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বললেন—

"ওহে আমার জানবাজ মুজাহিদ সাথী ও বন্ধুরা! তোমরা আমার কথাগুলো মনোযোগের সাথে শোন। হতে পারে এটাই আমার বিদায়ী ভাষণ।

প্রিয় বন্ধুরা! ইসলামের প্রাণকেন্দ্র তাসখন্দ, সমরখন্দ, বুখারা, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তর্কমেনিস্তানসহ ছোট-বড় বেশক'টি রাষ্ট্র বলসেভিকরা দখল করে নিয়েছে। তুর্কিস্তান রয়েছে কামাল পাশার নিয়ন্ত্রণে। আজ আমরা চতুর্মুখী সংকটে পড়ে আছি। শত্রুরা মুনাফিক চক্রের মাধ্যমে আমাদের অবস্থান জেনে নিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে আমাদের উপর ঝটিকা আক্রমণ হতে পারে। কয়েকশ' মুজাহিদদের মোকাবেলায় ত্রিশ হাজার বাহিনী লড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী আর্টিলারী ডিভিশন ও অশ্বারোহী এবং কমান্ডো বাহিনী। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ত্রিশ হাজার বাহিনীর সাথে কুলিয়ে উঠা কতটুকু সম্ভব হবে, তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।

হে আমার প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! এ স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথায় যাওয়ার মত স্থান আমাদের নেই। লোকালয়ে আশ্রয় নেয়াও সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের জনগণই আমাদের ধরিয়ে দেবে। কাজেই এ স্থান পরিত্যাগ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! কাফিরদের নিকট আত্মসমর্পণ করা কোন মুজাহিদের জন্য শোভা পায় না। হয় শহীদ, না হয় গাজী। আমাদেরকে এ দু'টির যে কোন একটি বেছে নিতে হবে। সাবধান! সাবধান! একবিন্দু রক্ত থাকতেও পিছপা হবে না। আর কিছুতেই ধরা পড়া যাবে না। অন্যথায় নির্যাতন সহ্য করে ঈমান টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন হবে। আমার মনে হয়, এটাই আমাদের আখেরী পরীক্ষা। আল্লাহ্ হয়ত আর পরীক্ষা নেবেন না। এখন থেকে তোমরা যার যা আছে, তা নিয়ে প্রস্তুত থাক। বেশী বেশী তওবা-এস্তেগফার ও তাছবীহাত পাঠ করতে থাক। অচিরেই হয়ত আমরা তুর্কিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হযরত আনোয়ার পাশা শহীদ (রাঃ)- এর নিকট গিয়ে মিলিত হব।"

পরদিন সকাল ৯টায় সঙ্গীরা সকালের নাস্তার জন্য বসেছে।

এমন সময় পাহারাদার সাথীরা দৌড়িয়ে এসে বলল, "আমাদের চারদিকে বলসেভিক ও লাল ফৌজরা ঘিরে রেখেছে। সৈন্য সংখ্যা নির্ণয় করা আদৌ সম্ভব নয়। এর মধ্যেই দুশমনের পক্ষ থেকে কামান দাগানো হল। সাথে সাথে হেডকোয়ার্টারসহ বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ মোর্চা মাটির সঙ্গে মিশে গেল। বেশ ক'জন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেল। অবশিষ্ট মুজাহিদরা দুশমনের উপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ করতে লাগল।

আমিও ছায়েমাকে নিয়ে বাংকার থেকে বেরিয়ে এসে গুলী ছুঁড়তে লাগলাম। এরই মধ্যে আমার পার্শ্বে ছায়েমা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি তাকে ধরার চেষ্টা করলে ছায়েমা হাসতে হাসতে বলল, "প্রিয়তম খোবায়েব! আমার জন্য অযথা পেরেশান হয়ো না। আমি আমার মাওলার নিকট ফিরে যাচ্ছি। ঐ তো জান্নাতের প্রহরীরা আমাকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছে।"

আর কিছু বলতে পারল না ছায়েমা। জিহাদের ময়দানে জীবন প্রদীপ নিভে গেছে বীরাঙ্গনা ছায়েমার।

আমি তাকে রেখে একটু এগিয়ে দেখিদুশমন অতি নিকটে এসে গেছে। ওরা গাছের আড়াল থেকে দেখে দেখে গুলী ছুঁড়ছে। আমিও ক্লাশিনকভের বেরেলটি দুশমনের দিকে তাক করে গুলী ছুঁড়তে লাগলাম।

দ্বিতীয় খন্ড সমপ্ত

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১। আঁধার রাতের বন্দিনী-১ম
২। আঁধার রাতের বন্দিনী-২য়
৩। আঁধার রাতের বন্দিনী-৩য়
৪। আঁধার রাতের বন্দিনী-৪র্থ
৫। খুন রাঙ্গা প্রান্তর-১ম
৬। খুন রাঙ্গা প্রান্তর-২য়
৭। খুন রাঙ্গা প্রান্তর-৩য়
৮। রাখাল বন্ধু
৯। পথ ভোলা সৈনিক
১০। ছোটদের মজার গল্প

প্রকাশের পথে

১। আঁধার রাতের বন্দিনী-৫ম
২। খুন রাঙ্গা প্রান্তর-৪র্থ
৩। রক্তে ভেজা কাশ্মীর-১ম
৪। রক্তে ভেজা কাশ্মীর-২য়
৫। নূর- জাহান
৬। বিদস্ত জনপদ
৭। রিক্ত পথিক

সার্বিক যোগাযোগ ঃ ০১৭২১৭৪৪২৫০, ০১৮১৮৮০৩০৮২

প্রকাশনায়
নাঈমা প্রকাশনী